অন্ধকারে চিতা - ১

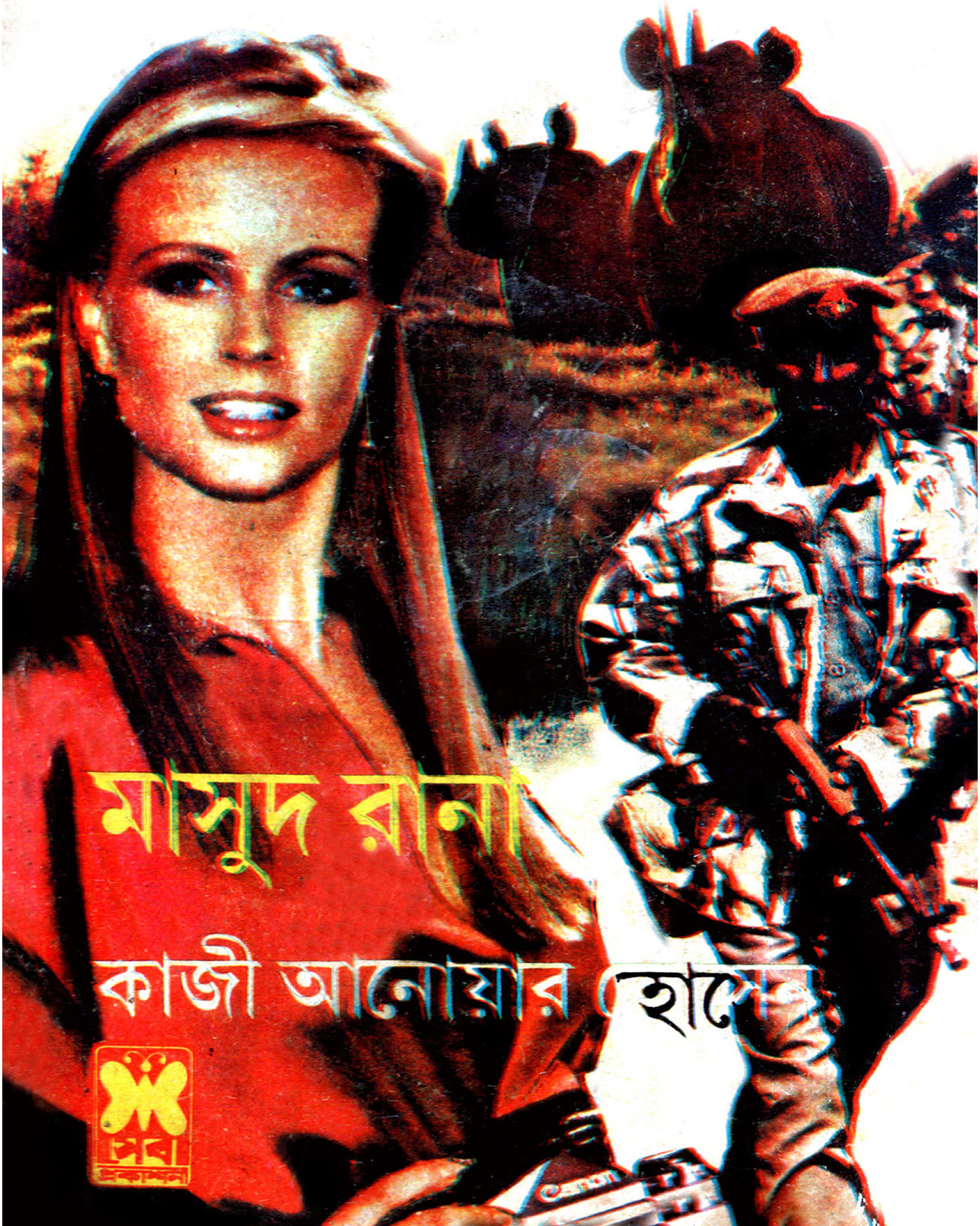

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১, ২

রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২

কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র

রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা

ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দুত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?

বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ

বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা

তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২

প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২

লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২

কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২

গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২

আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১, ২

হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২

পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২

প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২

স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা

নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২

হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১,২

লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১, ২

বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১, ২

মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১, ২

চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১, ২

অন্ধকারে চিতা-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৩৭

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সৈয়দ ইকবাল

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দুরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

ANDHAKAREY CHITA
By Qazi Anwar Husain
Rana-137

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সেই কালাহারি মরুভূমি থেকে আসছে বাতাস। পর্বতমালার ভেতর ঢুকে পড়ছে, পাথুরে পাঁচিল আর মাটির উঁচু-নিচু কিনারায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙছে, ছোটো ছোটো ঝাপটা আর ঘূর্ণি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে জাম্বেজি উপত্যকার চারদিকে।

একটা পাহাড় চূড়ার খানিকটা নিচে দাঁড়িয়ে আছে সর্দার। জানে, চূড়ায় উঠলে বহু দূর থেকেও আকাশের গায়ে দেখতে পাওয়া যাবে তার কাঠামো। মাসাসা গাছের নতুন গজানো পাতায় তার বিশাল ধড় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, পিছনের কালচে খয়েরি পাথুরে ঢালের সাথে মিশে এক হয়ে গেছে গায়ের রঙ।

আরো বিশ ফিট ওপরে উঠলো সর্দার। চওড়া, লোম ঘেরা নাক দিয়ে বাতাস টানলো, তারপর গুটিয়ে নামিয়ে আনা শুঁড় দিয়ে নিজের হাঁ করা মুখে সেই বাতাস ছাড়লো। ওপরের ঠোঁটের ঝুলে থাকা অংশে, ফিকে লালচে গোলাপ কুঁড়ির পাপড়ি মেলার ভঙ্গিতে, উন্মুক্ত হলো এক জোড়া ঘ্রাণ যন্ত্র—বাতাসের স্বাদ নিলো সে।

সুদূর মরুভূমি থেকে আসছে ঝাঁঝালো, অতি মিহি ধুলো। তার

সাথে মিশে আছে সহস্র ফুলের রেণু। নিচের উপত্যকা থেকে আসছে পাঁঠা-পাঁঠা দুর্গন্ধ, ওখানে এক পাল মোষ চরছে। ঠাণ্ডা একটা স্বাদ পেলো সে, মনে পড়লো পিছনে ফেলে আসা ওই জলাশয়ে পানি খেয়েছে তারা, কাদায় গড়াগড়ি দিয়েছে। আরো কিছু গন্ধের স্বাদ নিলো সে, প্রত্যেকটি পরিচিত, প্রত্যেকটির উৎস জানা আছে তার।

কিন্তু এসব গন্ধ নিয়ে তার কোনো উদ্বেগ নেই। আরো একটা তীব্র গন্ধ খুঁজছে সে, সবগুলোকে ম্লান করে দেয় যার ঝাঁঝ। এটা মাংসাশী প্রাণীর গন্ধ, তার সাথে মিশে আছে তামাক, ঘাম, উল, প্যারাফিন, আর কারবোলিক সাবানের ঝাঁঝ মানুষের গন্ধ। হ্যাঁ, আছে সেটা ; সেই যে ধাওয়া শুরু হবার সময় যেমন জোরালো আর কাছাকাছি ছিলো, এখনও তেমনি আছে।

ঘৃণায়, রাগে ফুঁসতে লাগলো বুড়ো সর্দার। শত সহস্র বছর ধরে তাদেরকে তাড়া করে আসছে এই গন্ধ। পূর্ব-পুরুষরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারেনি, মানুষের হাতে কাতারে কাতারে মারা পড়েছে তারা। সেই ছোটোবেলা থেকে এই গন্ধটাকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে, শিখেছে ভয় পেতে। প্রায় সারাটা জীবন তাকে ধাওয়া করে আসছে এই বৈরী ঝাঁঝ।

কিছুদিন খুব নিরুপদ্রব জীবন কেটেছে। জাম্বেজি নদীর দু'ধারে শান্তিতে ছিলো পালগুলো। বুড়ো সর্দারের জানার বা বোঝার কথা নয়, এই সময়টায় কালো আর সাদা চামড়ার মানুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত ছিলো। এগারো বছরে একটা হাতিও মারা পড়েনি মানুষের হাতে, গোটা এলাকায় নিশ্চিন্তে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখন আবার শুরু হয়েছে ধাওয়া,

ফাঁদে ফেলে আবার তাদের খুন করার জন্যে ছুটে আসছে নিষ্ঠুর মানুষগুলো।

শুঁড় তুলে আবার একবার বাতাস টানলো বুড়ো সর্দার। আতংকে অস্থির হয়ে উঠলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে পাথুরে কিনারা টপকালো সে—পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে থয়েরি একটা আকৃতি ফুটে উঠেই নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

গাছপালার ভেতর প্রায় তিনশো হাতি রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যুবতী প্রায় সব হস্তিনীর সাথেই বাচ্চা, কোনো কোনোটা এতো ছোটো যে মায়ের পেটের নিচে জায়গা করে নিতে পারে। বাচ্চা-গুলো তাদের ক্ষুদে শুঁড় গুটিয়ে কপালের কাছে তুলছে, সেখান থেকে বাঁকা করে ওপর দিকে, মায়ের সামনের দু'পায়ের মাঝখানে ঝুলে থাকা স্তনের বোঁটায় নিয়ে যাচ্ছে। আরো একটু বড় যারা, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে অস্থির করে রেখেছে বয়স্কদের, ভাই-বেরাদারদের কেউ হয়তো শুঁড় তুলে গাছের নরম এক-আধটা ডাল ভেঙে ফেলছে তাদের সামনে। ছোঁড়াছুঁড়িগুলো তবু যদি শান্ত হতো, নিজেদের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া লেগেই আছে ওদের।

যুবক-যুবতী আর বয়স্করা ধীরেসুস্থে খাওয়া সারলো। কাঁটা ঝোপের ভেতর সাবধানে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে আনলো, সেই ফল গলার অনেক ভেতরে এমনভাবে রাখলো যেন বুড়ো মানুষ অ্যাসপিরিন গিলছে। কেউ কেউ দাঁতের চোখা ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে মাসাসা গাছের ছাল আলগা করলো, ফিট দশেক বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুলে থাকা নিচের তেকোণা ঠোঁটের ভেতর ঠেসে দিলো। লম্বা কোনো গাছের কচি পাতা নাগালের মধ্যে না

এলে শরীরের সমস্ত ভার পিছনের দু'পায়ে চাপিয়ে খাড়া হলো তারা, লম্বা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছিঁড়ে নিলো সবুজ পাতা। সমবয়েসী কয়েকজনের দেখাদেখি এক যুবক একা একটা গাছের সামনে দাঁড়ালো, গাছের গায়ে চওড়া কপাল ঠেকিয়ে চার টন ওজনের শরীর দিয়ে ঝাঁকি দিতে শুরু করলো সে। গাছের মগডালগুলো চাবুকের মতো সপাং সপাং আওয়াজ তুলে দুলতে লাগলো, মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়লো পাকা ফলগুলো। ঢালের আরো নিচে দুই মরদ দু'জনের শক্তি এক করে ষাট ফুট লম্বা একটা গাছকে ফেলে দিচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দের সাথে ধরাশায়ী হলো গাছটা, আর ঠিক এই সময় পাহাড়ের চূড়া টপকালো দলপতি। আনন্দ-কোলাহল আর উল্লাস ধ্বনি এমন হঠাৎ করে থেমে গেল, যেন দাঁড়িয়ে পড়লো সময়। অটুট নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো বাজছে কানে।

বাচ্চারা মায়ের গায়ের সাথে সেঁটে এলো, বয়স্করা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে গেল। প্রত্যেকে যে যার কান বাইরের দিকে মেলে দিয়েছে, ঘন ঘন কোঁচকাচ্ছে শুধু শুঁড়ের ডগা।

হলুদ আইভরি উঁচু করে, হেলে দুলে নেমে এলো সর্দার। তার উদ্বেগ আর অস্থিরতা টের পাওয়া যায় ফুটো হয়ে যাওয়া কান খাড়া হয়ে আছে দেখে। এখনো সে মানুষের গন্ধ নিয়েই আছে। সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে মেয়েদের একটা দল, সামনে এসে শুঁড় লম্বা করলো সে, তাদের গায়ের ওপর বাতাস ছাড়লো।

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো ওরা, অভ্যেসবশে বাতাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলো, বিপদের গন্ধ যাতে সরাসরি পেতে পারে। দলের বাকি সব হাতি দৃশ্যটা দেখলো, সাথে সাথে ছুটলো তারা, গোটা পাল ছুটন্ত একটা ঝাঁকের আকৃতি পেলো। বাচ্চাদের কাছে টেনে

নিয়ে মায়েরা থাকলো ঝাঁকের মাঝখানে, তাদেরকে ঘিরে থাকলো বৃদ্ধা রাণী মাতারা। যুবকরা থাকলো ঝাঁকের মাথার দিকে, তীর চিহ্নের আকৃতি নিয়ে পথ দেখিয়ে ছুটছে তারা, তাদের দু'পাশে থাকলো অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধরা। গোটা দলটা মাটি কাঁপিয়ে, হেলেছুলে ছুটছে, কোথাও মুহূর্তের জন্যে না থেমে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা এভাবে ছুটতে পারবে ওরা।

পাল নিয়ে পালাতে শুরু করলেও, বিমূঢ় ভাবটা বুড়ো সর্দারের মনে থেকেই গেল। এরকম ধাওয়া তার অভিজ্ঞতার বাইরে। আজ আট দিন ধরে তাড়া করা হচ্ছে তাদের, অথচ একবারও কাছাকাছি আসছে না শত্রুরা। দক্ষিণে রয়েছে তারা, ওকে তাদের গন্ধ শুঁকতে দিচ্ছে, কিন্তু প্রায় সারাক্ষণ ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকছে। মনে হচ্ছে সংখ্যায় তারা অনেক, দক্ষিণের সবটুকু পথে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা জাল তৈরি করে রেখেছে। মাত্র একবার তাদের দেখেছে ও। ধাওয়া শুরু হবার চারদিন পর, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে, পাল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ও, লাইন ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হলুদ ঘাসের ভেতর থেকে লাঠি আকৃতির অনেক মানুষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, খালি প্যারাফিনের টিনে বাড়ি দিয়ে আর রঙিন কাপড় নেড়ে ভয় দেখাতে শুরু করে ওদের। সাহস হারিয়ে ফেলে সর্দার, ঘুরে দাঁড়িয়ে, পাল নিয়ে চলে আসে পর্বতমালার দিকে।

উঁচু-নিচু পর্বতমালার ভেতর দিয়ে হাজার বছর ধরে আসা-যাওয়া করছে হাতির পাল। পূর্ব-পুরুষদের রেখে যাওয়া পথ চলার চিহ্ন ধরে দুর্গম এলাকাটা পেরিয়ে এসেছে ওরা। সরু গিরিখাদের ভেতর দিয়ে কখনো একজনের পিছনে একজন লাইন দিয়ে আসতে হয়েছে,

কখনো নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে অতি সাবধানে এক পা এক পা করে উঠতে হয়েছে ঢালের মাথায়।

দলটাকে রাতের বেলাও বিশ্রাম দিলো না সর্দার। আকাশে চাঁদ না থাকলেও, জ্বলজ্বলে তারা আছে, অন্ধকার আফ্রিকান জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চললো ওরা। একবার, মাঝরাতে, ট্রেইলের একপাশে দাঁড়িয়ে পালটাকে এগিয়ে যেতে দিলো সর্দার। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার মানুষের গন্ধ এলো ওর নাকে। অনেক দূরে, অস্পষ্ট, কিন্তু আছে। আছে, সব সময় আছে।

সকালে এমন একটা এলাকায় পৌঁছুলো সর্দার, যেখানে গত দশ বছরে একবারও আসেনি সে দল নিয়ে। নদী বরাবর সরু কিন্তু দীর্ঘ একটা বিস্তৃতি জুড়ে কোনো গাছপালা নেই, সব কেটে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধের সময় এখানে সৈন্যদের ঘাটি ছিলো। লোকজনের বসবাস, তাই এতোদিন এলাকাটাকে এড়িয়ে এসেছে সর্দার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাড়া খেয়ে আজ ওকে আসতে হলো এখানে।

পালটা এখন আর আগের মতো অস্থির নয়। ধাওয়ারত মানুষ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। ছোটার গতি কমিয়ে দিয়ে পথের দু'পাশে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে ওরা। এদিকে, উপত্যকার সমতলে, বনভূমি অনেক বেশি সবুজ আর রসালো। মাসাসা জঙ্গল মোপানি আর বেওব্যাব গাছকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। সামনে পানির আভাস পেয়ে বুড়ো সর্দারের বিশাল পেট থেকে ভরাট আওয়াজ উঠে এলো—তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বাচ্চা আর মেয়েদের কথা ভেবে অস্থির বোধ করলো সে। কিন্তু তার মন খুঁত খুঁত করছে। পিছনে তো বিপদ আছেই, তার ধারণা, বিপদ সামনেও আছে। বার বার থামলো সে, বিশাল কালো মাথা এদিক ওদিক

দোলালো, কান দুটো টান টান করে বাইরের দিকে মেলা। আবার চলতে শুরু করার আগে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বিপদের আভাস পেতে চাইলো।

হঠাৎ করে সে থমকে দাঁড়ালো। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কিছু একটা চোখে পড়েছে। সকালের রোদে ঝিক করে উঠেছে সেটা। চমকে উঠে পিছিয়ে এলো সে, তার পিছনে গোটা পাল পিছু হটলো। তার ভয় নিমেষের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে ওদেরকেও।

চকচকে ধাতব জিনিসটার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সর্দার। ধীরে ধীরে তার ভয় কেটে যেতে লাগলো। কারণ বাতাসের মৃদু ফিসফিসানি, পাখির কলগুঞ্জন, পোকামাকড়দের ঝাঁ-ঝাঁ ঝিঁ-ঝিঁ ডাক ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। তবু অপেক্ষা করলো বুড়ো দলপতি, তাকিয়ে থাকলো সামনে। রোদ জায়গা বদল করায় দেখতে পেলো হুবহু একই রকম ধাতব বস্তু তার সামনে লাইন করে রাখা হয়েছে। সামনের এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার চাপালো সে, অস্বস্তি আর দ্বিধার মধ্যে পড়ে গলার ভেতর ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে। গালভ্যানাইজড শীটমেটালের তৈরি ছোটো, চারকোণা ফলক দেখে ঘাবড়ে গেছে সর্দার। মাটিতে লোহার একটা নল গাঁথা হয়েছে, নলের মাথায় ফলক। প্রতিটি ফলকে দুটো বাক্য লেখা—'ডেঞ্জার। মাইন ফিল্ড।' লাল রঙের লেখাগুলো কালের আঁচড়ে কালচে হয়ে গেছে, কোনো কোনো ফলকের লেখা পড়াই যায় না। লেখাগুলোর ওপর আঁকা রয়েছে একটা করে মানুষের মাথার খুলি, আর ক্রস চিহ্নের আকৃতি নিয়ে একজোড়া হাড়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাম্বিয়া থেকে নদী পেরিয়ে রোডেশিয়ায় ঢুকছিল মুক্তিযোদ্ধারা, তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে স্মিথ সরকারের

শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী এই মাইন পুঁতেছিল। লক্ষ লক্ষ অ্যান্টি-পার্সনেল মাইন, এবং তারচেয়ে কিছুটা ভারি ক্লেমোর মাইন বিশাল একটা জায়গা জুড়ে পোঁতা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর জিম্বাবুই সরকারের পক্ষে এই মাইনফিল্ড পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

বুড়ো সর্দার ইতস্তত করছে, এমনি সময় তীব্র ঝড়ের আওয়াজ উঠলো। পালের পিছন থেকে আসছে শব্দটা, সেই দক্ষিণ থেকেই। ক্ষেপে গিয়ে মাইনফিল্ডের দিকে দ্রুত পিছন ফিরলো সর্দার।

জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে গাঢ় রঙের একটা আকৃতি, বিকট আওয়াজ করা রূপালি একটা চাকতির নিচে ঝুলে আছে। ঝড় নয়, কিন্তু ঝড়ের বেগেই পালের দিকে নেমে এলো সেটা। গাছের ডালপালা বাতাসের ধাক্কায় নুয়ে পড়লো, শুকনো মাটি থেকে উঠলো লাল ধুলোর পাহাড়।

দিশেহারা সর্দার ঘুরে দাঁড়ালো, একটা ফলকের গা ঘেঁষে ছুটে ঢুকে পড়লো মাইনফিল্ডে। আতংকিত গোটা পাল দৌড় দিলো তার পিছু পিছু।

মাঠে ঢুকে পঞ্চাশ মিটার এগিয়ে ঘাড় ফেরাতে যাবে সর্দার, ঠিক তখনই প্রথম মাইনটা বিস্ফোরিত হলো। মোটা চামড়ায় মোড়া তার পিছনের ডান পা ফুঁড়ে ওপর দিকে উঠে এলো আগুনের একটা ঝলক, যেন কুঠারের এক কোপে দু'ভাগ করে দিলো পা-টাকে। তিন পায়ে ছুটলো সর্দার, আহত পায়ের সাদা চকচকে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কাঁচা লাল মাংস ঝুলছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের মোটা একটা ধারা। দ্বিতীয় মাইনটা আঘাত করলো সামনের ডান পায়ে, গোড়ালি পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিলো। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো সর্দার, কেঁপে উঠলো মাটি, বিধ্বস্ত পা দুটো হাঁটুর

কাছে ভাঁজ খেয়ে পেরেকের মতো গেঁথে রেখেছে তাকে। তার চারদিকে উন্মত্ত হাতির পাল, মাইনফিল্ডের আরো ভেতরে ঢুকে পড়ছে তাকে পাশ কাটিয়ে।

প্রথম দিকে বুম বুম বিস্ফোরণের আওয়াজে কোনো ছন্দ থাকলো না, শুধু মাঠের কিনারা থেকে খানিক পর পর দু'একটা করে মাইন ফাটলো। কিন্তু একটু পরই ঘন ঘন বিস্ফোরণে অপার্থিব একটা ছন্দের সৃষ্টি হলো, কারা যেন নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠে ড্রাম বাজাচ্ছে। মাঝেমধ্যে চার কি পাঁচটা মাইন একসাথে ফাটছে, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শতগুণ হয়ে ফিরে আসছে প্রতিধ্বনিগুলো।

সেই সাথে রয়েছে হেলিকপ্টারের গর্জন। ঘুড়ির মতো গোত্তা দিয়ে নেমে এলো সেটা, মুহূর্তে দিক বদলালো, মাইনফিল্ডের দিকে আরো একটু নামলো—পালটাকে তাড়া করছে ওটা। দু'একটা হাতি ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে দৌড় দিলো, ধাওয়া করে আবার তাদেরকে মাইনফিল্ডে ফিরিয়ে আনলো হেলিকপ্টার। বাচ্চা একটা হাতি কোথাও একটু চোট না খেয়ে, বহাল তবিয়তে পৌঁছে গেছে মাইনফিল্ডের ওপারে, নদীর নিরাপদ কিনারায়, তাকেও খেদিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো—এবার একটা মাইনে পা পড়লো তার, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পিছনের দুই পা। অবশিষ্ট পা দুটো আকাশের দিকে ঘন ঘন ছুঁড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো অবোধ শিশু।

প্রতিটি মাইনের সাথেই বিস্ফোরিত হচ্ছে ধুলো, উপত্যকার স্থির বাতাসে লালচে কুয়াশার মতো ধুলোর পর্দা বীভৎস দৃশ্যের খানিকটা অন্তত আড়াল করতে পারছে। ধুলোর পাহাড় মোচড় খাচ্ছে, পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে গাছগুলোর মাথার কাছাকাছি। এক-

সময় গোটা দৃশ্য প্রায় ঢাকা পড়ে গেল লালচে পর্দায়, শুধু বিস্ফোরণের মুহূর্তে এক ঝলক তীব্র আলোয় দেখা গেল কয়েক শো হাতি গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তের বন্যায়।

এক বুড়ি, তার চারটে পা-ই উড়ে গেছে, শক্ত মাটিতে মাথা দিয়ে খাড়া হবার চেষ্টা করছে। এক যুবতী মাটিতে পেট ঘষে ঘষে সামনে এগোচ্ছে, অসাড় পিছনের পা দুটো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, পাশের বাচ্চাটাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার তাগিদে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। একটা ক্লেমোর তার পেটের নিচে বিস্ফোরিত হলো, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো নাড়িভুঁড়ি, সেই সাথে ছিঁড়ে নিয়ে গেল বাচ্চাটার গোটা মুণ্ডু।

বেশ অনেকগুলো বাচ্চা হাতি মায়েদের কাছ থেকে সরে এসেছে। ধুলোর ভেতর দিয়ে দিকবিদিক ছুটছে তারা, আতংকে মাথার সাথে সেঁটে আছে কান। হেলিকপ্টার থেকে ব্রাশ-ফায়ার করে ধরাশায়ী করা হলো তাদের।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই হত্যাযজ্ঞ, একসময় বিস্ফোরণের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এলো। তারপর নিস্তব্ধতা নামলো মাঠে। ফলকের এদিকে, নিরাপদ ঘাসে, যান্ত্রিক দানবের মতো বসে আছে হেলিকপ্টার। ইঞ্জিন বন্ধ, রোটর থেমে গেছে। এখনো শুধু শোনা যাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী পশুদের গোঙানি। হেলিকপ্টারের ফিউজিলাজ হ্যাচ খোলা হলো, ওখান থেকে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো এক লোক।

লোকটা কালো, রঙচটা ডেনিম জ্যাকেট আর ধূসর রঙের জিনস্ পরে আছে—জ্যাকেটের আস্তিন দুটো সযত্নে কাটা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ডেনিম ছিলো গেরিলা যোদ্ধাদের আনঅফিশিয়াল

ইউনিফর্ম। তার পায়ে সৌখিন, পশ্চিম ইউরোপে তৈরি জুতো, মাথার উপর তোলা রয়েছে সোনালি রিমের পোলারয়েড অ্যাভিয়েটর'স সানগ্লাস। এগুলো এবং তার বুক-পকেটে আটকানো বল-পয়েন্ট পেনের সারি, প্রত্যেকটি এক একটা ব্যাজ—অভিজ্ঞ গেরিলারা দেখলেই তার পদমর্যাদা বুঝে নেবে। তার ডান বগলের নিচে এ-কে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। মাইন ফিল্ডের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো সে, ঝাড়া পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে বীভৎস দৃশ্যটা উপভোগ করলো, তারপর ঠোঁটে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে ফিরে এলো 'কপ্টারের কাছে।

চেহারায় শ্রদ্ধা আর চোখে সতর্ক ভাব নিয়ে অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে পাইলট। কিন্তু অফিসারের মনোযোগ রয়েছে, 'কপ্টারের ফিউজিলাজের দিকে।

সমস্ত প্রতীক চিহ্ন আর আইডেনটিফিকেশন নাম্বার ঢেকে রাখা হয়েছে মাস্কিং টেপ দিয়ে, তারপর টেপের ওপর স্প্রে করা হয়েছে অ্যারোসল ক্যান থেকে কালো এনামেল। এক জায়গায় আলগা হয়ে গেছে টেপ, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আইডেনটিফিকেশন লেটারিঙের একটা কোণ। তালু দিয়ে টেপটা আবার বসিয়ে দিলো অফিসার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা মোপানি গাছের ছায়ার দিকে এগোলো।

গাছের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখলো সে, মাটিতে রুমাল বিছিয়ে বসলো, তারপর আয়েশ করে ডানহিল ধরালো একটা।

তিনশো হাতি।—ভাবলো সে।—কতো লোক আর বিস্ফোরক লাগতো? অথচ বলতে গেলে কোনো খরচই হলো না। নাহ, স্বীকার করতে হবে, জেনারেলের মাথায় বুদ্ধি আছে। আর কারো মাথায় এই মতলব আসতোই না।

অফিসারের চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। সিগারেট শেষ করে আগুন নেভালো সে, শেষ অংশটুকু তালুর ওপর ফেলে ডলে ডলে পাউডার বানিয়ে ফুঁ দিলো। গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে এলো তার মাইন ফিল্ডের গোঙানি আর কাতরানি তার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না।

লোকজনের কথা বলার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো তার। গাছের গা থেকে পিঠ তুলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠেছে—চট করে একবার সূর্যের দিকে তাকালো। ঢলে পড়েছে সূর্য, বিকেল হয়ে এসেছে।

হেলিকপ্টারের কাছে এসে পাইলটের ঘুম ভাঙালো অফিসার। বললো, 'ওরা আসছে।' 'কপ্টারে উঠে হাতে লাউড হেইলার নিয়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালো সে। তাচ্ছিল্য ভরা কৌতুকের সাথে তাকিয়ে থাকলো জঙ্গলের দিকে।

গাছপালার আড়াল থেকে দলের প্রথম লোকটি বেরিয়ে এলো। 'বেবুন!' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করলো অফিসার। এক উপজাতির লোক আরেক উপজাতির লোককে দু'চোখে দেখতে পারে না, পরস্পরকে সাধারণত তারা কুকুরমুখো বানর বলেই সম্বোধন করে। অবশ্য পেটে খানিকটা বিদ্যে পড়লে স্বগোত্রের লোকদেরও বেবুন বলতে দ্বিধা করে না অনেক আফ্রিকান।

লম্বা একটা লাইন ধরে এলো ওরা, এলো হাতিদের পথ অনুসরণ করে। আড়াইশোর ওপর লোক, পরনে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি আলখেল্লা। পুরুষরা আগে পৌঁছুলো, পিছু পিছু মেয়েরা। মেয়েদের অনেকেরই বুক ঢাকা নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুবতী—হাঁটার ছন্দে গুরু নিতম্বে ঢেউ উঠলো। বেশির ভাগ যুবতীর পরনে এক

টুকরো চামড়া, তাতে শুধু নাভির নিচে খানিকটা জায়গা লুকানো গেছে। মেয়েদের দিকে চোখ পড়তে অফিসারের চেহারা বদলে গেল, লোভে চকচক করে উঠলো দৃষ্টি। জিনসের হ্‌পকেটে হাত ভরে নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিলো, সময় পেলে গুরু নিতম্বিনীদের একজনকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসা যাবে। মাইন ফিল্ডের কিনারা জুড়ে সার বেঁধে দাঁড়ালো ওরা, পাখির মতো কিচিরমিচির করছে। কেউ কেউ হেসে গড়িয়ে পড়লো, আঙ্গুল তুলে পরস্পরকে দেখালো আহারের কি বিপুল সমারোহ।

উল্লাসে আত্মহারা হবার জন্যে ওদেরকে খানিকটা সময় দিলো অফিসার। আট দিন ধরে হাঁটার ওপর রয়েছে ওরা, প্রায় কোনো বিশ্রাম ছাড়াই, পালা করে প্যারাফিন টিন বাজিয়ে পর্বতমালা থেকে নামিয়ে এনেছে হাতির পালটাকে।

অপেক্ষা করার সময় আরো একবার জেনারেলের কথা ভেবে শ্রদ্ধা বোধ করলো অফিসার। এই অসভ্য লোকগুলোকে জেনারেল তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক দৃঢ়তার সাহায্যে বশ করেছেন। গোটা অপারেশনের সমস্ত কৃতিত্ব ওই একজনেরই।

পনেরো মিনিট পর মুখের সামনে লাউডহেইলার তুলে হুংকার ছাড়লো অফিসার। 'চুপ! সবাই চুপ!' ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে কাজের ফিরিস্তি দিলো সে, কে কি কাজ করবে তাও বলে দিলো।

যাদের কাছে কুঠার আর ধারালো অস্ত্র আছে শুধু তারা কসাইয়ের দলে থাকবে। মেয়েদের একটা দল স্মোকিং র‍্যাক তৈরি করবে, আরেকটা দল মোপানি গাছের ছাল দিয়ে বানাবে ঝুরি। বুড়ো আর নিরস্ত্রদের পাঠানো হলো কাঠ আর গাছের ডালপালা সংগ্রহ করার জন্যে, আগুন জ্বালাতে হবে। এরপর আবার কসাইদের

দিকে ফিরলো অফিসার।

উপজাতিদের কেউ কখনো প্লেন বা 'কপ্টারে চড়েনি। প্রথম লোকটাকে 'কপ্টারে তোলার জন্যে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারতে হলো অফিসারকে। মাইন ফিল্ডের ওপর উড়ে এসে শূন্যে ঝুলে থাকলো 'কপ্টার। ঠিক নিচেই একটা প্রকাণ্ড হাতির ধড়।

দরজায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে বুড়ো হাতিটার দিকে তাকালো অফিসার। মোটা, বাঁকানো আইভরি দেখে গালভরা হাসি ফুটলো মুখে। মারা গেছে হাতিটা। পাইলটকে ইঙ্গিত দিলো সে, 'কপ্টার আরো নিচে নামাতে হবে।

বয়স্ক একজন লোকের কানের কাছে মুখ নামিয়ে অফিসার চিৎকার করে বললো, 'সাবধান, মাটিতে যেন পা না পড়ে।' সারা শরীর ঝাঁকি খেলো লোকটার। 'প্রথমে দাঁত, তারপর মাংস।' লোকটা আবার শরীর ঝাঁকালো। হ্যাঁ, বা না বলার এটাই তার ধরন। অফিসার তার পিঠ চাপড়ে দিলো, লাফ দিয়ে হাতির পেটে নামলো সে। পেটটা এরই মধ্যে ফুলতে শুরু করেছে। লোকটার পিছু পিছু কুঠার হাতে নিয়ে নামলো আরো কয়েকজন।

এবার অন্য একটা হাতির ওপর চলে এলো 'কপ্টার, এটারও ঠোঁট থেকে ভারি সুন্দর আইভরি বেরিয়ে রয়েছে। এই হাতিটা বেঁচে আছে এখনো, মাটিতে নিতম্ব দিয়ে বসার ভঙ্গিতে ছিলো, ধুলো আর রক্ত মাখা শুঁড় দিয়ে ঝুলে থাকা 'কপ্টারকে ধরতে চেষ্টা করলো সে।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে এ-কে ফরটিসেভেন তাক করলো অফিসার, হাতির ঘাড়ের পিছনে একটা মাত্র গুলি করলো। বাচ্চার পাশে মুখ থুবড়ে পড়লো মা। কসাইদের দ্বিতীয় দলটাকে নামতে

বললো সে।

হাতির মাথার ওপর সাবধানে বসে কাজ শুরু করলো কসাইরা। সাদা হাড় থেকে এক এক করে দাঁতগুলো আলগা করলো তারা কুঠারের মাপা কোপ দিয়ে। এরা সবাই এই কাজে দক্ষ, জানে, অজায়গায় একটা কোপ পড়লে আইভরির আর প্রায় কোনো দামই থাকবে না। অফিসারের হাবভাব দেখে তারা বুঝে নিয়েছে, আইভরি নষ্ট হলে এই লোক আস্ত রাখবে না। কাজেই অত্যন্ত যত্নের সাথে কাজ করে চললো সবাই। একটা করে দাঁত তোলা হয়, বাঁধা হয় রশি দিয়ে, তোলা হয় 'কপ্টারে। কাজ শেষ হলে কসাইয়ের দলটাকে নামানো হয় আরেকটা হাতির ওপর।

রাত নামার আগেই বেশিরভাগ হাতি মারা গেল, নয়তো গুলি করে মেরে ফেলা হলো। তারপরও কিছু হাতি বেঁচে থাকলো, তাদের করুণ কাতরানির সাথে যোগ হলো শেয়াল আর হায়েনার অবিরাম হাঁক-ডাক। টর্চ লাইটের আলোয় কাজ চালিয়ে গেল কসাইরা। ভোরের দিকে সমস্ত আইভরি সংগ্রহ করা হয়ে গেল।

কসাইরা এবার হাতীর শরীর নিয়ে ব্যস্ত হলো। রোদের তাপ বাড়ার সাথে সাথে আরো সহজ হয়ে গেল ওদের কাজ। রক্ত আর কাঁচা মাংসের গন্ধ তো আছেই, নাড়িভুঁড়িতে জমে থাকা গ্যাসের সাথে এবার যোগ হলো চর্বি আর মাংস পচা দুর্গন্ধ। একটা করে নিতম্ব বা কাঁধ আলাদা হওয়া মাত্র সেটাকে মাইন ফিল্ড থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল 'কপ্টার। ওখানে মেয়েরা মাংসগুলোকে ফালি ফালি করে কাটছে, কেটে স্মোকিং র‍্যাকের গনগনে আগুনের ওপর সার সার ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

কাজ তদারক করছে অফিসার, আর মনে মনে অপচয়ের হিসেব

করছে। দুঃখের ব্যাপার, চামড়াগুলো রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটা চামড়ার জন্যে হাজার ডলার করে পাওয়া যেতো। কিন্তু ব্যবস্থা নেই, পচন ঠেকানো যাবে না। মাংস এক-আধটু পচলে কিছু এসে যায় না, আফ্রিকানদের জিভে ওগুলো বরং বেশি মজা লাগবে।

পাঁচশো টন ভিজে মাংস আগুনে ঝলসানোর পর কমে অর্ধেক হয়ে যাবে ওজনে। এই শুকনো মাংস কিনবে প্রতিবেশী দেশ জাম্বিয়ার তামা খনির মালিকরা, খনি শ্রমিকদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাবার জন্যে। ইতিমধ্যে দর-দাম হয়ে গেছে, প্রতি পাউণ্ড স্মোকড মিটের জন্যে দুই মার্কিন ডলার। তারপর, আইভরি তো আছেই।

পাহাড়ের ওপর, নির্জন একটা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আইভরিগুলো। লাইন করে রাখা হয়েছে সব। বাছাই করা দক্ষ একদল লোক পরিষ্কার করছে ওগুলো। প্রতিটি দাঁতের এক প্রান্তে গর্ত রয়েছে, ভেতরে একগাদা শিরা আর নার্ভ জড়াজড়ি করে মোচার আকৃতি নিয়েছে। ওগুলো পরিষ্কার করার পর, দাঁতের গা থেকে সাফ করা হচ্ছে রস, রক্ত, মাংসের কণা ইত্যাদি। কাস্টমস অফিসারদের নাক বড় সাংঘাতিক, একটু গন্ধ পেলেই ধরে ফেলবে সদ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এগুলো।

সব মিলিয়ে চার শো দাঁত। এর মধ্যে কিছু রয়েছে মাত্র পাউণ্ড কয়েক ওজনের, নেয়া হয়েছে কিশোর হাতীর মুখ থেকে। তবে বয়স্ক হাতিগুলোর এক একটা দাঁত কম করেও আশি পাউণ্ড হবে। গড়পড়তায় প্রতিটা বিশ পাউণ্ড ধরা চলে। হংকঙের বাজারে প্রতি পাউণ্ড আইভরির দাম একশো ডলার, তার মানে সব মিলিয়ে আট লাখ ডলার। মাত্র দু'চার দিনের কাজ, লাভের অংক এক মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। অথচ এদেশে বয়স্ক একজন পুরুষের সারা

বছরের আয় ছয় শো ডলারেরও কম।

অবশ্য এই অপারেশনে খুচখাচ কিছু খরচা আরো আছে। একটা হাতির আধ-কাটা ধড় থেকে পড়ে গেল একজন কসাই, সরাসরি একটা অ্যান্টি পারসনেল মাইনে পড়লো সে।

'ব্যাটা বেবুনের লেজ।' গাল পাড়লো অফিসার। লোকটা মারা যাওয়ায় তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি, রেগে গেছে কাজ পিছিয়ে যাবে বলে। লাশটা সরিয়ে এনে কবর দিতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এই একটা ঘণ্টা কাজ থেকে হাত গুটিয়ে রাখলো সবাই।

আরেকজন লোক কুঠারের কোপ খেয়ে একটা পা হারালো। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অল্প-বিস্তর আহত হলো আরো দশ-বারো জন। রাতের বেলা গুলি খেয়ে মারা গেল এক কসাই। তার বউকে জঙ্গলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল অফিসার, সে প্রতিবাদ করায় মরতে হলো তাকে। তবে, লাভের কথা ভাবলে, খরচ একেবারে নগণ্য বলে মনে হয়। অফিসারের মনে আনন্দ ধরে না—জেনারেল ভারি খুশি হবেন।

তিন দিনের দিন আইভরি পরিষ্কারের কাজ শেষ হলো। পরীক্ষা করে দেখলো অফিসার, সন্তুষ্ট হলো। শ্রমিকদের ওখান থেকে সরিয়ে সমতল মাঠে পাঠিয়ে দেয়া হলো, স্মোকিং র‍্যাকে কাজ করার জন্যে। গোটা ক্যাম্প খালি করা হলো, গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর যিনি আসছেন তাঁকে যেন কেউ দেখতে না পায়।

হেলিকপ্টারে চড়ে এলেন তিনি। চকচকে আইভরি সার সার রাখা রয়েছে, পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে থাকলো অফিসার। রোটরের বাতাসে তার জ্যাকেট ফুলে উঠলো কাছাকাছি এক জায়গায় নামলো হেলিকপ্টার, একজন কর্তা গোছের

ব্যক্তিকে দেখা গেল দরজায়। সুদর্শন চেহারা, শক্ত সমর্থ শরীর, কালো মেহগনি রঙের মুখে চৌকো সাদা দাঁতগুলো মুক্তার মতো আলো ছড়াচ্ছে। কোঁকড়ানো আফ্রিকান চুল খুলি কামড়ে আছে। পরনে দামী-গ্রে রঙের স্যুট, ইটালি থেকে তৈরি করে আনা। স্যুটের নিচে সাদা শার্ট, গাঢ় নীল রঙের টাই। দুর্লভ চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো জোড়া চকচক করছে।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কর্তাকে স্যালুট করলো অফিসার। 'জেনারেল' আপনি এসেছেন সেজন্যে আমি ধন্য।'

'না-না,' ভারি গলায় হেসে উঠলেন জেনারেল। 'জেনারেল নয়, শুধু জেনারেল নয়। এখন আমি একজন মন্ত্রীও।'

একজন মন্ত্রী। সফল একজন আইভরি পোচারও বটে।

দুই

সুস্থ হবার পর গোজো থেকে বেরিয়েছে মাসুদ রানা।

গোজোয় থাকতেই বি, সি, আই, হেড কোয়ার্টার, ঢাকার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল ওর। সি. আই. এ, এখন আর ওর জন্যে কোনো বিপদ নয়, এই মেসেজটা হেড় কোয়ার্টার থেকে পায় ও। জানতে পারে, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স রানা এজেন্সীর শাখা অফিস-গুলোয় হামলা চালাবার চেষ্টা করেছিল বটে, তবে বি. সি. আই-কে নাক গলাতে হয়নি, এজেন্সীর অপারেটররাই ওদেরকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কিন্তু এজেন্সীর লোকজনেরা অনেকদিন ধরে চীফের

সাক্ষাৎ না পেয়ে হতাশায় ভুগছে, ওদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে শাখাগুলোয় একবার করে ঢুঁ মারা দরকার রানার।

দুনিয়া ঘুরে নিউইয়র্কে এসে থামলো রানা। এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। লম্বা একটা ছুটি দরকার ওর, সোহেলের মাধ্যমে পটিয়ে বুড়োর অনুমোদন আদায় করতে হবে। ছুটি পাওয়া গেলে জিম্বাবুইয়ে যাবে ও। রেবেকার বিশাল একটা জায়গা আছে ওখানে, বুনো হাতি থেকে শুরু করে গণ্ডার, বাঘ সব আছে সেখানে। রেবেকাকে কথা দেয়া ছিলো, ওই জায়গায় বেড়াতে যাবে ও, যখনই মন খারাপ করবে, কদিনের জন্যে হলেও যাবে ওখানে।

মন ভালো নেই রানার। লুবনাকে ভুলতে চায় ও। প্রতিশোধে হয়তো গায়ের জ্বালা কিছুটা মেটে, কিন্তু তাতে প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়া যায় না।

আসলে প্রকৃতির সঙ্গ চাইছে রানা। সঙ্গ চাইছে কোনো প্রিয়-জনের। কিছুটা সময় হাসি আনন্দে কাটানো দরকার, এমন এক-জনের সঙ্গ দরকার যে তাকে লুবনার কথা ভুলিয়ে দেবে।

চিন্তার এই সূত্র ধরে সোহানার কথাই প্রথমে মনে পড়েছিল, টেলিফোনে কথা বলার সময় সোহেলকে সোহানার কথা জিজ্ঞেসও করেছিল ও। কিন্তু সোহেল দায়সারা গোছের একটা উত্তর দিয়ে প্রসঙ্গ থেকে সরে যায়। সোহানা নাকি বিদেশে কী একটা গোপন মিশন নিয়ে ব্যস্ত। মাসকয়েকের মধ্যে তার সাথে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা রানার নেই।

আজই প্লেনের টিকেট কাটবে রানা। ইচ্ছে কালকের ফ্লাইটে ঢাকা রওনা হবে। কিন্তু টিকেট কাটার আগে আরো একটা কাজ বাকি রয়েছে নিউইয়র্কে। বিশ্ব ব্যাংকের একজন অফিসারের সাথে

দেখা করতে হবে ওকে।

নির্দেশটা ঢাকা থেকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আন-অফিশিয়ালি। সোহেল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, আন-অফিশিয়াল হলেও ভদ্রলোকের সাথে দেখা করাটা নাকি খুবই জরুরী। ব্যাপারটা কি নিয়ে, কিছুই জানা যায়নি। সোহেল বলেছে, সে-ও কিছু জানে না।

খুব যে জরুরী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গত তিনদিনে ছয়-বার টেলিফোন এসেছে রানার হোটেলে, প্রতিবার জানতে চাওয়া হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের ওই অফিসারের সাথে দেখা করার জন্যে কখন সময় দিতে পারবে রানা।

আজ বিকেলে সময় দিয়েছে রানা। আর আধ ঘণ্টা পর অ্যাপ-য়েন্টমেন্ট। তৈরি হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো ও।

বিশ্ব ব্যাংকের এই অফিসটা সেণ্ট্রাল পার্ক এভিনিউয়ে। এলি-ভেটরে চড়ে সাতাশ তালায় উঠে এলো রানা। এলিভেটর থেকে বেরোতেই রিসেপশন হল। ডিম আকৃতির বিশাল কাঁচ ঘেরা কামরা, চারদিক থেকে বেড় দিয়ে রেখেছে সাদা করিডর। রিসেপশনে পা দিয়ে থতমত খেয়ে গেল ও। চারদিকে ফুল আর মেয়ে। ভুল করে অন্য কোথাও চলে এলো নাকি?

এক এক করে ওদের দেখলো রানা। চারটে টেবিলে চার ললনা। দু'জন নীল নয়না, একজন সবুজ নয়না, অপরজনের কালো হরিণ চোখ। প্রতিটি টেবিলে ফুলদানি আর ফুল। দু'জন টেলিফোনে কথা বলছে, সুশ্রী চেহারায় কৌতুক বা তরল কোনো ভাব নেই। বাকি দু'জন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সুন্দর চেহারায় মিষ্টি আর ভদ্র হাসি, কিন্তু আমন্ত্রণ বা প্রশ্রয় নেই। নিজেদের কাজে সিরিয়াস এরা, কারো মনোরঞ্জন করতে বসেনি।

কৃষ্ণনয়নাকে এশিয়ার মেয়ে বলে মনে হলো। পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে তার সামনে ধরলো রানা। কার্ডের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালো মেয়েটা, হাত চলে গেছে ইন্টারকমের সুইচে। 'স্যার—মাসুদ রানা।' এক সেকেণ্ড পর ইন্টারকমের সুইচ অফ করে কলিং বেলের সুইচ টিপলো মেয়েটা। প্রায় সাথে সাথে উর্দি পরা এক যুবক ঢুকলো রিসেপশনে। 'মিঃ মাসুদ রানা, ওর সাথে যান, প্লিজ—মিঃ জাসটিন চ্যাপেল আপনার অপেক্ষা করছেন।'

ধন্যবাদ দিয়ে যুবকের পিছু নিলো রানা। রিসেপশন থেকে বেরুবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েগুলোর দিকে একবার তাকালো ও। উঁহুঁ, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই।

করিডর থেকে সরু একটা প্যাসেজে, তারপর আবার একটা করিডরে চলে এলো ওরা। একটা দরজার সামনে থামলো যুবক, পর্দা সরিয়ে এক পা ভেতরে ঢুকলো। 'মিঃ মাসুদ রানা, স্যার।'

দরজার মাথায় নেমপ্লেট দেখে রানার চক্ষু চড়কগাছ। লেখা রয়েছে—জাসটিন চ্যাপেল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতোক্ষণে ওর টনক নড়লো, আন-অফিশিয়াল হোক আর যাই হোক, সিরিয়াস কিছু একটা না হয়েই পারে না। বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মস্ত একটা ব্যাপার। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, তিনি শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো রানা, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আর্দালী। প্রথমেই নজরে পড়লো কাকের বাসা—এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল, হলদেটে কপালটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। ঘন ভুরুর নিচে বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ, খুঁটিয়ে দেখছে ওকে।

'আসুন, মিঃ রানা,' রিভলভিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, মুখে স্মিত হাসি।

মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা কয়েকটা জানালা। একটা পর্দার দু'পাশ দিয়ে এক ফালি করে রোদ ঢুকেছে, বাইরে বেরিয়ে গেছে এক প্রস্থ তার, আকাশের গায়ে ক্ষুদে একটা জালের মতো অ্যান্টেনা।

'জাসটিন চ্যাপেল,' বললেন ভদ্রলোক, 'সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আফ্রিকান ডিভিশন।' রানার হাত ছেড়ে দিয়ে গদি মোড়া একটা চেয়ার দেখালেন তিনি। 'বসুন, মিঃ রানা।' পরনে সার্জের স্যুট, বয়স্ক, কিন্তু ভারি চটপটে এবং স্মার্ট। 'হুইস্কি?'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকালো রানা। বসলো চেয়ারে। ক্ষুদে বার থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন জাসটিন চ্যাপেল। একটা গ্লাস রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন। দু'জনেই যে যার গ্লাসে চুমুক দিলো, তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

'বিশ্ব ব্যাংকের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে,' বললো রানা। 'রানা এজেন্সীকে তাদের দরকার পড়লো কেন?'

মোটা একটা এনভেলাপ ডেস্ক থেকে তুলে রানার দিকে ঠেলে দিলেন চ্যাপেল। 'এগুলো একটু দেখুন, মিঃ রানা, প্লিজ।'

এনভেলাপটা খুলে ভেতরে অনেকগুলো ফটোগ্রাফ দেখলো রানা। ছবিগুলো মুহূর্তে ওর দৃষ্টি এবং মনোযোগ কেড়ে নিলো। আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফের ছবি, যে-ই তুলে থাকুক বিস্তর ঝুঁকি নিয়ে তুলতে হয়েছে। হাতি, গণ্ডার, সিংহ, চিতা থেকে শুরু করে খরগোস, বেজী, সাপ কিছুই বাদ নেই। কোনো কোনোটা অনেক উঁচু থেকে তোলা হয়েছে, হেলিকপ্টার বা প্লেন থেকে। দারুণ হাত ফটোগ্রাফারের, শুধু আফ্রিকার বন্য প্রাণীদের ছবিই তোলেনি,

প্রকৃতিকেও নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে। উর্বর লাল মাটি, বাতাসের অবিরাম ধাক্কায় এবড়োখেবড়ো, কোথাও কড়া রোদে ফেটে চৌচির, কোথাও খরার কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ন্যাড়া। একটা ছবিতে গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো গাঢ় সবুজের উত্থান। আরেকটা ছবিতে শ খানেক হরিণ নদীর ঢালে চরছে, সামনে আদিগন্ত নীল, উদার আকাশ।

তেরো নম্বর ছবিটা দেখে সারা শরীর শক্ত পাথর হয়ে গেল রানার। কোনো প্রাণীর ছবি নয়, শুধু হাড়ের ছবি। প্রকাণ্ড খুলি, মস্ত পা, বিশাল পাঁজর। উজ্জ্বল আফ্রিকান রোদে ধবধবে সাদা সব। শিকারীদের মুখে মুখে ফেরা কিংবদন্তীর কথা মনে পড়ে গেল রানার। হাতির সমাধিক্ষেত্র। গোপন কোনো জায়গা, হাতিরা যেখানে মরতে যায়।

মুখ তুলতেই রানা দেখলো এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন জাসটিন চ্যাপেল। তাঁর মুখে এখন হাসি নেই। 'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়, মিঃ রানা।'

'পোচারদের কাণ্ড?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ। দুশো ছিয়াশিটা হাতি।'

সংখ্যাটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। 'একবারে?'

'ওগুলোকে তাড়া করে একটা মাইন ফিল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'মাই গড!' রানার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। এতোক্ষণ ভুলে ছিলো, মনে পড়তে গ্লাসটা তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিলো। অবৈধভাবে বন্য প্রাণী নিধন সব দেশেই নিন্দনীয়, এর বিরুদ্ধে কড়া

আইনও আছে। অবৈধ যে-কোনো ব্যবসার মত পোচিংও অত্যন্ত লাভজনক, তাই সব দেশেই পোচার আছে। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ ঠিকই তারা উদ্ধার করে। আরেক বার ছবিটার দিকে তাকালো রানা, তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলো, 'কিন্তু এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন জাসটিন চ্যাপেল। 'লোকে যেমন বলে, বিশ্ব ব্যাংক একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমাদের একটা আদর্শ আছে, এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করা হবে জেনেই কেবল ঋণ বা সাহায্য দিই আমরা।'

রানার কথায় ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ থাকলো, 'আপনাদের আদর্শ মানে তো কমিউনিজম ঠেকানো...'

বাধা দিয়ে চ্যাপেল বললেন, 'ঠিক তা বলা চলে না। আফ্রিকার অর্থনীতি সম্পর্কে ভাবুন। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ দেশ খাবি খাচ্ছে। জাম্বিয়া, তানজানিয়া আর মাপুতো-র আশা ছেড়ে দিয়েছি আমরা। ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, আর ইডিয়োলজিক্যাল ফ্যান্টাসী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের মরণ ডেকে এনেছে ওরা। কিন্তু কেনিয়া, জিম্বাবুই আর মালয়ি, এদের ব্যাপারে এখনো আমরা আশা ছাড়িনি। ফার্মগুলো এখনো মরুভূমি হয়ে যায়নি, কৃষকদের ফসল ফলাবার উৎসাহ আছে, রেল লাইন তুলে ফেলা হয়নি—তামা, ক্রোম, আর ট্যুরিজম থেকে কিছু বিদেশী টাকাও আয় করে। উঠে পড়ে চেষ্টা করলে, আর ভাগ্য যদি একটু সহায়তা করে, এখনো হয়তো এই দেশগুলোকে বাঁচানো যায়।'

রানার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য এড়িয়ে গেছে চ্যাপেল, কিন্তু খোঁচা

দেয়ার সুযোগ পেয়ে আবার সেটা সদ্ব্যবহার করলো ও। 'এই বললেন বিশ্ব ব্যাংক দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, তাহলে কেউ মরলো কি বাঁচলো তা নিয়ে আপনাদের মাথা ব্যথা কেন?'

'কারণ আমরা যদি ওদের না খাওয়াই, কিছুদিনের মধ্যে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের—ব্যাপারটা এই রকম সহজ সরল। ওরা যদি উপোস থাকতে শুরু করে, ভেবে দেখুন কার খাবার ভেতর গিয়ে পড়বে।'

পরিষ্কার জানিয়ে দিলো রানা, 'কেউ যদি আশা করে ক্যাপি-টালিস্ট ব্লকের পক্ষ নিয়ে কমিউনিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে, বা কমিউনিস্ট ব্লকের পক্ষ নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে কাজ করবে রানা এজেন্সী, মস্ত বোকামি করবে সে। আমরা কারো পক্ষেও নেই, বিপক্ষেও নেই—আসলে আমরা এতো দুর্বল আর ছোটো যে রুই-কাতলাদের এইসব বিরোধে জড়িয়ে পড়া আমাদের সাজে না।'

'চমৎকার,' মৃদু হেসে বললেন চ্যাপেল। 'কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে?'

'আমরা ন্যায়ের পক্ষে—কিন্তু ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার আমরাই করবো।'

'ভেরি গুড,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন চ্যাপেল। 'এবার আমরা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে দেশগুলোর কথা বললাম—কেনিয়া, জিম্বাবুই, আর মালয়ি—এদের মাটিতে সোনার খনি নেই, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস আছে। ট্যুরিজম। ধনী দেশগুলো থেকে লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর বেড়াতে যায় আফ্রিকায়। আফ্রিকার প্রকৃতি ট্যুরিস্টদের চুম্বকের মতো টানে। টাকা আমরা সাহায্য বা ধার দিই ফিরে পাবার আশা নিয়ে, আর ফিরে পেতে হলে লক্ষ্য রাখতে

হবে দেশগুলো যেন সত্যি সত্যি আকর্ষণীয় থাকে। ট্যুরিজম থেকে আয় হলে তবেই আমাদের টাকা ফেরত দিতে পারবে ওরা।'

'ট্যুরিস্টরা যাতে দেশগুলোয় যায় সে-ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত হতে চান, কিভাবে তা সম্ভব?'

'কেনিয়ার কথা ধরুন,' বললেন চ্যাপেল, 'রোদ আর সৈকত আছে ওখানে, কিন্তু তা তো গ্রীস বা সারডিনাতে আছে—প্যারিস কিংবা বার্লিন থেকে ওগুলো অনেক কাছেও। আসলে ওখানে যা নেই তা হলো, আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ। বেশি সময় আর টাকা খরচ করে ট্যুরিস্টরা কেনিয়ায় যাবে ওই একটা কারণে, ওখানে ওয়াইল্ড লাইফ আছে। ওটা আছে বলেই আমরা কেনিয়াকে টাকা দিই। এখন আমাদের শুধু দেখতে হবে, সেখানকার ওয়াইল্ড লাইফ যাতে ধ্বংস না হয়।'

'বেশ, বুঝলাম,' বললো রানা। 'রানা এজেন্সী এর মধ্যে কিভাবে আসছে?'

'একটু ধৈর্য ধরুন, সে প্রসঙ্গে আমরা আসবো,' বললেন চ্যাপেল। 'শ্বেতাঙ্গরা বিদায় নেয়ার পর কালোরা চারদিকে চোখ বুলিয়ে প্রথমেই তিনটে জিনিস দেখতে পেলো—আইভরি, গণ্ডারের শিং, আর গাদা গাদা মাংস। একজন কালো লোক দশ বছরে যা আয় করবে, একটা গণ্ডার বা বয়স্ক হাতির দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের স্বার্থেই এই সম্পদ রক্ষা করেছে। কিন্তু কালোদের সামনে এখন মস্ত টোপ—গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরি একটা ছোরা পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনে নেবে আরবের একজন শেখ। গণ্ডার মারা, কোনো অসুবিধে নেই। বিজয়ী গেরিলা ফাইটারের হাতে রয়েছে এ-কে ফরটিসেভেন

রাইফেল।'

'হ্যাঁ, এ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা আছে আমার,' বললো রানা।

'কেনিয়াতে আমরা এই সমস্যাতেই পড়েছিলাম,' বললেন চ্যাপেল। শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করলেন তিনি। 'পোচিং ওখানে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্যবসাটা চালাচ্ছিল ওপর মহলের লোকজন। পনেরো বছর ধরে এর বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা—একজন প্রেসিডেন্টকে মরতে পর্যন্ত হয়েছে। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেনিয়ায় এখন সবচেয়ে কড়া 'গেইম ল' রয়েছে। আইনের ফাঁক গলে কেউ বেরিয়ে যাবে তার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু এর জন্যে সব রকম প্রভাব খাটাতে হয়েছিল আমাদের, এমনকি হুমকি দিয়ে বলতে হয়েছিল পাওনা টাকা ফেরত চাইবো, নতুন লোনও দেবো না। কিন্তু এখন আমাদের ইনভেস্টমেন্টে কোনো ঝুঁকি নেই—ওয়েল প্রোটেকটেড।' একটু থেমে সিধে হয়ে বসলেন চ্যাপেল, তারপর রানার দিকে সামান্য ঝুঁকলেন। 'সেই একই ব্যবস্থা জিম্বাবুয়ের ব্যাপারে নিতে হবে আমাদের। মাইনফিল্ডে নিয়ে গিয়ে কিভাবে হাতির পালকে মারা হয়েছে, নিজের চোখেই তো দেখলেন। গোটা ব্যাপারটা খুব গোছালো, তারমানেই ওপর মহলের কেউ জড়িত এই পোচিঙের সাথে। তাকে আমাদের থামাতে হবে।'

'আমি কিন্তু এখনো অপেক্ষা করছি...।'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন, 'সোজা কথায়, ফিল্ডে আমরা একজন এজেন্ট চাই। এমন একজন, আফ্রিকা সম্পর্কে যার ধারণা আছে, স্থানীয় ভাষা মোটামুটি ভালোই বলতে পারে, বন্য প্রাণীদের ওপর দরদ আছে। সে যদি একজন সাংবাদিক হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা—এটা সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে

কেউ তাকে কোনো রকম সন্দেহের চোখে দেখবে না।'

'আমি সাংবাদিক, সে-খবরও তাহলে জানা আছে আপনাদের?'

চ্যাপেলের চেহারায় বিনয় প্রকাশ পেলো। 'হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে প্রায় সবই জানি আমরা। ঠিক যে-ধরনের লোক দরকার আমাদের, আপনি তাই। দুটো প্রধান ভাষার একটা জানেন আপনি—সিনডেবেল। আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে এই রকম একটা ইংরেজী দৈনিকের রিপোর্টার আপনি। বেশ কয়েকবার আফ্রিকায় গেছেন, ওখানকার ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা আছে। আরেকটু হুইস্কি, মিঃ রানা?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লো রানা।

'ইচ্ছে করলে দুটো পরিচয়ই আপনি কাজে লাগাতে পারেন,' আবার বললেন চ্যাপেল। 'রিপোর্টার হিসেবে আপনি আফ্রিকান ওয়াইল্ড লাইফ বা আর কিছুর ওপর একটা বই লিখবেন, সেটা সচিত্র হলে ভালো হয়। বিশ্ব ব্যাংক পাবলিশার নয়, তবে নাম করা কোনো পাবলিশারকে দিয়ে ওটা আমরা পাবলিশ করাতে পারবো। আরেকটা পরিচয়—ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর অভ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। রানা এজেন্সী থেকে ধার করছি আপনাকে, ফি যাই হোক না কেন। আপনার কাজ, ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট করা।'

'বিশ্ব ব্যাংক যখন,' মৃদু হেসে বললো রানা, 'প্রতি মাসের জন্যে বিশ হাজার ডলার ফি চাইবো।' তারপরই তাড়াতাড়ি বললো ও, 'তারমানে এই নয় যে কাজটা নিচ্ছি। ভেবে দেখতে হবে...।'

'বিশ হাজার কেন, চল্লিশ হাজার দেবো আমরা,' সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কিন্তু সময় খুব কম, মিঃ রানা। আপনি যদি

দয়া করে···।'

ভদ্রলোকের কথা শুনছে না রানা। যতো সহজ শোনালো, ব্যাপারটা ততো সহজ নয়—এর মধ্যে আরো জটিল কিছু ঘাপলা নিশ্চই আছে। চাপ দিলে সেটা বেরিয়ে আসবে। কারো বা কোনো ব্লকের বিরুদ্ধে অন্যায় কিছু করবে না সে। বিশ্ব ব্যাংক ওকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে ভুল করবে। সমস্যা আসলে অন্যখানে। অনেক দিন হলো, দেশের বাইরে আছে ও। কাজের পাহাড় জমে আছে। তাছাড়া, বিশ্ব ব্যাংকের মতো একটা প্রতি-ষ্ঠানের কাজ করতে হলে বসের অনুমোদন দরকার। লোকে বলাবলি করে, বিশ্ব ব্যাংক সি. আই. এ.-রই একটা অংগ সংগঠন।

'মিঃ রানা ?' চ্যাপেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

মুখ তুললো রানা। 'আমার বসের সাথে আলাপ না করে কিছু বলতে পারবো না,' বললো ও। 'আপনাদের ওয়্যারলেস সেটটা একবার ব্যবহার করতে পারি ?'

'ঢাকার সাথে কথা বলবেন ?' চ্যাপেল একটুও অবাক হলেন না। তিনি যেন জানতেন, রানা ওয়্যারলেস সেট ব্যবহার করতে চাইবে।

'হ্যাঁ।'

ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখালেন চ্যাপেল। 'গো অ্যাহেড।'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো রানা, সেটের সামনে বসলো। হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে ওর। অনেক মাস পর সরাসরি বসের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে ও। তাঁর অনুমতি না নিয়ে ইটা-লিয়ান মাফিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছে, প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে জানা নেই। ধ্যেত্তেরি, এতো নার্ভাস হয়ে পড়লে চলে ! মুশকিল হলো, বুড়োর মন মেজাজ কখন কেমন থাকে কেউ বলতে পারে না। চোখের

সামনে ভেসে উঠলো কাঁচা পাকা ভুরু, কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে এক জোড়া অন্তর্ভেদী চোখ। নাগালের বাইরে, কয়েক হাজার মাইল দূরে রয়েছে ও, তা সত্ত্বেও বুকটা ধড়ফড় করতে লাগলো।

প্রথমে অপারেটরের সাথে কথা বললো রানা। বস অফিসেই আছেন।

কয়েক সেকেণ্ড ঘামলো রানা। তারপর কানে এলো সেই জলদ গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর, 'রানা ?'

ঢোক গিললো রানা; হড়বড় করে বললো, 'জ্বী, স্যার।'

'ওয়েল ডান, মাই বয়। মানুষের কাজ করেছো তুমি। ফুলের একটা কুঁড়িকে ছিঁড়ে পায়ে দললে দানবের এই শাস্তিই পাওনা হয়। ...আমি খুশি হয়েছি। তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত।'

সেটের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো রানা। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পাষাণ হৃদয় মেজর জেনারেল রাহাত খান এ কোন্ ভাষায় কথা বলছেন।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন মেজর জেনারেল। 'তোমার ছুটি আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে...।

'স্যার,' বলে চুপ করে থাকলো রানা; কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।'...বিশ্ব ব্যাংক থেকে ওরা...'

'জানি,' বলে রানা কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষায় থাকলেন রাহাত খান।

'কাজটা কি নেবো, স্যার ?'

'অবশ্যই। গোটা একটা উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এ আমরা হতে দিতে পারি না। মানবতার প্রশ্ন। চ্যাপেলের সব কথায়

তোমার কান দেয়ার দরকার নেই—ওরা অফার দেয়ার আগেই অন্য এক সূত্রে বি. সি. আই. ওখানে নাক গলিয়েছে। ফটোগ্রাফার আমাদের এজেন্ট। আর কিছু জানতে চাও?'

'ন্-না, স্যার!'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাথা ঝাড়া দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলো রানা, এতোক্ষণ যেন সম্মোহিত ছিলো ও। অনেক কথা ভিড় করে এলো মনে। অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেল। সবশেষে ভাবলো, ফটোগ্রাফার কে? সোহেল হতে পারে না। জাহেদ? নাকি রাশেদ? বি. সি. আই.-এর সব এজেন্টই দক্ষ ফটোগ্রাফার। আচ্ছা, কোনো মেয়ে এজেন্ট নয় তো?

নিজের আশার বহর দেখে নিজেই লজ্জা পেলো রানা। গাল দিলো, 'ওরে, শালা!'

'ইয়েস, মিঃ রানা?' রানা অফিসে ফিরে আসতেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন চ্যাপেল।

'তার আগে ঝেড়ে কাশুন, মিঃ চ্যাপেল,' বললো রানা। 'সব কথা আপনি আমাকে বলেননি।'

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন চ্যাপেল, গ্লাসে হুইস্কি ভরে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। 'আপনার খুঁত-খুঁতে স্বভাবই বলে দেয় লোক নির্বাচনে আমরা ভুল করিনি। হ্যাঁ, মিঃ রানা, আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে। ভেতরে ভেতরে কি চলছে, আমাদের জানা দরকার, পুঁজি ফিরে পাবার স্বার্থেই। কিন্তু জিম্বাবুইয়ে আমাদের সেট-আপ মার খেয়েছে। আমরা একজন কী-ম্যানকে হারিয়েছি—মোটরকার অ্যাক্সিডেন্ট—অন্তত দেখে তাই মনে হয়েছে। সর্বশেষ রিপোর্টে সে আমাদেরকে আভাস দিয়ে

বলেছিল, ওখানে একটা কু করার চেষ্টা চলছে। এবার বলুন, মিঃ রানা, আপনার সাহায্য আমরা পাবো?'

'ফি নিয়ে কথা হয়ে গেছে, কিন্তু খরচাপাতি?'

'সব আমাদের।'

'তার মধ্যে কি ফার্স্ট ক্লাস এয়ার টিকেটও আছে?' সকৌতুকে জানতে চাইলো রানা। 'বুঝতেই পারছেন কাজটা আমি নিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!' খুশিতে উঠে দাঁড়িয়ে রানার সাথে আরেকবার করমর্দন করলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'একটা ফাইল আর একটা সারভাইভাল কিট আপনার হোটেলে আজই পৌঁছে যাবে। আমাদের লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে ফাইলটা পড়বেন, তারপর ফেরত পাঠাবেন। কিটটা আপনার কাছে থাকবে।'

সারভাইভাল কিটে পাওয়া গেল অনেকগুলো প্রেস কার্ড, TWA অ্যামব্যাসাডর ক্লাবের সদস্য কার্ড, একটা আন লিমিটেড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভিসা ক্রেডিট কার্ড, আর একটা ধাতুর ওপর এনামেলের নকশা করা তারকাচিহ্ন—ছোট একটা চামড়ার কেসের গায়ে ফিট করা; তার ওপর লেখা রয়েছে: 'ফিল্ড অ্যাসেসর—ওয়ার্ল্ড ব্যাংক'।

লোকটাকে সিটিং রুমে বসিয়ে রেখে এক ঘণ্টা ধরে ফাইলটা পড়লো রানা। ফাইলের সাথে এক গাদা বই আর ম্যাগাজিনও নিয়ে এসেছে লোকটা। সেগুলো রেখে শুধু ফাইলটা ফেরত দিলো ও। বই আর ম্যাগাজিনগুলো আফ্রিকার ওপর প্রতিবেদন লিখতে সাহায্য করবে ওকে।

বুলাওয়ায়ো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি থেকে একটা ফোক্সওয়াগেন

ভাড়া করেছে রানা। শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে এসে বাঁক নিলো, হলুদ মেটো পথ ধরে উত্তর দিকে ছুটলো গাড়ি। এক মাইল পেরোতেই পাঁচিলটা দেখা গেল। গেটের অবস্থা দেখে ভুরু কোঁচকালো—মাতালের মতো কাত হয়ে আছে একদিকে, হাঁ হাঁ করছে। গাড়ি থামিয়ে গেট বন্ধ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না—ফ্রেমটা তুবড়ে গেছে, মরচে ধরেছে কব্জাগুলোয়। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কয়েক পা সামনে এগোলো ও, ওখানে ঘাসের ওপর সাইন বোর্ডটা পড়ে রয়েছে।

তিনটে লোহার রডের মাথায় ছিলো বোর্ডটা। টিনের চারপাশে তামার বর্ডার ছিলো। তামা আর রড গায়েব হয়েছে, গায়ে অসংখ্য ফুটো নিয়ে শুধু পড়ে আছে টিনের পাতটা। ধরে সেটাকে উল্টো করলো রানা। লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে, তবু পড়া যায় এখনো।

কিং'স হেভেন

প্রোপাইটার : রেবেকা সাউল

বোর্ডের গায়ে প্রকাণ্ড একটা সিংহের মাথা আঁকা ছিলো, রঙ চটে গিয়ে সেটা এখন চেনা যাচ্ছে না। গাড়িতে ফিরে এসে বসলো রানা, মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে চারদিকে তাকালো। সামনে ছিলো আদিগন্ত ঘাস—ঘন, সবুজ, কোথাও কোথাও সোনালি। এখন প্রৌঢ় এক লোকের টাক, সম্পূর্ণ ন্যাড়া। সত্তর দশকের তীব্র খরাতেও কিং'স হেভেনের ঘাস মরেনি, মনে পড়লো ওর। ব্যাপারটা কি? কিং'স হেভেন দেখাশোনা করছে যারা তারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়? ঘাসের এ অবস্থা হলো কি করে?

মাইল কয়েক এগিয়ে ক্যামেল থর্ন ঝোপের পাশে আবার গাড়ি

থামালো রানা, ঝোপগুলো রাস্তার ওপর ছায়া ফেলেছে। ঝোপের ওদিক থেকে ব্যা ব্যা ডাক শুনে চমকে উঠলো ও। 'ছাগল।' অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। 'কিং'স হেভেনে ছাগল চরছে!' গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। রেবেকার প্রিয় গ্রাসল্যাণ্ডে ছাগল। নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর, মাঝে মধ্যে লোক পাঠিয়ে হলেও খোঁজ-খবর নেয়া উচিত ছিলো। সে অধিকার তাকে দিয়ে গেছে রেবেকা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানি দেখাশোনা করছেন রেবেকার চাচাতো ভাই রুবেনসন। ভদ্রলোক কি অন্ধ হয়ে গেছেন? হোক একবার দেখা।

ঝোপ পেরোতেই আবার ফাঁকা মাঠ, এক পালে অন্তত দুশো ছাগল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালো, সাদা-কালো, বাদামি, সাদা-বাদামি, কালো-বাদামি— সব রঙেরই আছে। কোনোকোনোটা উঠে গেছে গাছের ওপর, বাকল আর কচি পাতা মুচড়ে খাচ্ছে। বাকিগুলো গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে খাচ্ছে ঘাস, তারমানে ওগুলো আর নতুন করে গজাবে না। অল্প বয়েসী দু'জন রাখালকে দেখা গেল। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে পাখির খোঁজে হাঁ করে তাকিয়ে আছে গাছগুলোর দিকে। তাদের কাছে ডেকে চকলেট দিলো রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে একজন সাদা চাষী ছিলো, সে এখন কোথায় জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লো একজন রাখাল। 'নেই। চলে গেছে। কোথায় জানি না।' রানার পিছু পিছু রাস্তা পর্যন্ত এলো ওরা, আরো চকলেট চায়। কিং'স হেভেনের অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেলেও, নতুন করে এদের প্রতি স্নেহ আর টান অনুভব করলো

রানা। এই এলাকায় ম্যাটাবেল উপজাতিদের বসবাস। ছেলে-বুড়ো সবাই মাটির মানুষ, যেমন সরল তেমনি নিরীহ। রেবেকা এদের ভালোবাসতো, তার সাথে বার কয়েক এখানে এসে রানারও এদেরকে ভালো লেগে যায়। মুঠো ভরা চকলেট নিয়ে ছেলে ছুটো এমনভাবে হাত নেড়ে বিদায় জানালো ওকে, যেন কতো কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে ওদের মধ্যে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে আবার গাড়ি থামালো রানা। বাড়ি-টার দিকে করুণ চোখে তাকালো। অযত্নে সবুজের একটা কণা পর্যন্ত নেই লনে। ফুল-বাগানেও ছাগল চরছে। এতো দূর থেকেও পরিষ্কার বোঝা গেল, বাড়ির বড় অংশটায় কেউ বসবাস করছে না। কোনো জানালায় কবাট নেই, ছাদের বেশির ভাগ অ্যাসবেসটস শীট চুরি হয়ে গেছে। ছাদের টালি-গুলো দিয়ে দখলকারীরা আস্তাবলের কাছে চৌকো আকৃতির খোপ বানিয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে এসে বিশাল, গভীর কুয়াটার পাশে গাড়ি থামালো রানা। উঁকি দিয়ে দেখলো, কুয়া শুকিয়ে গেছে, নিচে রাজ্যের আবর্জনা। খোপগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালো ও। আট দশটা পরিবার বাস করছে এখানে। ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো একটা লেজকাটা কুকুর, কয়েকটা পাথর ছুঁড়ে তাকে ভাগালো ও। আগুনের সামনে বসে আছে বুড়ো এক ম্যাটাবেল, রানাকে দেখে একগাল হাসলো সে। অচেনা লোককেও সাদর অভ্যর্থনা জানায় এরা। বুড়োর সামনে, আগুনের এপারে, শক্ত মাটির ওপর পদ্মাসনে বসে পড়লো রানা।

সিনডেবেল ভাষায় কথা বলতে গিয়ে প্রথম দিকে জড়তা বোধ করলেও, ধীরে ধীরে শব্দগুলো সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসতে

লাগলো।

'দেশ তো স্বাধীন হলো, কিন্তু আমাদের অবস্থা ভালো হওয়া দূরের কথা, দিনে দিনে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে···' ভালো একজন শ্রোতা পেয়ে মনের দুঃখ প্রকাশ করছে বুড়ো। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। সেখানেও তো এই একই অবস্থা···।

ঘণ্টাখানেক কথা বললো ওরা। না, সাদা কৃষক লোকটা কোথায় গেছে বুড়ো জানে না।

বুড়োকে আগুনের ধারে রেখে বাড়ির দিকে এগোলো রানা। দু'ফোঁটা কফির মতো এক জোড়া চোখ মানস পটে ভেসে উঠলো। বিষণ্ণ। রেবেকা যেন বলছে, দেখো রানা, দেখো; আমার কিং'স হেভেনের কি অবস্থা করেছে ওরা! হঠাৎ একটা খসখস আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরালো রানা।

এই অপরূপ সৌন্দর্যের বুঝি কোনো তুলনা নেই। প্রায় ছয় ফিট লম্বা অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী চঞ্চলা হরিণীর মতো প্রায় ছুটে আসছে ওর দিকে। খুঁত বলতে ছোটো চুল, বাতাসে উড়ছে। শরীরে কোথাও এক ছটাক মেদ নেই, নগ্ন উরুতে মখমলের মসৃণতা। সরু কোমর, সেখানে ছোট এক টুকরো চামড়া, দ্রুত হাঁটছে বলে লাফাচ্ছে টুকরোটা কোমর থেকে ক্রমশ চওড়া হতে শুরু করেছে ধড়। স্তনে কোথাও কোনো টোল নেই, ভরাট আর ছুঁচালো—হাঁটার ছন্দে ঘন ঘন লাফাচ্ছে, মাঝে মধ্যে পুঁতির মালার আড়াল থেকে প্রায় সম্পূর্ণটাই বেরিয়ে আসছে বাইরে। নিষ্পাপ এক জোড়া চোখ, দৃষ্টিতে সমীহ, কৌতূহল, কৌতুক মিলেমিশে একাকার। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

কোনো জড়তা নেই, সোজা হেঁটে এসে রানার একটা হাত ধরলো মেয়ে। 'অতিথি খালি মুখে ফেরে নাকি?' চিবুক তুলে নিজের ক্ষুদে খোপটা দেখালো সে। 'শুকনো একটু গোশতো মুখে দিয়ে এক মগ লেবুর সরবত অন্তত খেয়ে যা।'

আগুনের কাছ থেকে বৃদ্ধ কুয়াকোপা মিটি মিটি হাসছে, চিৎকার করে বললো, 'ও আমার দস্যি মেয়ে নিলি। যা বলছে শোনো, বাপু, ওর সাথে তুমি পারবে না।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়লো রানা। ইচ্ছে করলো জিজ্ঞেস করে, এতো রূপ-যৌবন নিয়ে তুমি মাটিতে থাকো কিভাবে, নিলি? কিংবা জানতে চায়, তুমি জানো তুমি সুন্দর? আড়ষ্ট একটু হেসে বললো, 'নিলি, সুন্দর নাম। আমি এখন একটু ব্যস্ত, পরে তোমার হাতে পানি খাবো, কেমন?'

মিষ্টি হেসে রাজি হলো নিলি। বললো, 'তখন কিন্তু আমার সাথে গল্প করতে হবে তোকে। বলতে হবে কোন্ মুলুক থেকে এলি। কোথায় শিখলি আমাদের ভাষা। তুই সাদা বাবু না, আবার কালো বাবুও না—তাহলে কোন্ বাবু?'

হেসে ফেললো রানা। 'আমি বাদামি বাবু।' হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ও। 'ঠিক আছে, সময় করে একদিন গল্প করা যাবে, কেমন?'

কয়েক সেকেণ্ড পর পিছন থেকে ডাকলো নিলি, 'বাবু!'

ঘাড় ফিরিয়ে কাউকে দেখলো না রানা। আরে, গেল কোথায়! তারপর চোখে পড়লো। গাছের মগডালে বসে দোল খাচ্ছে, হাতে পাকা একটা পেয়ারা। মস্ত একটা কামড় বসালো সে, ঘন ঘন পা দোলাচ্ছে, তারপর পেয়ারাটা ছুঁড়ে দিলো রানার দিকে।

লুফে নিয়ে পেয়ারার এক ধারে ছোট্ট একটা কামড় দিলো রানা,

তারপর ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে। খিলখিল করে হাসতে লাগলো নিলি।

বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে চারদিকে চোখ বুলালো রানা। এখানে সেখানে ছাগল-লাদা, চেরা কাঠ, গাছের শুকনো পাতা, ইঁদুরের গর্ত। বিশ্বাসই হয় না এই বারান্দায় বসে জ্যোছনা রাতে রেবেকার সাথে গল্প করেছে ও। জোড়া দরজার দু'পাশে দুটো হাতির দাঁত ছিলো, নেই। লাইব্রেরীতে ছিলো বাঘ, সিংহ আর হরিণের চামড়া, একটাও নেই। বই তো নেই-ই, বুক শেলফগুলো পর্যন্ত উধাও।

গোটা বাড়ি ঘুরে দেখার ইচ্ছেটা আর থাকলো না। যতোই দেখবে ততোই মন খারাপ হবে। কিন্তু কিং'স হেভেনের এই হাল হলো কি করে?

ফোক্সওয়াগেনের দিকে ফিরে আসার পথে আবার মেয়েটাকে দেখলো রানা। সেই গাছের ওপরই বসে গোগ্রাসে পেয়ারা খাচ্ছে। একটা পেয়ারা উঁচু করে রানাকে দেখালো নিলি, রানা মাথা নাড়লো।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠে এলো রানা। ভিউ মিররে চোখ পড়তে নিলিকে আবার দেখতে পেলো। গাছ থেকে নেমে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন বিষণ্ণ, করুণ দেখালো মেয়েটাকে। একদৃষ্টে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আবার দেখা হবে, মৃদু হেসে ভাবলো রানা।

তিন

পাঁচটার আগেই শহরে ফিরে এলো রানা, স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের পাশে এস্টেট অ্যাণ্ড অকশনিয়ারিং কোম্পানির অফিসটা খোলা দেখলো। ভেতরে ঢুকতেই হৈ হৈ করে উঠলো কালিচরণ ডিক্রু। খাকি শর্টস আর হাফ-হাতা বুক খোলা শার্ট পরে আছে সে, আগের মতোই নাদুস-নুদুস, বেঢপ ভুঁড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে।

'অ্যাদ্দিন পর মনে পড়লো আমাদের কথা, অ্যাঁ? কেমন আছেন, মিঃ রানা?' বাড়ির জন্যে সমস্ত আসবাব এই ডিক্রুর কাছ থেকেই কিনতো রেবেকা।

'ভালো,' বললো রানা। হ্যাণ্ডশেক করলো ওরা। 'তুমি কেমন, ডিক্রু? এদিকের সব খবর ভালো তো?'

অফিসে লোকজন নেই, চালু হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান খুলে ফেললো কালিচরণ ডিক্রু। 'এই চলছে এক রকম। আগের দিন কি আর আছে!'

চেয়ারে বসে বিয়ারে চুমুক দিলো রানা। 'এইমাত্র কিং'স হেভেন থেকে ফিরলাম, একেবারে যা তা অবস্থা করে রেখেছে। মিঃ রুবেন-সনকেও ওখানে দেখলাম না।'

'আপনি জানেন না?' আকাশ থেকে পড়লো ডিক্র। 'কিং'স হেভেন তো বিক্রি হয়ে গেছে।'

'বিক্রি হয়ে গেছে!' একটা ধাক্কা খেলো রানা।

'সে কি আজকের কথা, প্রায় এক যুগ হয়ে এলো!'

'কিন্তু কিং'স হেভেন··· !'

'শুধু কিং'স হেভেন? গোটা সাউল র‍্যাঞ্চিং কেম্পানী বিক্রি হয়ে গেছে—কিং'স হেভেন, কুইন'স হেভেন, শিজারিরা এস্টেট, স-ব। বলতে গেলে পানির দরে, আড়াই লাখ ডলারে। আপনি কিছুই জানেন না?' ডিক্রুর চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

বিড়বিড় করে বললো রানা, 'আড়াই লাখ ডলার···সে তো দান করে দেয়ার মতো!'

'সাথে পুরো স্টক ছিলো—সেরা জাতের আফ্রিকান ষাঁড়, পোয়াতী গাভী, যা ছিলো সব।'

'কিন্তু কেন?' শুধু বিস্ময় নয়, দুঃখ হচ্ছে ওর। সম্পত্তিটা রেবেকার, চাচাতো ভাই রুবেনসনের অবস্থা ভালো নয় বলে তাঁকে এক রকম দানই করেছিল সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী। রুবেনসনকে ভারি শ্রদ্ধা করতো রেবেকা, তাঁকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্ণি-ও দিয়েছিল। এই সম্পত্তি রেবেকার একটা স্মৃতি, সেটা ভুলে গিয়ে সব একেবারে বিক্রি করে দিলেন ভদ্রলোক।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডিক্রু। 'মিঃ রুবেনসন কি আর সাধে বিক্রি করেছেন! সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে কলজের পানি এখনো শুকিয়ে আসে···'

'কেন, কি হয়েছিল?'

'দেশ স্বাধীন হবার পরপরই শুরু হয়ে গেল রায়ট। সাদারা এতো-

দিন অত্যাচার করেছে, এবার শুরু হলো কালোদের বদলা নেয়ার পালা। সাদাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো, যাকে যেখানে পাওয়া গেল তাকে সেখানেই গুলি করে মারা হলো…'

'মিঃ রুবেনসন?' রানা জানে, অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন ভদ্রলোক, রাজনীতির সাথে নিজেকে কখনো জড়াননি, কালোদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন তিনি।

'পাইকারী খুন-খারাবি যখন শুরু হয়, তখন ভালো মানুষটিরও কোনো নিরাপত্তা থাকে না। মিঃ রুবেনসনের ভাই, জেমিসনের কথা নিশ্চই আপনার মনে আছে। কালোদের ওপর সে কি রকম অত্যাচার করতো, সে তো আপনিও কিছু কিছু জানেন। জেমিসন তো যুদ্ধের সময় মারা গেল, কিন্তু কালোরা খুঁজতে শুরু করলো তার আত্মীয়-স্বজনকে। কোনো রকমে পালিয়ে এসে আমার বাড়িতে উঠলেন তিনি।'

'তারপর?'

'ঠিক হলো, প্রথম সুযোগেই ওনাকে আমি একটা প্লেনে তুলে দেবো, অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবেন উনি। কোম্পানীটা উনি বিক্রি করতে চাননি। আমিই বললাম, এই যাওয়া আপনার শেষ যাওয়া, আর কখনো ফিরে আসতে পারবেন না—বিদেশী একটা পার্টি র‍্যাঞ্চ কিনতে চাইছে, বিক্রি করে দেন, কম-বেশি যা পান তাই লাভ। কথাটা শুনে সে কি কান্না তাঁর! বললেন, এখানে আমি জন্মেছি, এটা আমার ছোটো বোনের সম্পত্তি, তার একটা স্মৃতি—এ আমি কি করে বিক্রি করি!' সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলো ডিক্রু।

রানা হাত বাড়াতে ওকেও একটা সিগারেট দিয়ে আবার শুরু

করলো সে, 'অনেক করে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম। পার্টি হাতেই ছিলো, বিক্রি হতে দেরি হয়নি। টাকাটা ইচ্ছে করলে জুরিখে গিয়ে পার্টির কাছ থেকে নিতে পারতেন তিনি, কিন্তু রাজি হলেন না ; বললেন, এ টাকায় আমি হাত দেবো না, এখানকারই কোনো বিদেশী ব্যাংকে রেখে যাবো। রাখলেনও তাই। ক'দিন পর, পরিস্থিতি একটু শান্ত হতে, প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম, যাবার সময় বললেন, আবার আমি ফিরে আসবো...'

'কিনলো কে ?'

'একটা সুইস-জার্মান কনসরটিয়াম।'

'কেন, ওরা র‍্যাঞ্চ কিনলো কি মনে করে ?'

'ওরা ব্যবসা বোঝে,' বললো ডিক্র। 'প্রথম চোটেই গরুগুলোকে নিয়ে চলে গেছে। বড় কোনো অফিসারকে ঘুষ দিয়ে এক্সপোর্ট পারমিট যোগাড় করে, তারপর ওগুলোকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাচার করে দেয়। ওগুলো বিক্রি করেই প্রায় পনেরো লাখ ডলার কামিয়েছে। আপনি তো জানেনই, দুনিয়ার সেরা জাতের গরু ছিলো ওগুলো।'

'তারপর র‍্যাঞ্চটাকে সেই থেকে খালি করে ফেলে রেখেছে ?'

'ফেলে রাখবে না তো কি, আর কি আছে র‍্যাঞ্চে ? কোনো কাজে আসবে না, তাই বেচে দেয়ার তালে আছে।

'আর মিঃ রুবেনসন ? চিঠিপত্র লেখেন ?'

'ওহ হো ! বলতেই ভুলে গেছি। মিঃ রুবেনসন তো আজ প্রায় এক মাস ধরে এখানে। বেচারা অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। কাল সকালেই ওনার ফ্লাইট... '

'হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে মানে ?' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার।

'এখানকার পরিস্থিতি এখন ভালো, সাদারা নতুন করে র‍্যাঞ্চ করার সুযোগ পাচ্ছে। আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে সেই অস্ট্রে-লিয়া থেকে ছুটে এলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সম্পত্তি ফিরে পাওয়া তাঁর কপালে নেই।'

'কেন, অসুবিধেটা কি? এইতো তুমি বললে কনসরটিয়াম আবার র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিতে চাইছে।'

'অসুবিধে কি একটা।' ম্লান গলায় বললো ডিক্রু। 'যুদ্ধের সময় যারা কালোদের বিরুদ্ধে লড়েছে তাদের পরিবারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। এ-ধরনের পরিবারের কোনো সদস্য জিম্বাবুয়ে-তে জমি-জমা কিনতে পারবে না।'

চুপ করে থাকলো রানা। একটু পর জানতে চাইলো, 'আর কি অসুবিধে?'

'অস্ট্রেলিয়ায় ছোটোখাটো একটা চাকরি করেন মিঃ রুবেনসন,' বললো ডিক্রু। 'সংসারই ভালো করে চলে না, সঞ্চয় করবেন কোত্থেকে। ব্যাংকের টাকাটা অবশ্য আছে। কনসরটিয়াম দাম হাঁকছে বিশ লাখ।'

রানা বুঝলো, রুবেনসনের সম্পত্তি ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। দুঃখই লাগে, রেবেকার একটা স্মৃতি এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালো ও। 'বিয়ারের জন্যে ধন্যবাদ, ডিক্রু।'

'মিঃ রুবেনসন আপনার অনেক খোঁজ করেছেন,' বললো ডিক্রু। 'সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানীর পাওয়ার অভ অ্যাটর্ণি তাঁকে দেয়া হলেও, তিনি মনে করেন মিস রেবেকা মারা যাবার পর সম্পত্তির মালিকানা আপনার ওপর বর্তেছে। টাকাটা সেজন্যেই তিনি খরচ করছেন না। আপনি কোন্ হোটেলে উঠেছেন জানলে···।

মাথা নাড়লো রানা। 'পাগল নাকি! মিঃ রুবেনসনকে রেবেকা কি রকম শ্রদ্ধা করতো আমি জানি না! কোম্পানীটা রেবেকা এক-রকম দানই করেছিল তাঁকে। কালই চলে যাচ্ছেন উনি, তাই না? যদি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়, তাঁকে বলবে, এই টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই। টাকাটা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় র‍্যাঞ্চ বা আর কিছু করলে আমি খুশি হবো।'

ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল রানা, হোটেলের ঠিকানা না দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

হোটেলে ফিরে শাওয়ার সারলো রানা, ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। নিজের স্যুইটে বসে ডিনার সারলো। এবার রাতের বুলাওয়ায়ো শহর দেখতে বেরুবে।

জুতোর ফিতে বেঁধে সিধে হতে যাবে, নক হলো দরজায়। তির্যক দৃষ্টিতে বন্ধ কবাটের দিকে তাকালো ও। কেউ জানে না এই হোটেলে উঠেছে ও। রুম-সার্ভিস এভাবে ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক করে টোকা দেবে না। 'কে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ও।

'দরজা খোলো, ভাই,' ইংরেজীতে বললো একজন। কিন্তু উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল, লোকটা ইংরেজ নয়। কার গলা? একটু যেন চেনা চেনা লাগছে।

দরজা খুললো রানা। বছর পঞ্চাশেক বয়স ভদ্রলোকের, পাক ধরেছে চুলে। আগের সেই স্বাস্থ্য নেই, গাল বসে গেছে, চোখের নিচে কালি। অবাক হয়ে বললো রানা, 'মিঃ রুবেনসন!'

চৌকাঠ পেরিয়ে রানাকে আলিঙ্গন করলেন ভদ্রলোক। তারপর একটু পিছিয়ে গিয়ে হাত দুটো রানার কাঁধে রাখলেন, খুঁটিয়ে লক্ষ্য

করলেন ওকে। 'ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, চোখে বিস্ময় ভরা আনন্দ, 'ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছে।'

'কেমন আছেন, মিঃ রুবেনসন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। তার হাত ধরে একটা চেয়ারের দিকে এগোলো ও। 'আমি এসেছি আপনি জানলেন কিভাবে?'

'তোমার দেখা পেয়েছি, তারপর আর ভালো না থেকে পারি।' ভদ্রলোকের চোখ থেকে উপচে পড়লো সন্তুষ্টির হাসি। 'কিভাবে জানলাম···' ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালেন তিনি।

করিডরে বেঢপ ভুঁড়ির খানিকটা দেখা গেল শুধু। 'ডিক্রু?'

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে কামরায় ঢুকলো কালিচরণ ডিক্রু।

'কিন্তু কোথায় উঠেছি জানলেন কিভাবে?'

উত্তর দিলো ডিক্রু, 'আমি শুধু আপনার আসার খবরটা দিয়েছি মিঃ রুবেনসনকে। সাথে সাথে উনি বড় হোটেলগুলোয় টেলিফোন করতে শুরু করলেন···'

'আমাদের দেখা হবে, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছে,' বললেন রুবেনসন। 'কতো খোঁজ করেছি তোমার, কেউ বলতে পারেনি কোথায় আছো তুমি। কাল সকালে আমার ফ্লাইট, এই সময় খবর পেলাম তুমি জিম্বাবুয়ে এসেছো—একে আর কি বলা যায়।'

'কষ্ট করে দেখা করতে এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি,' বললো রানা। 'আপনাদের জন্যে কি আনাবো বলুন।'

'আরে বসো, ওসব পরে হবে'খন,' তাড়াতাড়ি বললেন রুবেনসন। 'তার আগে কাজের কথাটা সেরে নিই। তুমি, ভাই, না বলতে পারবে না, আমার এই অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। কথা দাও, রাখবে?'

'র‍্যাঞ্চ বিক্রির টাকা নিতে বললে, দুঃখিত, সে অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না,' বললো রানা। 'ডিক্রুকে আমি জানিয়ে দিয়েছি, ওই টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই।'

কিছু না বলে কোটের পকেট থেকে চেক বই আর কলম বের করলেন রুবেনসন। চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। চেক লেখা শেষ করে পাতাটা ছিঁড়লেন, তারপর বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'তোমাকে আমি চিনি, রানা। একবার কিছুতে না বললে হাঁ করানো সম্ভব নয়। তাই টাকা নেবার অনুরোধ আমি করবো না। ধরো, এটা তোমার কাছে রাখো।'

'চেক? কেন?'

'আহা, ধরোই না—বলছি।'

অগত্যা নিলো রানা। দেখলো, রুবেনসন ওর নামেই লিখেছেন চেকটা—পাঁচ লাখ ডলারের। 'এর মানে কি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো ও।

'মানে, র‍্যাঞ্চ বিক্রির আড়াই লাখ টাকা এই ক'বছরে সুদসহ পাঁচ লাখে দাঁড়িয়েছে।' মিটি মিটি হাসছেন রুবেনসন।

'কিন্তু আমার নামে চেক লিখলেন কেন?'

'বলছি। তার আগে তুমি কথা দাও, আমার অনুরোধ রাখবে।'

রানা হাসলো না। 'সম্ভব হলে নিশ্চই রাখবো। কিন্তু সবটা না শুনে কি করে কথা দিই, বলুন।'

'একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব,' জোর দিয়ে বললেন রুবেনসন। 'পর্যটন মন্ত্রী তোমার বন্ধু, তুমি কালোদের পক্ষে লড়েছো—সরকার খুশি হয়ে তোমাকে ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন দেবে।'

'তারমানে?'

'আমার দুঃখটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো, রানা, প্লিজ,' বললেন রুবেনসন। 'এই দেশে জন্মেছি আমি, এখানের আলো-বাতাসে বড় হয়েছি, ভালোবেসেছি এ-দেশের মাটিকে, মানুষকে। আমি সম্পত্তি চাই না, মালিকানা চাই না, শুধু আমার জন্মভূমিতে বসবাস করার অধিকার চাই। আমাদের পরিবারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে, ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন আমি পাবো না। জানি, এই টাকায় র‍্যাঞ্চ কেনা যাবে না। কারো সাথে শেয়ারে কিনতে হবে। কিন্তু শেয়ারে কিনলেও, দলিলে আমার নাম রাখা যাবে না। তারমানেই দাঁড়াবে, যার বা যাদের সাথে শেয়ারে কিনবো তারা ইচ্ছে করলে আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতে পারে, মেরে দিতে পারে আমার অংশটুকু। তাই বলছি…'

দ্রুত এক নাগাড়ে কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন রুবেনসন।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…'

'তোমার সাথে ওপর মহলের যোগাযোগ আছে, রানা,' আবার শুরু করলেন রুবেনসন। 'ইচ্ছে করলে ব্যাংক লোনও পেতে পারবে তুমি। আমার অনুরোধ, সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী তোমার নামে কেনো তুমি। আমাকে শুধু ম্যানেজারের চাকরিটা দিয়ো, যাতে বাকি জীবনটা এই মাটিতে বসবাস করতে পারি।'

অস্বস্তি বোধ করলো রানা। 'তা কি করে হয় …।'

'কেন হয় না?' ব্যাকুল চেহারা নিয়ে জানতে চাইলেন রুবেনসন। 'অসুবিধেটা কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন করলেই ল্যাণ্ড পারচেজের পারমিশন পেয়ে যাবে তুমি…।'

'কিন্তু…'

'আমি একজন অভাগা, রানা,' কাতর কণ্ঠে বললেন রুবেনসন,

'আমাকে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে, কোনো অপরাধ করিনি তা সত্ত্বেও ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। এ দেশ থেকে চলে গিয়ে আমি শান্তিতে নেই, রানা—একটা রাতও ভালো করে ঘুমাতে পারি না। এই উপকারটুকু তুমি যদি না করো, বুঝবো, রেবেকার পর সবচেয়ে বেশি যাকে স্নেহ করতাম সে একটা পাষাণ…'

পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন রুবেনসন। এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখলো ডিক্রু, চোখে রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। অনেক চিন্তা ভিড় করে এলো মনে। অনুরোধটা রাখতে যাওয়া মানে নিজেকে একটা ঝামেলায় জড়ানো। কিন্তু রেবেকার একটা স্মৃতি যদি রক্ষা পায়, সেটাও কম কথা নয়। ক্ষীণ একটু পুলকও অনুভব করলো ও। অনেকদিনের শখ, গম ফলাবে ও, গরু পালবে। জমিজমা কিনে নিজের জন্যে এ-সব করা হয়তো কোনোদিনই হয়ে উঠবে না। সুযোগ যখন এসেছে, একজনের একটা উপকারের মাধ্যমে নিজের শখটা মিটিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। তাছাড়া, রুবেনসনকে নিরাশ করাটা এক ধরনের নিষ্ঠুরতাই হয়ে যাবে।

খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করলো ও। বললো, 'কথা দিচ্ছি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন রুবেনসন। আবার তিনি রানাকে বুকে টেনে নিলেন। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম…' আনন্দের আতিশয্যে এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। রানাকে ছেড়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

রানার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে বিয়ারের অর্ডার দিলো ডিক্রু। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' আবার বললো রানা, 'তবে শর্ত আছে।'

চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলেন রুবেনসন, টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জানতে চাইলেন, 'কি শর্ত, রানা?'

'আপনার এই র‍্যাঞ্চে বছরে দু'বছরে দু'চারদিনের জন্যে বেড়াতে আসবো আমি,' বললো রানা। 'তখন কিন্তু মুখ ভার করতে পারবেন না।'

'তোমার র‍্যাঞ্চে তুমি আসবে না তো কে আসবে!'

'শর্ত আরো একটা আছে।'

'বলো!' ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রুবেনসন।

'কেনার পর, হাতে যে-কদিন সময় পাবো, র‍্যাঞ্চটাকে নিজের পছন্দ মতো গড়ে তুলবো আমি। নিজের পছন্দ মতো গরু কিনবো, ঘর-বাড়ি তৈরি করবো...'

অসহায় ভঙ্গিতে ডিক্রুর দিকে তাকালেন রুবেনসন। 'ওর র‍্যাঞ্চ, ও যেভাবে খুশি সাজাবে, তাতে কার কি বলার থাকতে পারে—আপনিই বলুন?'

'কিচ্ছু বলার নেই,' সায় দিলো ডিক্রু।

'এবার শেষ একটা শর্ত।'

হেসে ফেললেন রুবেনসন।

ডিক্রু গলা লম্বা করে দিয়ে বললো, 'শোনা যাক, এটাও শোনা যাক।'

'শেষ পর্যন্ত কোনো কারণে যদি সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনা

সম্ভব না হয়,' বললো রানা, 'টাকাটা দিয়ে আপনি অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্য কোথাও একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে বাধ্য থাকবেন।'

চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে চুপ করে থাকলেন রুবেনসন।

'এই শর্ত মেনে না নিলে,' বললো রানা, 'আমি এর মধ্যে নেই।'

ধীরে ধীরে মাথা কাত করলেন রুবেনসন। 'বেশ, তাই হবে।'

রুম-সার্ভিস নক করে ভেতরে ঢুকলো। ওদের জন্যে বিয়ার সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল বেয়ারা। যার যার ভাবনায় মগ্ন থেকে বিয়ারের মগে চুমুক দিল তিনজন।

'আপনি এখন কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে,' বললেন রুবেনসন। 'কাল সকালের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। চাকরিটা এখুনি খোয়াতে চাই না। এদিকের সব কাজ গুছাতে বেশ সময় লাগবে তোমার। তুমি চিঠি লিখলে সবাইকে নিয়ে চলে আসবো।'

একটু চিন্তা করলো রানা। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, সেটাই ভালো। আপনার ঠিকানা তো ডিক্রুর কাছে আছেই।'

'আমি তাহলে এখন উঠি,' বললেন রুবেনসন। 'খুব ভোরে ফ্লাইট, গোছগাছ রাতেই সেরে রাখতে হবে।'

ভদ্রলোককে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো রানা। বিদায় নেয়ার আগে আবার একবার রানাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলো রানা। 'কনসরটিয়াম দাম চাইছে বিশ লাখ, কতো হলে ছাড়বে বলে মনে হয়?'

খানিক চিন্তা করলো ডিক্রু। 'আপনি যদি জুরিখে পেমেন্ট করেন, তাহলে হয়তো দশ বা পনের লাখে রাজি হতে পারে।'

'আড়াই লাখে?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো রানা।

বোবা বনে গেল ডিক্রু। শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লো।

'ফোন করে দেখোই না,' মৃদু হেসে বললো রানা। 'বলো, র‍্যাঞ্চ জবরদখল হয়ে গেছে। ওদেরকে সরাতে গেলে রাজনৈতিক হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। বলো, গ্র্যাসল্যাণ্ডে ছাগল চরছে, এক বছরের মধ্যে মরুভূমি হয়ে যাবে গোটা এলাকা। বলো, অনুপস্থিত মালিক-দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়েছে সরকার। এখুনি বিক্রি করতে না পারলে হারাতে হবে সব।'

'সবই সত্যি, কিন্তু তাই বলে আড়াই লাখ!'

'আহা, ফোন করতে তোমার অসুবিধে কি...'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ডিক্রু। 'ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছেন!'

একটা সিগারেট ধরালো রানা। তারপর হঠাৎ করেই বললো, 'কাল আমি শিঙ্গারিরায় যাচ্ছি। দশ বছরে এই দ্বিতীয়বার।'

আঁতকে উঠলো ডিক্রু। 'সেকি! কেন!'

'কেনাই যখন হবে, ভালো করে দেখে আসি আরেকবার। ফিরে এসে শুনবো কনসরটিয়াম কি বললো।'

'না! মিঃ রানা, প্লিজ, শিঙ্গারিরায় যাবেন না!' ডিক্রুর চেহারায় আতংক। 'ওখানে ডাকাতদের আস্তানা, যাকে দেখে তাকেই গুলি করে মেরে ফেলে। প্লিজ, মিঃ রানা...'

'কে বললো ডাকাত ওরা?' বিস্ময় প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'তুমি আসলে বিদ্রোহীদের কথা বলতে চাইছো, তাই না? গেরিলা ফাইটার যারা অস্ত্র জমা দেয়নি?'

'হ্যাঁ, মানে...ওই হলো আর কি!' মাথার পিছনটা চুলকাতে শুরু করলো ডিক্রু। সে ম্যাটাবেলও নয়, ম্যাশোনাও নয়, বাপ-

দাদারা এসেছিল ভারত থেকে। দুই প্রধান উপজাতির কোনো-টার সাথেই এদের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। শ্বেতাঙ্গরা যখন ছিলো, তাদের সাথে এরা খুব ভালো মানিয়ে চলতে পারতো। 'আপনি, মিঃ রানা, এতো বড় ঝুঁকি নেবেন না, প্লিজ। বাইরের লোক ওদিকে কেউ যায় না, গেলে আর ফিরে আসে না।'

'এ-কথা শোনার পর তো না গেলেই নয়,' বললো রানা। বিদ্রো-হীরা সত্যি যদি ওখানে আস্তানা গেড়ে থাকে, তাদের সাথে একটা সমঝোতায় আসা দরকার, ভাবলো ও। তা না হলে পরে বিপদে পড়বেন রুবেনসন। 'দেরি করছো কেন?' ডিক্রুকে জিজ্ঞেস করলো ও। 'জুরিখে ফোন করবে না?'

ডিক্রু বিদায় নেয়ার পর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো রানা। সেই বিশাল অরণ্যে রেবেকার সাথে শিকার করেছে ও, সে স্মৃতি ভুলবার নয়। যেতে মন চাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

এ এক বিস্ময়কর অরণ্য, এখনো বুনো, স্পর্শ করা হয়নি—বেড়া নেই, কর্ষিত মাটি নেই, বাড়ি-ঘর নেই—জাম্বেজি উপত্যকা থেকে শুরু হয়ে পাহাড় বরাবর জঙ্গলের গভীর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ৎসেৎসি মাছিদের একটা পর্দা গৃহপালিত পশু আর গ্রাম্য চাষীদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। বিশাল এলাকাটার একদিকের সীমানায় শিজারিরা গেইম রিজার্ভ, আরেকদিকে মজোলো ফরেস্ট রিজার্ভ, দুটোই বুনো প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়, অভয়ারণ্য। রেবেকার বাবার বাবা, ফ্রেডারিক ডানকান সাউল উনিশ শো ত্রিশ সালে এই জায়গা প্রতি একর ছয় পেন্স দরে কিনেছিলেন। এক লাখ একর, দু'হাজার

পাঁচশো পাউণ্ডে। 'দাদা বা বাবা এখানে কখনো গরু-ছাগল চরতে দেয়নি,' রানাকে বলেছিল রেবেকা। সেবার শিজারিরা নদীর কাছাকাছি একটা ডোবার ধারে, বুনো ডুমুর গাছের নিচে ক্যাম্প ফেলেছিল ওরা, শেষ বিকেলের রোদে নদীর পাড়ের সাদা বালি চিকচিক করছিল, বহুরঙা বুনো মোরগের একটা দল উড়ে এসে বসলো, অমনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মাঝখানে পড়লো একটা ডোরাকাটা চিতাবাঘ।

পাহাড়ী নালাটা নেমে এসে চলে গেছে নদীর দিকে, শুকনো অবস্থায় এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। শেষবার দশ বছর আগে এই পথ ধরে রেবেকার সাথে গেছে ও। তারপর এই রাস্তা আর বোধহয় ব্যবহার করা হয়নি। পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও বোধহয় নালার মুখ বেঁধে দেয়া হয়েছে, এখন আর বর্ষাকালেও পানি আসে না। নালার দু'পাশে আর মাঝখানে ঝোপ-ঝাড় গজিয়েছে, চলার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মোপানি গাছ উপড়ে পথের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে বুনো হাতি। ফোক্সওয়াগেন ছোটো বলে তবু রক্ষে, রোডব্লক গলে প্রতিবার বেরিয়ে যেতে পারছে রানা। কোথাও কোথাও ঝুরঝুরে হয়ে আছে বালি, চাকার নিচে গাছের ডাল ফেলে জায়গাটুকু পেরিয়ে আসতে হলো। পাঁচ-সাতবার পথ হারিয়ে ফেললো ও, গাড়ি থেকে নেমে খোঁজাখুঁজি করে নতুন করে আবিষ্কার করতে হলো প্রতিবার। একবার অ্যান্ট-বিয়ারের গর্তে ঢুকে গেল চাকা, জ্যাক ব্যবহার করে গাড়ির সামনের অংশ তুলতে হলো। একসময় গাড়ি ফেলে এগোতে হলো ওকে, শেষ ক'মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সেই ডোবা, আর ডুমুর গাছের নিচে পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো।

ঘাসের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো রানা, এ-পাশ ও-পাশ না করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলো পাখিদের কলরবে, আফ্রিকার পুবাকাশে তখন গোলাপি আভা ফুটতে শুরু করেছে। টিন খুলে বেক করা ঠাণ্ডা বীন আর কফি খেলো ও। ব্যাগটা ডুমুর গাছের তলায় রেখে পা বাড়ালো নদীর দিকে।

পায়ে হেঁটে এই বিশাল অরণ্যের খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব নয়, অতো সময় নেই রানার। তার আসলে কোনো দরকারও নেই। শিকারিরা নদীর পাড়ে পৌঁছুলেই সমস্ত খবর জানা যাবে। এই নদীই গোটা এলাকার হৃৎপিণ্ড। নদীর পাড়ে যা সে পাবে তা থেকে আন্দাজ করা যাবে কতোটুকু কি বদলেছে।

পাড়ে পৌঁছেই টের পেলো রানা, সাধারণ বুনো প্রাণী আগের মতোই প্রচুর রয়েছে। নদীর ওপারে, সাদা বালির ওপর ঝাঁকঝাঁক বুনোহাঁস। এপারে ছড়ানো শিংওয়ালা হরিণের পাল। তারপর দুর্লভ প্রাণীদের উপস্থিতিও টের পেলো ও। কাল রাতে এখানে ওরা পানি খেতে এসেছিল। নদীর পাড় ঘেঁষে এগোলো রানা, পায়ের ছাপগুলো দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলো। এক শো গজের মধ্যে এক জোড়া চিতার ছাপ পাওয়া গেল। হাতির পাল বেশ ক'দিন আগে এই জায়গা হয়ে গেছে। কিন্তু গণ্ডার, মোষ, আর সিংহের পায়ের দাগগুলো পরশু রাতের।

লাঞ্চের সময় ছুরি দিয়ে কেটে শুকনো মাংসের ফালি আর বেওব্যাব গাছের ফল পেড়ে তার রসালো টক শাঁস খেলো রানা। আবার হাঁটা শুরু করে ঘন, গভীর, বুনো একটা আবলুস ঝোপের সামনে চলে এলো ও। সরু, আঁকাবাঁকা গেইম ট্রেইল ধরে ঝোপের ভেতর ঢুকলো। এক শো গজও এগোয়নি, ছোটো একটা ফাঁকা

জায়গা দেখতে পেলো, চারদিকে নিশ্ছিদ্র উঁচু পাঁচিলের মতো ঝোপ। বোঁটকা একটা গন্ধ ঢুকলো নাকে, খোঁয়াড়ে যেমন থাকে, কিন্তু আরো বেশি ঝাঁঝালো। চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, চোখে খানিকটা কৌতূহল। গন্ধটা সাথে সাথে চিনতে পেরেছে ও, গোবর-গাদা থেকে আসছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ফিরে আসে অনেক বুনো জন্তু। বিষ্ঠার ধরন দেখে জানোয়ারটা কালো গণ্ডার হবে বলে মনে করলো রানা। হজম করা কচি পাতা, রসালো ডালপালা, বাকল চিনতে অসুবিধে হলো না —ছড়িয়ে আছে চারদিকে, মাড়ানো হয়েছে পা দিয়ে।

কালো গণ্ডার আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্লভ, এবং বিপজ্জনক প্রাণী। যুদ্ধের আগে জ্যাম্বেজি উপত্যকা ঘেঁষে পাহাড়ে কুখ্যাত একটা কালো-গণ্ডার ছিলো। ওখানটায় ঢাল বেয়ে রাস্তা আর রেললাইন, দুটোই ভিক্টোরিয়া ফলের দিকে নেমে গেছে। গণ্ডার মহাশয়, রাস্তাটা যেখানে খুব বেশি খাড়া, তার কাছাকাছি অপেক্ষা করতো। গাড়ি-গুলো ওখানে কাছিমের মতো এগোতো। শিং নিচু করে ছুটে আসতো সে, সংঘর্ষের সাথে সাথে রেডিয়েটর ফুটো হয়ে গরম বাষ্প বিস্ফোরিত হতো। তারপর, ভারি তৃপ্ত হয়ে, কদম চালে ছুটে ঢুকে পড়তো ঝোপের ভেতর, গলা দিয়ে বিজয়সূচক ঘড় ঘড় উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে আসতো। সব মিলিয়ে আঠারোটা বাস-ট্রাক ধ্বংস করে সে।

সাফল্যের গর্বে অহংকারী হয়ে ওঠে গণ্ডার, নিজের ক্ষমতাকে বড় করে দেখতে শুরু করে। শেষে একদিন ভিক্টোরিয়া ফলস এক্স-প্রেসের ওপর হামলা চালিয়ে বসলো। সামন্ত যুগের একজন নাই-টের মতো রেললাইন ধরে সগর্বে ছুটে এলো সে। ট্রেনটা ঘণ্টায়

বিশ মাইল গতিতে ছুটছিল, আর গণ্ডারের ওজন ছিলো দুই টন—উল্টোদিকে সে-ও ওই একই গতিতে ছুটছিল। সংঘর্ষের সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল ট্রেন, লাইনের ওপর বিকট শব্দে ঘষা খেলো চাকাগুলো, তীর বেগে ছুটলো লক্ষ লক্ষ আগুনের ফুলকি। কিন্তু রেডিয়েটর ধ্বংসকারী হিসেবে বেচারা গণ্ডারের ক্যারিয়ার ওখানেই খতম হয়ে গেল।

বিষ্ঠার রঙ আর ভিজে ভাব লক্ষ্য করে রানা বুঝলো, বারো ঘণ্টা আগে এখানে ছিলো গণ্ডারটা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। নতুন একটা পথ ধরে এগোলো ও। সাধ, গণ্ডারটাকে একবার দেখবে। আধ মাইলও এগোয়নি, সরু ট্রেইলের ডান পাশ থেকে আচমকা একটা খসখস আওয়াজ হলো। ঘন, কালো, দুর্ভেদ্য ঝোপ নিরেট পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। ঝোপ থেকে খয়েরি রঙের এক দল কাঠঠোকরা ঝটপট ঝটপট পাখা ঝাপটে আকাশে উঠলো, রানার মাথার ওপর ছোট্ট আকাশ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। বড়সড় বুনো প্রাণীদের ধারেকাছেই থাকে এগুলো, মহারথীদের গায়ে বসে থাকা পোকা-মাকড় ধরে খায়, বিনিময়ে সংকেত দিয়ে আগেভাগে জানিয়ে দেয়, বিপদ আসছে।

হঠাৎই শোনা গেল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, যেন কোনো স্টিম ইঞ্জিন বাষ্প ছাড়ছে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো ঝোপ, পথের ওপর বেরিয়ে এলো বিশাল এক কালো গণ্ডার, রানার মাত্র বিশ গজ দূরে। পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে একবার ডানে, একবার বামে। ঘন ঘন ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাকাচ্ছে, লম্বা চকচকে জোড়া শিং দিয়ে কাকে গুঁতো মারা যায় খুঁজছে যেন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, জানে, গণ্ডারের দৃষ্টিসীমা মাত্র

দশ-বারো গজ । তবে, তৈরি হয়ে আছে ও, গণ্ডারটা ওকে দেখতে পেলেই ঝোড়ে দৌড় দেবে। বিশাল ধড়টা আশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গিতে এদিক ওদিক দোলাচ্ছে গণ্ডারটা, ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে চ্যালেঞ্জ করছে অদৃশ্য শত্রুকে। রানার মনে হলো, প্রতি মুহূর্তে ওটার শিং জোড়া আরো লম্বা, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। আস্তে করে পকেটে হাত ভরে ছুরির বাঁটটা ধরলো ও। নড়াচড়াটা দেখতে না পেলেও, অনুভব করতে পারলো প্রতিপক্ষ, ফোঁস ফোঁস করতে করতে পাঁচ-সাত পা এগিয়ে এলো। এবার রানাকে তার দেখতে পাবার কথা। তার মানে সিরিয়াস বিপদ হতে পারে।

ছোট্ট করে, কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে হাত নেড়ে ছুরিটা গণ্ডারের মাথার ওপর দিয়ে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিলো রানা। একটা ডালে ঠক্ করে বিঁধলো সেটা। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো গণ্ডার, বিশাল ধড় নিয়ে ঝড়ের মতো ছুটলো নাক বরাবর। ঝোপ খুলে গেল, যেন একটা সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক ঢুকলো ভেতরে। মট মট করে ভাঙলো ডালপালা। শত্রুর খোঁজে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপর দিকে ছুটলো গণ্ডারটা।

আরো দু'তিন ঘণ্টা ঘুরে কয়েকটা ক্ষুদে ডোবা দেখলো রানা। প্রতিটির পানি পচা, নোংরা—কিন্তু গণ্ডারগুলো নদীর পানির চেয়ে এই নোংরা পানিই কি কারণে যেন বেশি পছন্দ করে। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো। এই এক লক্ষ একরকে ট্যুরিস্টদের জন্যে লোভনীয় করে তোলা যায় না? দুষ্প্রাপ্য বুনো প্রাণী আছে জানলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বহু লোক ছুটে আসবে এখানে। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত মাত্র এক ঘণ্টার পথ, এখানে আসতে হলে ট্যুরিস্টদের অতিরিক্ত তেমন কোনো খরচ

লাগবে না।

ডোবার ধারে, একটা ধরাশায়ী গাছের ওপর বসলো রানা। প্রাণী-গুলোকে একেবারে কাছ থেকে দেখাবার ব্যবস্থা রাখা চাই, ট্যুরিস্ট-দের মনে তাহলে একটা ভয় ভয় ভাব থাকবে। ক্যাম্পগুলো হবে ছোটো ছোটো, প্রচুর ওয়াইন থাকবে সেখানে, আর পরিবেশনের জন্যে থাকবে সুন্দরী মেয়েরা। ডোবার পাশেই হবে ক্যাম্প, তারের জাল দিয়ে ঘেরা, বন্য প্রাণীগুলো জালে মুখ ঠেকিয়ে ভেঙচাবে, আক্রোশে ফুঁসবে, আর ট্যুরিস্টরা কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি তুলবে তাদের।

এ-ধরনের ট্যুরিস্ট স্পট আফ্রিকায় নেই, কাজেই মাথা পিছু মোটা টাকা আদায় করা যাবে। শুধু অসম্ভব ধনী লোকেরাই আসতে চাইবে এই স্পটে।

সূর্য ডুবে যাবার আরো খানিক পর ডোবার ধারে, ডুমুর গাছের নিচে ফিরে এলো রানা। ওর মুখ আর হাত রোদে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে, ৎসেৎসি মাছির কামড়ে ফুলে গিয়ে জ্বালা করছে ঘাড়। এতো ক্লান্ত যে খেতে বসার ইচ্ছে হলো না। দুই চুমুক হুইস্কি গিলে চাদর মুড়ি দিলো ও, প্রায় সাথে ঘুমিয়ে পড়লো। রাতে একবার উঠলো ও, চোখে ঘুম থাকলেও বহুদূর থেকে ভেসে আসা সিংহের গর্জন সারা দেহ-মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দিলো।

ঘুম ভাঙলো পাখিদের কিচিরমিচিরে, ওর মাথার ওপর ঝাঁক বেঁধে বসে পাকা ডুমুর খাচ্ছে। নিজেকে সুখী মনে হলো রানার। জীবনে যেন দুঃখ বলতে কিছু নেই।

নাস্তা সেরে দিগম্বর অবস্থায় নদীতে নামলো ও, হাতে ফার্মার'স উইকলি। আফ্রিকান কৃষকদের বাইবেল বলা হয় পত্রিকাটিকে। অল্প

পানিতে নেমে চিনির দানার মতো কর্কশ বালিতে বসলো ও, পানির ওপর জেগে থাকলো শুধু গলা আর মাথা। ঠাণ্ডা পানি ঘাড়ের ব্যথা কমিয়ে দিলো। পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো পড়লো রানা। দেখছে ভালো জাতের গরুর কোথায় কি দাম।

কিং'স হেভেন আর কুইন'স হেভেন, দুটো র‍্যাঞ্চের জন্যে গরু কিনতে হবে। সেরা জাতের ষাঁড় না হলে ভালো জাতের বাচ্চা দেবে না গাভীগুলো। দাম দেখে মাথা ঘুরে গেল রানার। এক এক করে আরো সব খরচের কথা মনে পড়লো। র‍্যাঞ্চের জন্যে যাবতীয় ইকুইপমেণ্ট আবার নতুন করে কিনতে হবে সব। শিকারিরা নদীর ধারে ট্যুরিস্ট ক্যাম্প তৈরি করার জন্যেও বিস্তর টাকা দরকার। ছাগল সহ দখলকারীদের সরাতে হবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওদেরকেও টাকা দিতে হবে। ভাবলো, এতো বড় বড় প্ল্যান করছি, কিন্তু রুবেনসনের অতো টাকা কোথায়? পানি থেকে উঠে পাড়ের দিকে এগোলো ও। এবার ফিরতে হয়।

'হল্ট। নড়লে গুলি করবো।' জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো গেরিলারা।

পরনে রঙ-চটা ডেনিম, হাতে এ-কে রাইফেল, মুখে সিনবেবেল—রানা বুঝতে পারলো, কারা এরা। রেগুলার জিম্বাবুই সৈন্যরা এ-ধরনের ইউনিফর্ম ব্যবহার করে না, তাদের অস্ত্রও ন্যাটো দেশগুলো থেকে আমদানী করা, কথা বলে শোনা (SHONA) ভাষায়। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা এরা, নিষিদ্ধ ঘোষিত জিম্বাবুই পিপলস রেভলিউশন আর্মি-র সদস্য। বঞ্চিত ম্যাটাবেল উপজাতির বিদ্রোহী তরুণরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অস্ত্র জমা দেয়নি, পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আইন মানে না, সরকারকে ভয় করে না, প্রত্যেকে এক

একটা নির্দয় খুনী। প্রথমে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী, পরে সরকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে সবাই এক একজন দক্ষ গেরিলা।

'কোথাও নিয়ে যাবার দরকার নেই,' ডান পাশ থেকে বললো একজন। 'এখানেই মেরে দিই।'

'চোখ বন্ধ করো,' দ্বিতীয় গেরিলা নির্দেশ দিলো রানাকে।

এদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে রানা। ভিক্টোরিয়া ফলসের কাছে মাইক্রোবাস ভর্তি একদল শ্বেতাঙ্গ স্কুল ছাত্রকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় ওরা, মাত্র কিছুদিন আগের ঘটনা। তিন দিন পর একটা ঢালের নিচে পাওয়া যায় বাসটাকে। বাচ্চা ছেলেগুলোকে খুন করেনি ওরা, কিন্তু করলেই বোধহয় ভালো হতো। বাসটা উদ্ধার করে শহরে নিয়ে আসে পুলিশ। ছাত্রদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের সবার চোখ উপড়ে নিয়েছিল ম্যাটাবেল গেরিলারা। চল্লিশ জন ছাত্রের চল্লিশ জোড়া চোখ।

শ্বেতাঙ্গরা এদেশে এখনো কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। আসলে শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে সরকারকে হেয় করতে চায় গেরিলারা, প্রতিপক্ষকে উত্যক্ত করার জন্যেই এ ধরনের কাণ্ড করে বেড়ায়। আরেকটা উদ্দেশ্য নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করা, দুনিয়ার মানুষ যাতে জানতে পারে বঞ্চিত ম্যাটাবেলরা তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে লড়ছে।

তিনজনের মধ্যে যে একটু বয়স্ক, তার দিকে তাকালো রানা। বোধহয় সে-ই এদের লিডার। সিনডেবেল ভাষায় বললো ও, 'কিন্তু গুলি করার আগে আমার একটা কথা ছিলো।'

গেরিলারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর লিডার

জানতে চাইলো, 'কে হে তুমি, আমাদের ভাষা শিখলে কোথেকে?'

মুচকি একটু হাসলো রানা। 'যদি বলি, আমিও একজন মুক্তি-যোদ্ধা, এই মাটিতে দাঁড়িয়ে তোমাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, বিশ্বাস করবে?'

'মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!' একজন গেরিলা চেঁচিয়ে বললো। 'শালা ভারি চালাক, আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।'

লিডার গম্ভীর গলায় বললো, 'মিথ্যে বললে তোমাকে আমরা কষ্ট দিয়ে মারবো। কোথায় যুদ্ধ করেছো তুমি? কোন্ সেক্টরে? তোমার কমাণ্ডার কে ছিলো?'

সেক্টর আর কমাণ্ডিং অফিসারের নাম জানালো রানা।

'তারমানে বলতে চাইছো তুমি আমাদের নেতা জেনারেল টস মাজুলেটের সাথে যুদ্ধ করেছো?'

মৃদু হাসলো রানা। 'জেনারেল মাজুলেট আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আরেকটা ধাপ্পা!' লাফিয়ে উঠলো তৃতীয় গেরিলা। 'স্রেফ গুল মারছে। আমাদের নেতা একজন বিদেশী ক্যাপিটালিস্টের বন্ধু হতে পারেন না।'

'অনুমতি পেলে,' শান্ত গলায় বললো রানা, 'তোমাদের আমি একটা ফটো দেখাতে পারি। তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'শালার পকেটে নিশ্চই গ্রেনেড আছে!'

লিডার ধমক দিলো সঙ্গীদের। রানাকে বললো, 'কার ফটো?' হাত বাড়ালো সে। 'দেখি?'

মাটিতে পড়ে থাকা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে লিডারের হাতে ধরিয়ে দিলো রানা। ভেতর থেকে বের

করে ফটোটা দেখলো ওরা। প্রায় দশ বছর আগের তোলা ছবি, রানার চেহারা বদলেছে একটু। টস মাজুলেটের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

'নেতার সাথে এ-লোক তুমি নও!' ঘোষণা করলো একজন গেরিলা। 'তোমাকে আমরা জ্যান্ত কবর দেবো।'

খুঁটিয়ে রানাকে দেখলো লিডার। ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলালো সে। 'হ্যাঁ, নেতার সাথে এটা সম্ভবত তোমারই ছবি। ঠিক আছে, ন্যাংটো দেখতে খারাপ লাগছে, কাপড় পরো।'

সাবধানে কাপড়-চোপড় পরলো রানা। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলাপ করছে গেরিলারা। লিডার রানাকে মারতে চায় না, সঙ্গী দু'জন তাকে পটাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু লিডার নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। রানার দিকে ফিরে বললো, 'আমি মেজর কুকি,' ডান পাশের লোকটাকে দেখালো সে, 'লেফটেন্যান্ট মোয়ান-তাজ,' সবশেষে দেখালো বাঁ পাশের লোকটাকে, 'ক্যাপ্টেন কিন-কিনি। তোমার নাম বলো। বলো এখানে কেন এসেছো।'

নিজের নাম-ধাম জানিয়ে রানা বললো, 'আমি আসলে তোমাদের সাথে দেখা করতেই এখানে এসেছি।'

'মিথ্যে কথা!' সমস্বরে চিৎকার করলো লেফটেন্যান্ট আর ক্যাপ্টেন।

চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো রানার। 'ফের যদি আমাকে মিথ্যে-বাদী বলো, আমি তোমাদের রাইফেল কেড়ে নেবো।'

পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো ওরা দু'জন। লিডার রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'হয়তো কেড়ে নিতে পারবে না, কিন্তু এ-লোক যে চেষ্টা করবে

তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমি একটা বই লিখছি,' বললো রানা। 'বইটা ইংরেজীতে লেখা হবে, সারা দুনিয়ার লোক যাতে পড়তে পারে। সেই বইতে আমি তোমাদের কথাও লিখতে চাই।'

লেফটেন্যান্ট আর ক্যাপ্টেন এবার একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকালো।

'ম্যাশোনা কুকুরদের কথা লিখবে না?' জানতে চাইলো মেজর কুকি। 'যারা ম্যাটাবেল উপজাতিকে জিম্বাবুই থেকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে?'

ম্যাশোনা আর ম্যাটাবেল, দুই প্রধান উপজাতি। যুগ যুগ ধরে পরস্পরের সাথে লড়ে আসছে ওরা। ম্যাশোনারা সংখ্যায় অনেক বেশি, শিক্ষা-দীক্ষায়ও তারা এগিয়ে আছে। ম্যাটাবেলরাই বঞ্চনার শিকার, তারাই অত্যাচারিত।

'লিখবো,' মিথ্যে আশ্বাস না দিয়ে সত্যি কথাই বললো রানা। 'কিন্তু তারা যে তোমাদের ওপর অত্যাচার করছে তার প্রমাণ পেতে হবে আমাকে।'

'রাজা মজিলিকাজির কিরে,' লেফটেন্যান্ট মোয়ানতাজ বললো, 'ম্যাশোনারা আমাদেরকে দেশ ছাড়া করতে চাইছে।'

ক্যাপ্টেন কিনকিনি বললো, 'তোমার বইতে লিখে দাও, আমরা ম্যাশোনাদের কর্তৃত্ব মানি না। মন্ত্রীসভায় একজন বাদে সবাই ম্যাশোনা, কেন?'

'গণতন্ত্রের নিয়ম হলো সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরকার গঠন করবে...'

'গণতন্ত্রের...মারি!' অশ্রাব্য একটা গাল দিলো মেজর। 'আমি একজন ম্যাটাবেল, শুধু একজন ম্যাটাবেল রাজার নির্দেশ মানবো। ওরা আমাদের নেতা নকোমোকে জেলে পুরেছে...।'

নকোমোর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো, বিদ্রোহীদের সাহায্য করছেন তিনি। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তাঁকে।

লেফটেন্যান্ট বললো, 'জঙ্গলের ভেতর ম্যাশোনা সরকার জেলখানা তৈরি করেছে। ম্যাটাবেল নেতাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে টরচার করা হয়। তোমার বইতে এ-সব কথা না থাকলে…'

মেজর কুকি বললো, 'নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নেই আমাদের, অস্ত্রের অভাব, নেতা নেই—আর এই সুযোগে ম্যাশোনাদের স্পেশাল ইউনিট গ্রামে গ্রামে ঢুকে আমাদের মা-বোনকে রেপ করছে, পুরুষদের গুলি করে মেরে ফেলছে।'

কিন্তু সরকারী পত্রিকায় ছাপা হয় ঠিক উল্টো খবর। উলঙ্গ, রক্তাক্ত ম্যাশোনা তরুণীর ছবি ছেপে দিয়ে নিচে ক্যাপশন দেয়া হয়ঃ ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা একে ধর্ষণ করেছে।

'যে কাজ করিনি সেই কাজ করেছি বলে রটিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা,' বললো মেজর। 'তাই এবার ওরা যা ভাবতেও পারে না তাই করবো। সামনে যাকে পাবো তাকেই খুন করবো আমরা।'

ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা টেরোরিস্ট, কোনো সন্দেহ নেই। আপন মনে নিঃশব্দে হাসলো রানা। রবিন হুডও একজন টেরোরিস্ট ছিলো। 'তোমরা তাহলে সত্যি ছাত্রদের…?'

'না,' রানাকে বাধা দিয়ে বললো মেজর কুকি। 'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে জঘন্য সব মিথ্যে অভিযোগ রটিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ বা বিদেশীদের ওপর আমাদের কোনো রাগ নেই। কোনো মেয়েকেও আমরা কখনো রেপ করিনি। আমাদের স্বর্গবাসী রাজা মজিলিকাজি তাতে অসন্তুষ্ট হবে।'

'কোনো কারণ ছাড়া খুন-খারাপি করলে মানুষ তোমাদের ভুল

বুঝবে,' বললো রানা।

'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ অ্যাডভাইজার,' বললো মেজর কুকি। 'ভালো কথা, জেনারেল মাজুলেটের সাথে তোমার দেখা হবে?'

'হ্যাঁ, দু'একদিনের মধ্যেই হবে।'

'নেতাকে আমাদের কথা বলবে। বলবে, আমরা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি।'

ভিক্টোরিয়া ফলস পর্যন্ত রানার সাথেই গাড়িতে চড়ে এলো ওরা, গেরিলাদের অন্য কোনো গ্রুপের সামনে পড়ে গেলে রানার যাতে কোনো বিপদ না ঘটে। বিদায় নেয়ার সময় মেজর আবার বললো, 'নেতাকে বলবে, আমাদের অস্ত্র দরকার। বলবে, আমাদের একজন নেতা দরকার।'

'বলবো,' কথা দিলো রানা।

পরদিন সকালে মোটেল থেকে কয়েক জায়গায় ফোন করলো রানা, জাসটিন চ্যাপেলের ফাইল থেকে টোকা কিছু নোট রয়েছে সামনে।

প্রথমে কথা বললো কালিচরণ ডিক্রুর সাথে। 'জুরিখ থেকে কোনো জবাব এলো?'

'টেলেক্স পাঠিয়েছি,' বললো ডিক্রু, 'কিন্তু জবাব আসবে বলে মনে হয় না।'

'বিকেলে কথা হবে।'

এরপর বুলাওয়ায়োও থেকে তিন শো মাইল উত্তর-পুবে রাজধানী হারারে, ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে ফোন করলো ও। 'মশিয়েজ্যঁ মন্টিপিলার, আপনাদের কালচারাল অ্যাটাশে, প্লিজ।'

'মন্টিপিলার।'

'মাসুদ রানা। আমাদের দু'জনেরই বন্ধু তিনি, ফোন করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ। আপনার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। দয়া করে আমার সাথে একবার দেখা করুন না, খুশি হবো।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে দিলো রানা। জাসটিন চ্যাপেল নির্বাচনে নিশ্চই ভুল করেননি। মন্টিপিলারকে কোনো মেসেজ দেয়া হলে সেটা বারো ঘণ্টার মধ্যে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে সোজা তাঁর টেবিলে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

এরপর ট্যুরিজম অ্যাণ্ড ইনফরমেশন মিনিস্টারের অফিসে ফোন করলো রানা, প্রিয় বন্ধুর সাথে কথা বলবে। অনেক চেষ্টা করার পর মন্ত্রী মহোদয়ের সেক্রেটারীকে পাওয়া গেল, সে জানালো, মিনিস্টার এখন পার্লামেন্টের অধিবেশনে রয়েছেন, পরে যোগাযোগ করতে হবে। রানাকে মন্ত্রীর বাড়ির ফোন নম্বর দিলো সে।

চারবার চেষ্টা করার পর একজন পার্লামেণ্টারিয়ান সেক্রেটারীকে পেলো রানা। মন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চায় শুনে লোকটা রূঢ় ভঙ্গিতে জেরা শুরু করে দিলো ওকে। কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে বললো, 'মিনিস্টারের শিডিউল চেক করতে হবে, পরে যোগাযোগ করবেন।'

এরপর সরকারের কোম্পানী রেজিস্ট্রি অফিসে ফোন করলো ও। সাউল র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেডের শেয়ার রেজিস্ট্রার, আর্টিকেলস, এবং মেমোরেনডাম দরকার রানার। রেজিস্টার ভদ্রলোক ওকে জানালেন, 'চারটের দিকে এসে কপিগুলো নিয়ে যাবেন, পনেরো ডলার ফি দিতে হবে।'

এরপর সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস। এখান থেকেও দলিল-পত্রের কপি চায় ও।

বিকেলে আবার পার্লামেন্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করা হলো। সেক্রেটারী জানালো, 'মিনিস্টার আপনার সাথে শুক্রবার সকাল দশটায় দেখা করতে রাজি হয়েছেন, দশ মিনিটের জন্যে।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। রাজি আর দশমিনিট, এই শব্দ দুটো ওর পছন্দ হলো না। মন্ত্রী হবার পর টস মাজুলেট বদলে গেছে নাকি? গুরুত্ব দিতে চাইছে না ওকে? ব্যাপার কি?

সন্ধ্যের দিকে আবার কালিচরণ ডিক্রুকে ফোন করলো রানা। 'এখনো কোনো জবাব আসেনি?'

অপর প্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ডিক্রু।

বৃহস্পতিবার সকালে তার অফিসে নিজেই হাজির হলো রানা। 'এখনো কোনো সাড়া নেই?'

একগাল হাসলো ডিক্রু। 'এই ঘণ্টাখানেক আগে টেলেক্স পেয়েছি।'

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়লো রানা। সই করার সাথে সাথে জুরিখে বসে দশ লাখ মার্কিন ডলার দিলে সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনা যাবে। সময় সীমা, এক মাস।

ডিক্রু আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিল রানাকে, জিজ্ঞেস করলো, 'এক মিলিয়ন ডলার, পারবেন যোগাড় করতে?'

'ব্যাংক ডাকাতির প্ল্যানটা যদি সফল হয়,' হাসতে হাসতে বললো রানা। 'দেখা যাক, এক মাস তো আর কম সময় নয়। আমিই যোগাযোগ করবো।'

সেদিনই ফোক্সওয়াগেন নিয়ে ম্যাশোনাল্যাণ্ড, হারারে-র উদ্দেশে

রওনা হয়ে গেল রানা। শহর থেকে বেরিয়ে দশ মাইল এগিয়েছে, প্রথম রোডব্লকের সামনে থামতে হলো। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ঘাসের ওপর নেমে দাঁড়াতে হলো ওকে। ক্যামোফ্লেজ ব্যাটলস্যুট পরা দু'জন কালো ট্রুপার অযথা প্রচুর সময় নিয়ে অস্ত্রের খোঁজে সার্চ করলো ফোক্সওয়াগেন। একজন লেফটেন্যান্ট রানার পাসপোর্ট দেখতে চাইলো। লোকটার ক্যাপ ব্যাজ দেখে বোঝা গেল, থার্ড ব্রিগেডের অফিসার সে।

তিনশো মাইল যেতে আট দশ বার রোডব্লকের সামনে পড়তে হলো। শহরে পৌঁছে হিলটনে উঠলো ও। ঠাণ্ডা শাওয়ার সেরে ডিনার খেলো, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফের ওপর বইয়ের প্রথম কয়েক পাতা লিখে ফেললো। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় পার্লামেন্ট ভবনে পৌঁছুলো রানা।

ওয়েটিং রুমে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মন্ত্রীর অফিসে ডাক পড়লো। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ও, দেখলো, রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা ফাইল দেখছে জেনারেল টস মাজুলেট। কোনো অভ্যর্থনা না, এমনকি মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত।

সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার, ভাবলো ফিরে যাবে কিনা। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হলো, দেখাই যাক না, কতোটুকু বদলেছে ও।

এই লোকের অস্তিত্বের মধ্যেই আশ্চর্য একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। ম্যাটাবেল রাজাদের রক্ত বইছে ওর শরীরে, ওর প্রপিতামহ বাজো ছিলেন ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের নেতা। আঠারো শো ছিয়া-নব্বই সালে শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলায়। বাজোর বাবা গানডাং ছিলেন লোবেনগুলার সৎ ভাই। আর লোবেনগুলা ছিলেন

ম্যাটাবেলদের শেষ রাজা।

রানার চেয়েও লম্বা মাজুলেট, শরীরে এতোটুকু মেদ জমেনি। ইটালিয়ান সিল্ক স্যুট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চওড়া কাঁধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে উঠেছিল এই লোক।

টস মাজুলেটকে প্রথম রানা দেখেছিল রেবেকার র‍্যাঞ্চে, আস্তাবলের চার্জে ছিলো সে। প্রভুভক্ত, বিনয়ী, পরিশ্রমী, সৎ। লোকটার ব্যক্তিত্ব ছিলো, সেই ব্যক্তিত্বই আকৃষ্ট করে রানাকে। রানা বা রেবেকা, কেউ তার সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করতো না। মনে পড়লো, ওদের নির্দেশ পালন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকতো মাজুলেট।

গুণী লোক, অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এতোটা ওপরে উঠে এসেছে। তাই বলে এরকম বদলে যাবে? যুদ্ধের সময় যার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, মুখ তুলে তার দিকে তাকাবার গরজটুকুও দেখাবে না? আনাড়ি এক যুবক, কে তাকে ট্রেনিং দিয়েছিল? শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর টরচার-চেম্বার থেকে কে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল? সব ভুলে গেছে?

এগিয়ে এলো রানা, অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে একটা চেয়ার টেনে বসলো ডেস্কের সামনে।

আরো প্রায় তিন মিনিট পর ফাইল বন্ধ করে মুখ তুললো টস মাজুলেট। 'জিম্বাবুইয়ে কেন এসেছো আবার?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। নির্লিপ্ত চেহারা, মুখে হাসি নেই।

'কেমন আছো?' জানতে চাইলো রানা, মাজুলেটের কথা যেন শুনতে পায়নি ও।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!' মাজুলেটের চেহারা কঠোর হয়ে

উঠলো।

'কেন এসেছি তোমাকে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

'তুমি বিদেশী,' রানার চোখে চোখ রেখে বললো মাজুলেট, 'এ-দেশে জমিজমা কিনতে হলে সরকারের অনুমতি লাগবে।'

'ও, তুমি জানো···'

'জানি বৈকি,' রানাকে বাধা দিয়ে বললো মাজুলেট। 'জিম্বাবুইয়ে ঢোকার পর কোথায় গেছো, কি করেছো সব আমি জানি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করছো তুমি, রানা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনার অনুমতি তুমি পাবে না। যাতে না পাও সেটা আমি দেখবো।'

'কারণটা জানতে পারি?' প্রচণ্ড রেগে গেছে রানা, কিন্তু চেহারায় বা গলার স্বরে সেটা প্রকাশ পেতে দিলো না।

'কারণ আর কিছুই নয়, বিদেশীদের আমরা চাই না। শ্বেতাঙ্গদের তাড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম, বাঁচা গেল। কিন্তু তারপর দেখি, ভারতীয়, মিশরীয় আর ফিলিপিনোরা চারপাশে জাঁকিয়ে বসছে। এই বিদেশী র‍্যাঞ্চাররা একশো ম্যাটাবেলকে চাকর হিসেবে রাখে, কোনো রকমে খেতে পরতে দেয়, কিন্তু নিজেদের ট্যাঁকে ভরে লাখ লাখ ডলার। এবার বাংলাদেশ থেকে তুমিও এসে হাজির হয়েছো। কিন্তু এই অবস্থা আমরা চলতে দিতে পারি না।' রিস্টওয়াচ দেখলো সে। 'আমার কাজ আছে। এবার তুমি আসতে পারো।'

অনেক কষ্টে শরীরের কাঁপুনিটা দমিয়ে রাখলো রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ও। 'যাবার আগে তোমাকে একটা মেসেজ দেয়ার আছে আমার। তুমি জানো শিজারিরায় গিয়েছিলাম আমি। ওখানে তিনজন লোকের সাথে দেখা হয় আমার। তাদের নাম—

মেজর কুকি, লেফটেন্যাণ্ট মোয়ানতাজ, ক্যাপ্টেন কিনকিনি…'

'চোপ।' চাপা গলায় হিস হিস করে উঠলো টস মাজুলেট, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে শুরু করলো। হাত ছ'টো শক্ত মুঠো হয়ে গেছে।'খবরদার, যা বোঝো না তা নিয়ে মুখ খুলবে না। এই মাটি, এই দেশ সম্পর্কে কি জানো তুমি? জড়িয়ে পড়লে স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নাউ, গেট আউট।'

ঘুরে দাঁড়ালো রানা, অপমানে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

পিছন থেকে মন্ত্রীর কঠোর গলা ঢুকলো কানে, 'আশা করি ছ'একদিনের মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে তুমি। এবং আর কখনো ফিরে আসবে না।'

দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলো রানা, তারপর ফিরলো। 'কথা দিতে পারছি না। আগে আমার র‍্যাঞ্চ কেনার আবেদন অফিশিয়ালি প্রত্যাখ্যান করা হোক।'

'তোমার আবেদন যাতে ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয় সে-ব্যবস্থা করবো আমি,' প্রতিজ্ঞা করলো যেন টস মাজুলেট।

রানার একবার ইচ্ছা হলো 'অকৃতজ্ঞ' বলে চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু ঝোঁকটাকে দমন করে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো ও। কেমন যেন দম আটকে আসতে চাইছে। কল্পনাও করতে পারেনি এমন ব্যবহার পাবে সে মাজুলেটের কাছে।

হোটেল রুমে ফিরে এসে আধ ঘণ্টা উত্তেজিতভাবে পায়চারী করলো রানা। এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। মাজুলেট কি সত্যিই এতোটা বদলে গেছে, নাকি এই জঘন্য আচরণের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে তার? বিদেশীদের র‍্যাঞ্চ করতে দেবে না, সেটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেই তো পারতো।

গেরিলা তিনজনকে নিশ্চই চিনতে পেরেছে মাজুলেট। কিন্তু ওদের প্রসঙ্গে কথাই বলতে চাইলো না। নামগুলো শুনেই কেমন যেন আতংকিত হয়ে পড়লো। কেন ? কি কারণ ?

হয়তো সত্যিই বদলে গেছে মাজুলেট। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত, স্বজাতির ভালো-মন্দ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। আরো অনেক কিছু জানতে হবে তাকে, সিদ্ধান্ত নিলো রানা। তার প্রথম রিপোর্টে জাসটিন চ্যাপেলের জন্যে চিন্তা-ভাবনার অনেক খোরাক থাকবে, সন্দেহ নেই।

লাঞ্চের পর ক্ষুদে টেবিলটার সামনে বসলো রানা। চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিয়ে প্রথম রিপোর্টটা লিখতে বসলো ও। জিম্বাবুইয়ে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে, পরিস্থিতির যে আভাস পাওয়া গেছে, এমন কি ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে মাজুলেটের সম্পর্ক, র‍্যাঞ্চ কিনতে না দেয়ার ব্যাপারে তার প্রতিজ্ঞা, ইত্যাদি সহ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত লিখলো ও।

তু'নম্বর রিপোর্টে একটা ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করলো রানা। প্রথমে শিজারিরা এস্টেটের বর্ণনা দিলো, তারপর লিখলো এই বনভূমিকে ট্যুরিস্টদের জন্যে একটা আকর্ষণ করে তুলতে পারলে বছরে কি পরিমাণ ফরেন কারেন্সি আয় করবে জিম্বাবুই সরকার। বিশ্ব ব্যাংক এ-দেশের ট্যুরিজম সম্পর্কে আগ্রহী, এই প্রকল্পটা নিয়ে চিন্তা করতে পারে তারা। এরপর কিংস হেভেন আর কুইন'স হেভেনকে র‍্যাঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলো রানা। লিখলো সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী পানির দরে কেনা সম্ভব, এক মিলিয়ন ডলারে। সব মিলিয়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার দরকার হবে।

রিপোর্ট তুটো একজোড়া ম্যানিলা এনভেলাপে ভরলো রানা,

বিকেলের রোদে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের উদ্দেশে। দূতাবাসে ঢোকার মুখে ফ্রেঞ্চ নৌ-বাহিনীর দু'জন অফিসার সার্চ করলো রানাকে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছে ও, কালচারাল অ্যাটাশে মন্টিপিলার নিজে বেরিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলো ওর সাথে। মন্টিপিলারের অফিসে বসলো ওরা। রানা লক্ষ্য করলো, লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, শরীরের গড়ন দেখে মনে হয় কলেজ অ্যাথলেট। কফি খেলো ওরা, কোনো মন্তব্য ছাড়াই রানার কাছ থেকে এনভেলাপ দুটো নিয়ে দেরাজে ভরলো মন্টিপিলার। 'আমাকে বলা হয়েছে,' বললো সে, 'লোকজনের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের বাড়িতে আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টি আছে, শুরু হিসেবে মন্দ হয় না। ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে, পৌঁছুতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'হিলটনে।'

'সেভেনটিন আওয়ার্সে আপনাকে আমি তুলে নেবো।'

সেভেনটিন আওয়ার্স। এটা একটা সামরিক প্রকাশ ভঙ্গি। আপন মনে হাসলো রানা, কালচারাল অ্যাটাশে?

গাঢ় লাল রঙের ফেজ টুপি পরে ছুটোছুটি করছে ম্যাশোনা চাকর-বাকররা। রুশ আর চীনা কূটনীতিকরা সংখ্যায় এতো বেশি যে যেদিকে তাকাও আছে ওরা। যদিও অ্যামব্যাসাডর বা সেক্রেটারী পর্যায়ের কেউ আসেনি। কালো আফ্রিকান দেশগুলোর অ্যামব্যাসাডররা সস্ত্রীক এসেছেন, প্রতিটি দম্পতিকে রঙচঙে জোড়া

প্রজাপতির মতো লাগছে। কোনো কোনো অ্যামব্যাসাডরের কোমরে ঝোলানো মধ্যযুগীয় তলোয়ারও দেখা গেল। রানাকে প্রথমে মার্কিন অ্যামব্যাসাডর, তাঁর স্ত্রী, তারপর বাকি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো মন্টিপিলার। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের বয়স যদি ষাট হয়, তাঁর স্ত্রীর বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, আন্দাজ করলো রানা। ভদ্রমহিলা রানার হাত ধরে ছাড়তেই চান না, শেষ পর্যন্ত মন্টিপিলারের স্ত্রী এসে উদ্ধার করলো রানাকে। পার্টি শুরু হলো সবুজ ঘাস মোড়া লনে, আটটার দিকে রিসেপশন হলরুমে ডাক পড়লো মেহমানদের। হাতে হুইস্কির গ্লাস, পাশে সস্ত্রীক মন্টি-পিলার, হলরুমে ঢুকলো রানা। হঠাৎ একজনকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো ও, গ্লাস থেকে লাফ দিয়ে খানিকটা হুইস্কি পড়লো দামী কার্পেটে। হলরুমের এক কোণ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। প্রথমে একটু খটকা লাগলো, চিনতে ভুল করছে না তো? একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, ও তাকাবার পরও চোখ ফিরিয়ে নিলো না। সুতীর একটা স্কার্ট পরে আছে সে, স্কার্টের গায়ে অনেকগুলো পকেট, হাঁটু জোড়া উন্মুক্ত। গায়ে সাধারণ একটা টি-শার্ট, পায়ে খোলা স্যাণ্ডেল। বব কাট চুল রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে ঘাড়ের পিছনে বাঁধা, ঝুঁটির মতো লাগলো দেখতে। সাধারণ বেশ ভূষা, কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী। আলোর নিচ থেকে একটু সরে দাঁড়ালো মেয়েটা, এইবার পরিষ্কার চিনতে পারলো রানা। হৃদ-স্পন্দন বেড়ে গেল ওর, সারা শরীরে পুলক অনুভব করলো।

মেয়েটা কোনো মেকআপ ব্যবহার করেনি, অথচ ঠোঁট জোড়া গোলাপ কুঁড়ির মতো লাল। শ্বেতাঙ্গিনীর মতো ফর্সা, কাপড়ের ভেতর মেদহীন স্বাস্থ্য, ভরাট যৌবন। তার এক কাঁধ থেকে একটা

নিকন এফ-থ্রি, ঝুলছে, মটর-ড্রাইভ সহ। দুটো হাতই স্কার্টের পকেটে কব্জি পর্যন্ত ঢোকানো।

তার পাশে প্রকাণ্ডদেহী এক মিলিটারী অফিসার দাঁড়িয়ে। লোকটা আফ্রিকান, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, একজন ম্যাশোনা—কারণ, পরনে রেগুলার জিম্বাবুই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। ব্যাজ আর স্টারগুলো দেখে বোঝা গেল, একজন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল। আফ্রিকান আর্মি অফিসাররা খুব কম বয়সে জেনারেল হতে পারে, এই লোকও তার ব্যতিক্রম নয়। অত্যন্ত সুদর্শন আর স্মার্ট, মেয়েটা গভীর মনোযোগের সাথে তার কথা শুনছে।

'দূর থেকে দেখে কি সাধ মেটে?' রসিকতা করলো মন্টিপিলার। 'চলুন, ওদের সাথেও আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো সে। 'জেনারেল রট উমাঙ্গো, আসুন, আপনার সাথে একজন সাংবাদিকের পরিচয় করিয়ে দিই। মাসুদ রানা···।'

'হাউ ডু ইউ ডু, মিঃ রানা।' জেনারেল হ্যাণ্ডশেক করলো রানার সাথে। হাসিখুশি, ভদ্র, বিনয়ী—ম্যাশোনাদের মধ্যে সাধারণত যা দেখা যায় না।

মন্টিপিলার ব্যাখ্যা করলো, 'জেনারেল উমাঙ্গো একজন মিনিস্টার, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন উনি।' মেয়েটার দিকে ফিরলো সে। 'আর ইনি একজন ফটোগ্রাফার, মিস সোহানা চৌধুরী।'

সোহানা মৃদু একটু হাসলো, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'হাউ ডু ইউ ডু, মিঃ রানা।' তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মন্টিপিলারের সাথে অন্য প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো। 'ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আপনার

সাথে দেখা করতে পারিনি, মিঃ মন্টিপিলার। আমার ফটোর এগজিবিশনের জন্যে এতো খাটলেন, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। অসংখ্য চিঠি পেয়েছি আমি...'

'আগামী সপ্তায় আমার সাথে লাঞ্চ খান, ধন্যবাদ দেয়া হয়ে যাবে,' বললো মন্টিপিলার। রানার দিকে ফিরলো সে। 'মিস সোহানার ফটো এগজিবিশনের ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা, আমাদের সব ক'টা আফ্রিকান কনস্যুলার অফিসে দেখানো হয়েছে। চমৎকার কাজ, মিঃ রানা, আপনার দেখা উচিত।'

'ওনার হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে,' বললো সোহানা। রানা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার সে মুখ খুললো, 'মিঃ মন্টিপিলার, আপনাকে বলাই হয়নি। জেনারেল উমাঙ্গো দারুণ একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আমাকে। উনি আমাকে একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে নিয়ে যাবেন, ইচ্ছেমতো ছবি তুলতে পারবো আমি।'

সোহানার এই অবহেলা, কারণটা আন্দাজ করতে পারলো রানা। দু'জনের কোনো সম্পর্ক নেই, কেউ কাউকে চেনে না, সবাইকে বোঝাতে চাইছে সেটা।

ওরা কথা বলছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রানা। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ফেরালো ও। ওকে একটু দূরে সরিয়ে আনলো জেনারেল উমাঙ্গো। মিটি মিটি হাসছে সে। নিচু গলায় বললো, 'মন খারাপ করবেন না, মিঃ রানা। অনেক সময় দেখা যায় অবহেলার পরপরই ভালোবাসা আসে।'

হেসে ফেললো রানা। 'আপনি তাহলে বলছেন, একেবারে নিরাশ হওয়া উচিত হবে না?'

'নারী বলুন, ব্যবসা বলুন, কোনো ব্যাপারেই হতাশ হতে নেই,' এখনো মিটিমিটি হাসছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'অনেক দিনের পুরনো বন্ধু হঠাৎ শত্রু হয়ে উঠতে পারে, তবু ভেঙে পড়লে চলবে না।'

দ্রুত চিন্তা করলো রানা। কার কথা বলছে জেনারেল? সোহানা, নাকি টস মাজুলেট। মুখে হাসি টেনে বললো ও, 'আপনি অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'রাখতে হয়,' মস্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো জেনারেল। 'কি জানেন, এদেশের এখন প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন দরকার। যে যাই বলুক, এজন্যে বিদেশী পুঁজি আর উদ্যোক্তাও আমাদের দরকার। আমরা ব্যবসা করে রাতারাতি মিলিওনিয়ার হতে চাইছি, কৃষি বা খামারের কাজে মন দিচ্ছি না। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।' একজন বেয়ারাকে ডেকে রানার গ্লাসটা ভরে দিতে বললো জেনারেল। 'জমি কেনার জন্যে অনুমতি চেয়ে আবেদন করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। আপনি বোধ হয় জানেন না, কৃষি মন্ত্রী আমার ভগ্নীপতি।'

'ধন্যবাদ···।'

'শুনলেনই তো, মিস সোহানাকে নিষিদ্ধ একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আমি,' বললো জেনারেল। 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস বড় বেশি চেঁচামেচি করছে, গোপন জেলখানায় আমরা নাকি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রচণ্ড টরচার করছি। আপনি একজন সাংবাদিক, আপনিও আমাদের সাথে চলুন না, নিজের চোখে দেখে আসবেন সব!'

চার

সূর্য ওঠার আগেই নিউ সারাম এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছুলো রানা। একটা হ্যাঙ্গারের পিছনে ফোক্সওয়াগেন থেকে নামলো ও, দেখলো এয়ার ফোর্সের দু'জন নন্-কমিশনড অফিসারের সাথে কথা বলছে জেনারেল উমাঙ্গো। ওকে দেখে তাদের বিদায় করে দিলো জেনারেল, হাসি মুখে এগিয়ে এলো রানার দিকে। পরনে ব্যাটল-স্মক, লাল বেরেট, চিতার মাথা আকৃতির ক্যাপ-ব্যাজ—থার্ড ব্রিগেডের ইউনি-ফর্ম। হোলস্টারে রিভলভার রয়েছে, হাতে চামড়া দিয়ে মোড়া স্টিক।

'গুডমর্ণিং, মিঃ রানা।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখলো জেনারেল, হ্যাঙ্গারের সামনের দিকে চলে এলো ওরা। কাছেই এক জোড়া পুরনো ক্যানবেরা বম্বার পার্ক করা রয়েছে। ওগুলোর পিছনে নীল আর রূপালি রঙের একটা সেসনা দুশো দশ। ওটার দিকে এগোচ্ছে ওরা, ডানার তলা থেকে বেরিয়ে এলো সোহানা। ঘুরে ফিরে প্লেনটা চেক করছে সে, রানা বুঝলো সে-ই প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাবে ওদেরকে। মনে মনে একজন সামরিক পাইলট আর হেলিক-প্টার আশা করেছিল ও।

উইণ্ড-চিটার, ব্লু জিনস, আর নরম চামড়ার মসকুইটো বুট পরেছে

সোহানা। চুলগুলো সিল্ক স্কার্ফে ঢাকা। 'গুডমর্ণিং, জেনারেল। আপনি ডান দিকের সিটে বসতে চান ?'

'সবই তো আমার দেখা আছে,' জেনারেল বললেন, 'সামনে মিঃ রানাকে বসতে দিলে কেমন হয় ?'

'আপনি যা বলেন,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে, ইঙ্গিতে সিঁড়ি দেখালো সোহানা। 'মিঃ রানা।' সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল সে, পিছু পিছু রানা আসছে কিনা দেখলো না।

টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি নিলো সোহানা, কণ্ট্রোল কলাম চেক করলো। টেক-অফ করার খানিক পর, বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর-পশ্চিমের কোর্স ধরলো সে, অটোমেটিক পাইলটের সুইচ অন করে কোলের ওপর একটা স্কেল ম্যাপের ভাঁজ খুললো।

'মেশিনটা চমৎকার,' এই প্রথম কথা বললো রানা। 'তোমার নিজের ?'

'আমি ফ্রি ল্যান্সার হলেও,' উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো সোহানা, 'বর্তমানে কাজ করছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের হয়ে। ওরা এটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে।'

'কতো স্পীডে যাচ্ছি আমরা ?'

'মিঃ রানা, আপনার ঠিক সামনেই একটা এয়ার-স্পীড ইণ্ডিকেটর রয়েছে।' ব্যাস, একথার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

পিছন থেকে রানার সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে জেনারেলই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'নিচে গ্রেট ডাইক।' চওড়া ফিতের মতো পাথুরে একটা আদিগন্ত বিস্তৃতি। 'ক্রোম, প্ল্যাটিনাম, সোনা—বহু কিছু পাবো বলে আশা করছি আমরা।' ডাইকের পর কৃষিভূমি, তারপর

হালকা খয়েরি রঙের পাহাড় আর ঘন সবুজ বনভূমি, যতোদূর দৃষ্টি যায়। 'পনগোলা হিলের এদিকে একটা এয়ারস্ট্রিপে নামবো আমরা। একেবারে নির্জন এলাকা, ছোটো দু'একটা গ্রাম আর একটা মিশন-স্টেশন ছাড়া কিছু নেই, ওখানে আমাদের জন্যে ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা থাকবে। ক্যাম্প ওখান থেকে দু'ঘণ্টার পথ।'

'আরো একটু নিচে নামতে পারি, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

মৃদু শব্দে হাসলো জেনারেল। রানার সিটের পিছনে টোকা দিয়ে বললো, 'বুনো প্রাণীদের সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করার দায়িত্ব নিয়েছেন উনি।'

অনেক নিচে নেমে এলো সেসনা। দমকা পাহাড়ী বাতাসের ধাক্কায় ঝাঁকি খেতে শুরু করলো প্লেন। নিচে গভীর জঙ্গল, কোথাও মানুষের বসতি বা কৃষিজমি চোখে পড়লো না। কখনো গাঢ় সবুজ বনভূমি, কখনো পাথুরে পাহাড়, এভাবেই চললো। একটা পাহাড়ী নালার ধারে এক পাল শিংওয়ালা হরিণকে দেখা গেল। বিশ মাইল দূরে জঙ্গলের ভেতর দেখা গেল বয়স্ক এক নিঃসঙ্গ হাতিকে। প্রায় গাছগুলোর মাথার কাছে নেমে এলো সেসনা, হাতিটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিলো। ভয় পেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠ ধরে ছুটলো ঐরাবত, সোহানা চাইছিলও তাই। 'হি ইজ ম্যাগনিফিসেণ্ট!' চিৎকার করে বললো সে, আনন্দে-উত্তেজনায় চকচক করছে চোখ জোড়া। 'এক একটা আইভরি একশো পাউণ্ডের কম না।' খোলা জানালা দিয়ে, এক হাতেই, ক্যামেরার শাটার টিপে অবিরাম ফটো তুলছে সে। প্লেন এতোই নিচে নেমে এলো, রানার মনে হলো উঁচু করা শুঁড় দিয়ে সেসনাকে যে-কোনো মুহূর্তে পেঁচিয়ে নিতে

পারে হাতিটা। ওটার চোখের কোণে জমে থাকা সাদা পিচুটি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল। সিটের একটা পাশ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রানা।

অবশেষে হাতিটাকে রেহাই দিয়ে সেসনার ডানা সিধে করে নিলো সোহানা, ওপর দিকে উঠতে শুরু করে আড়চোখে তাকালো রানার দিকে, একটা চোখ টিপলো। 'মেরে ফেললে ওই হাতি দশ হাজার ডলারে বিকোবে,' বললো সোহানা। 'কিন্তু বেঁচে থাকলে ওটার দাম দশগুণ বেশি—শুধু তাই নয়, আরো একশো হাতি রেখে যাবার ব্যবস্থা করবে ও।'

রানার সিটের পিছনে আবার মৃদু টোকা পড়লো। 'মিস সোহানার ধারণা, এ-দেশে লার্জ-স্কেল একটা পোচিং রিঙ আছে। উনি কিছু ছবিও দেখিয়েছেন আমাকে। আমারও বিশ্বাস··

'ওদেরকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে হবে, জেনারেল,' বললো সোহানা।

'আপনি খুঁজে বের করুন, আমি ওদের ধ্বংস করবো। আপনাকে তো আমি আগেই কথা দিয়েছি।'

বেশ অনেকদিন হলো এ-দেশে আছে সোহানা, আন্দাজ করলো রানা। জেনারেল উমাঙ্গো সুদর্শন, ভদ্র, হাসিখুশি ; বেশ সহজ হয়ে উঠেছে ওরা।

খেয়াল হলো, জেনারেল কি যেন জানতে চাইছেন। 'মিঃ রানা, র‍্যাঞ্চ আর ট্যুরিস্ট'স স্পট সম্পর্কে আপনার ফিলিংস একটু খুলে বলবেন?'

শিজারিরা এস্টেটকে নিয়ে ও কি প্ল্যান করেছে বলতে শুরু করলো রানা। কালো গণ্ডারের গল্প করলো ও। এলাকার বর্ণনা দিয়ে

জানালো, ওখানে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ আর মোষও আছে। ভিক্টোরিয়া ফলস থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, ট্যুরিস্টরা একবার ঢুঁ মেরে যাবার লোভ সামলাতে পারবে না। লক্ষ্য করলো, সোহানাও গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে। ও থামতে জেনারেল উমাঙ্গো বললেন, 'মিঃ রানা, ঠিক এই ধরনের প্ল্যানই দরকার এ-দেশে। শিজাম্বিরা এস্টেট সম্পর্কে যে প্ল্যান আপনি শোনালেন, শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে সত্যিকার একজন প্রকৃতি প্রেমিকের চেহারা ভেসে উঠলো। ধন্যবাদ, মিঃ রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি শিওর, র‍্যাঞ্চের ব্যাপারেও আপনার প্ল্যান এই রকমই নিখুঁত আর গঠনমূলক...'

'মিস্টারটা বাদ দিলে হয় না, জেনারেল?'

'ধন্যবাদ, রানা—বন্ধুরা আমাকে শুধু রট বা উমাঙ্গো বলে। তুমিও যে-কোনো একটা বাদ দিতে পারো।'

আধ ঘণ্টা পর নাক বরাবর সামনে রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠলো গ্যালভানাইজড লোহার ছাদ। 'টুটি মিশন,' বললো সোহানা। ল্যাণ্ড করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো সে।

চার্চের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ক্ষুদে লোকজনের হাতনাড়া লক্ষ্য করলো ওরা। সরু, অসমান একটা এয়ারস্ট্রিপ, কিন্তু দক্ষতার সাথে সেসনাকে নামিয়ে আনলো সোহানা। বালি রঙের একটা ল্যাণ্ড রোভার ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়ির পাশে তিনজন থার্ড-ব্রিগেড ট্রুপার, জেনারেল উমাঙ্গোকে স্যালুট করলো তারা, তিন জোড়া বুট থেকে ধুলো উড়লো এক রাশ। সেসনাকে বাঁধার কাজে সোহানাকে সাহায্য করলো রানা, ট্রুপাররা প্লেন থেকে নামিয়ে ব্যাগগুলো তুললো ল্যাণ্ড-রোভারে।

চার্চের পাশেই মিশনের স্কুল, স্কুলের সামনে ল্যাণ্ড-রোভার আসতেই সোহানা জানতে চাইলো, 'কি মনে হয়, জেনারেল? লেডিজ রুম পাওয়া যাবে এখানে?'

স্টিক দিয়ে ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। ল্যাণ্ড-রোভার থামলো। আণ্ডা আণ্ডা চোখ নিয়ে বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা, সোহানা সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে স্কুল মিসট্রেস নিজে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো তাকে। টিচারের বয়স সোহানার চেয়ে বেশি নয়। সরু, লম্বা পা তার; সাধারণ একটা সুতী স্কার্ট পরে আছে। কাপড়চোপড়ে কড়া ভাঁজ, সাদা জুতোয় কোথাও একবিন্দু দাগ নেই। গায়ের চামড়া মখমলের মতো মসৃণ, চাঁদপানা মুখ, হাসিতে মুক্তো ঝরে, চোখে হরিণীর কোমল দৃষ্টি। চোখ ফেরাতে পারলো না রানা, মনে হলো, অপূর্ব!

সোহানাকে নিয়ে স্কুল-ভবনের ভেতরে চলে গেল মেয়েটা।

'পছন্দ হয়?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো জেনারেল। রানা কিছু বলতে গেল, কিন্তু সুযোগ পেলো না। 'ও মিরাণ্ডা। চারটে এ-লেভেল ডিগ্রী আর একটা হাইস্কুল টিচার'স ডিপ্লোমা আছে, সেই সাথে নার্সিঙেও ট্রেনিং নিয়েছে। কুমারী, সুন্দরী, আধুনিকা, কিন্তু একটু সেকেলে। ওর বাবা এখনো ওঝা, শুধু কোমরে এক টুকরো চামড়া পরে থাকে, গোসল করে বছরে একবার। এই হলো আফ্রিকা, রানা,—মাই ওয়াণ্ডারফুল, এণ্ডলেসলি ফ্যাসিনেটিং, এভার-চেঞ্জিং, নেভার-চেঞ্জিং অ্যাফ্রিকা।'

স্কুলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা দুজন, এরই মধ্যে যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে ওরা। বারান্দার সামনে থেমে ছাত্র-ছাত্রীদের ফটো তুললো সোহানা, তাদের কারো কারো বয়স মিরাণ্ডার

চেয়ে কম নয়।

'দেখে মনে হয় ভালো জিনিসের কদর দিতে জানো তুমি,' মিরাণ্ডার দিকে চোখ রেখে বললো রানা। 'যৌতুকের টাকা নেই তোমার, এ আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে অপেক্ষা করছো কেন, রট?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেনারেল রট উমাঙ্গো। 'ও ম্যাটাবেল, আর আমি ম্যাশোনা— সাপে নেউলে সম্পর্ক।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে। 'কোনো আশা নেই।'

ল্যাণ্ড-রোভারে ফিরে এসে মিরাণ্ডার উদ্দেশে হাত নাড়লো সোহানা, উত্তরে মিরাণ্ডাও। ছাত্র-ছাত্রীরা হেঁড়ে গলায় একটা কোরাস গাইতে শুরু করেছে। গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। লালচে ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল স্কুল। 'কালো তা সে যতোই কালো হোক, বাংলায় বললো সোহানা, '...রবীন্দ্রনাথ বোধহয় কল্পনায় এই মেয়েটিকেই দেখেছিলেন।'

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমরা দু'জনই বাংলাদেশ থেকে এসেছো,' সকৌতুকে বললো জেনারেল। সোহানার অজান্তে রানার গায়ে মৃদু একটু ঠেলা দিলো সে, ফিসফিস করে বললো, 'বাতাস উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে। বলেছিলাম না, অনেক সময় অবহেলার পরপরই ভালো...'

হেসে উঠলো রানা।

মেটো রাস্তা, এখানে সেখানে গর্ত, ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি। জঙ্গলের ফাঁক ফোকর দিয়ে উত্তর দিগন্তে নীল পাহাড় দেখা গেল—খাড়া, দুর্গম, বৈরী।

গন্তব্য আর খুব বেশি দূরে নয়, ওখানে পৌঁছে কি দেখবে বলে

আশা করতে পারে ওরা সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলো জেনারেল উমাঙ্গো।

এগুলো পুনর্বাসন কেন্দ্র, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নয়। কয়েদীদের এখানে লেখাপড়া শেখানো হয়, বাস্তব ছুনিয়াকে মেনে নেয়ার সবক দেয়া হয়। দেশটা একটানা এগারো বছর একটা সিভিল ওঅরের ভেতর দিয়ে এসেছে, যুদ্ধটা তরুণ সম্প্রদায়কে নিষ্ঠুর কসাই বানিয়ে ছেড়েছে। যুদ্ধের পর ওদেরকে হয়তো গঠনমূলক কাজে ফিরিয়ে আনা যেতো, কিন্তু কিছু বিপথগামী নেতা ওদেরকেও নিজেদের পথে টেনে নেয়। এই বেঈমান নেতারা যুবক সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে পুঁজি করে মাঠে নামে। ওদের অসন্তুষ্ট হবার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। বলা হয়েছিল দেশ স্বাধীন হলে চারদিকে প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যাবে, কেউ গরীব থাকবে না। দেশে যে সম্পদের অভাব, এটা কেউ বুঝতে চায় না। এই সব প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিল, বিপথগামী নেতারা যুবক সম্প্রদায়কে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। এরা প্রত্যেকে এক একজন দক্ষ গেরিলা, বহু মানুষ খুন করেছে, সুযোগ পেলে আরো বহু মানুষকে খুন করবে। সবশেষে জেনারেল বললো, 'ওদেরকে আমরা মেরে ফেলতে পারি না। আমাদেরই সন্তান ওরা। সেজন্যেই পুনর্বাসন কেন্দ্রে আটকে রেখে সৎ পথে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

রানা লক্ষ্য করলো, উপজাতীয় কোন্দল সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করলো না জেনারেল।

মেটো চৌরাস্তার মোড়ে থামানো হলো ল্যাণ্ড-রোভার, এখানে ওরা লাঞ্চ সারবে। সামনেই দেখা গেল একটা নদী, ছুই পাড়ে মাথা নুইয়ে পড়া দশ ফিট লম্বা ঘাসের পাঁচিল। নদীর ওপর বাঁশের

একটা সাঁকো, নিচে ঠাণ্ডা সবুজ স্বচ্ছ পানি। লাঞ্চে বসে আরো কিছু কথা বললো জেনারেল। যে-কোনো কয়েদীর সাথে কথা বলতে পারবে ওরা। তবে, বিশেষ করে সোহানাকে সাবধান করে দেয়া হলো, কেউ যেন ভুলেও ক্যাম্পের বাইরে না বেরোয়—বাইরে সব সময় ঘুর ঘুর করছে চিতা আর হায়েনা।

আবার রওনা হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে টুটি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে পৌঁছুলো ওরা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'নিরাপদ গ্রাম'-গুলোর একটা ছিলো এটা। গেরিলারা 'শান্তিপ্রিয়' এবং 'নিরপেক্ষ' গ্রামবাসীদের ওপর হামলা চালাতো, তাই স্মিথ সরকার গ্রামগুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পাহাড়ী একটা ঢালের গা থেকে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় সব কেটে সাফ করা হয়েছে। বিশাল আকারের কালচে বোল্ডার ফেলে দুর্গম করে তোলা হয়েছে জায়গাটাকে। বোল্ডারের ওপরে তৈরি করা হয়েছে বালির বস্তা-ঘেরা ক্ষুদে একটা দুর্গ, দুই দেয়ালের মাঝখানে মেশিনগান বসাবার মুখ খোলা টানেল, ফায়ারিং প্ল্যাটফর্ম, কমিউনিকেশন ট্রেঞ্চ, আর ডাগ-আউট। ঢালের নিচে সার সার মাটির তৈরি ঘর, কোনো কোনোটার দেয়াল ছাদ ছোঁয়নি—ওই ঘর-গুলোয় কয়েদীরা থাকে। ঘরগুলো একটা মাঠকে ঘিরে তৈরি করা, মাঠের দু'ধারে একটা করে গোলপোস্ট। মাঠের এক প্রান্তে, দুর্গের কাছাকাছি, সাদা একটা দেয়াল দেখা গেল।

একজোড়া কাঁটাতারের বেড়া গোটা ক্যাম্পকে ঘিরে আছে। কাঁটাতারের জাল খুব ঘন করে বোনা, দশ ফিট করে উঁচু। বেড়ার গা ঘেঁষে বাঁশের মাচা আকৃতির অনেকগুলো ওয়াচ-টাওয়ার, প্রতিটির মাঝখানে বেশ অনেকটা করে দূরত্ব। একটাই গেট। ল্যাণ্ড-রোভার থামতেই তিনজন গার্ড স্যালুট করলো। গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে

প্যারেড গ্রাউণ্ডকে ঘিরে থাকা রাস্তা ধরে এগোলো গাড়ি।

প্রচণ্ড কড়া রোদ মাথায় করে প্রায় তিনশো যুবক মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'এ!' কয়েদীরা সবাই তারস্বরে উচ্চারণ করছে, 'এ!' ওদের কারো কারো বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। ঘরগুলোর কবাটহীন দরজার ভেতর আরো কয়েক শো লোক বসে রয়েছে, কালো ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থেকে সরবে পড়া মুখস্থ করছে তারা। জেনারেল বললো, 'পরে সব ঘুরেফিরে দেখা যাবে। তার আগে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করা যাক।'

ঢালের গায়ে একটা ডাগ-আউট বরাদ্দ করা হলো রানাকে। মাটির মেঝে সদ্য পরিষ্কার করে পানি ছিটানো হয়েছে, যাতে ধুলো না ওড়ে। ঘাস দিয়ে বোনা একটা মাদুর ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে। চটের একটা বস্তা কেটে খাটো পর্দা বানানো হয়েছে। মাদুরের ওপর একটা দিয়াশলাই, আর এক প্যাকেট মোমবাতি। এগুলো সম্ভবত কেবল মর্যাদাসম্পন্ন মেহমানদের জন্যেই বের করা হয়, আন্দাজ করলো রানা।

সামনে একটা ট্রেঞ্চ, ওপারে সোহানার ডাগ-আউট। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে রানা দেখলো, মাদুরের ওপর সোজা হয়ে বসে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করছে সোহানা।

ট্রেঞ্চ ধরে ওপরে, ঢালের মাথায় কমাণ্ড পোস্টে চলে গেল জেনারেল উমাঙ্গো। কয়েক মিনিট পর একটা ইলেকট্রিক জেনারেটর সচল হলো, রেডিওতে 'শোনা' ভাষায় কথা বলছে জেনারেল, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না রানার। আধ ঘণ্টা পর নেমে এসে বললো, 'চলো, কয়েদীদের দেখবে চলো।'

দশটা লাইনে কয়েক শো কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে, রাতের খাবার খেতে দেয়া হয়েছে তাদের। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির গামলা, তাতে সেদ্ধ করা প্রচুর সব্জি আর তরকারি। অপর হাতে বড় আকারের কয়েকটা করে রুটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাচ্ছে সবাই, কোনো দিকে কারো খেয়াল নেই। ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে এলো তিনজনের দলটা, কিন্তু কেউ ভুলেও মুখ তুলে তাকালো না। কেউ রুগ্ন বা অসুস্থ নয়, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ফুলে উঠেছে পেশী, কারো শরীরে মেদ জমেনি। আহত কয়েকজন কয়েদীকে দেখলো ওরা। কারণ জানতে চাইলে শোনা ভাষায় উত্তর এলো, অথচ কয়েদীরা সবাই ম্যাটাবেল। 'ওরা বলছে,' ইংরেজীতে বললো জেনারেল, 'নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আহত হয়েছে ওরা।'

সন্ধ্যে হয়ে আসতে প্যারেড গ্রাউণ্ড পেরিয়ে সাদা পাঁচিলটাকে পাশ কাটালো ওরা। জেনারেল বললো, 'কাল সকালে ঘুরে ফিরে সব দেখা যাবে। পরশু ভোরে রওনা হবো আমরা।'

মেসে শোনা অফিসারদের সাথে খেতে বসলো ওরা। সেই একই খাবার, শুধু রুটির রঙ সাদা, গামলার বদলে চীনা মাটির প্লেট আর চামচ দেয়া হলো। 'ছোটো বড় ভেদ নেই,' জেনারেল বললো, 'সবাই এখানে একই খাবার খায়। হপ্তায় একদিন মাংস।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার প্রায় পরপরই অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে গেল জেনারেল, ডাগ-আউটে রানা আর সোহানাকে একা রেখে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে সোহানা, ঠোঁটে একটা আঙুল তুলে নিষেধ করলো রানা। কাছেপিঠে কাউকে দেখা না গেলেও, বদ্ধ একটা জায়গায় গোপন কোনো কথা না বলাই ভালো। ইঙ্গিত পেয়ে রানার পিছু পিছু ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে

এলো সোহানা।

মেইন ট্রেঞ্চে, ফায়ারিং প্ল্যাটফর্মে চলে এলো ওরা। বালির বস্তার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো রানা। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বস্তাগুলোর ওপর উঠে বসলো সোহানা, নিচের আধো অন্ধকার প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। পাহাড়ের মাথায় মস্ত থালার মতো চাঁদ উঠেছে। রানা উপলব্ধি করলো, শুধু সোহানার শারীরিক উপস্থিতিই তার মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি এনে দেয়।

'আমাকে নাহয় বিশ্ব-ব্যাংক একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছে,' জিজ্ঞেস করলো ও, 'কিন্তু তোমাকে?'

'আমাকে পাঠিয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট। একই কাজ নিয়ে এসেছি আমরা।'

'মাস্টার পোচারকে খুঁজে বের করা, আর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে কিনা খবর নেয়া...'

সোহানা এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে দেখে চুপ করে গেল রানা। 'উঁহুঁ, কাজ শুধু এই দুটোই নয়,' বললো সোহানা। 'আরো আছে। বসের নির্দেশ, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে দেখলে তার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে আমাদের।'

'কারণ?'

'কারণ, বসের ধারণা, এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে শুধু গোটা একটা উপজাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যু ঘটার কোনো আলামত এ কয়দিনে দেখতে পেয়েছো?'

'এখনো কিছু দেখছি না,' বললো সোহানা। 'তবে বাতাসে নানান গুজব। আমাদের জানতে হবে সেনাবাহিনীতে কি ঘটছে। তা

জানতে হলে জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে সম্পর্কটা নষ্ট করা চলবে না। খবর পাবার সে-ই একমাত্র সোর্স আমাদের। নিজে থেকে কোনো তথ্য দেবে বলে মনে হয় না, কৌশলে যদি কিছু আদায় করা যায়।'

'তুমি তো আমার আগে এসেছো,' বললো রানা, 'মাস্টার পোচার সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?'

'অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছি,' বললো সোহানা। 'তাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা করতে যাবো আমি। আশা করছি দিন কয়েকের মধ্যে দু'একটা সূত্র পেয়ে যাবো।'

'আমি তাহলে কোত্থেকে শুরু করবো?'

'তোমার অ্যাকশন শুরু হবে মাস্টার পোচারের পরিচয় জানার পর, আর সামরিক অভ্যুত্থানের লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে উঠলে,' বললো সোহানা। 'যে-কদিন আমাকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়, তোমার কাজ হবে বিশ্রাম নেয়া, আর জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে যোগাযোগ রাখা।'

'সময় কাটাবার মতো একটা ঝামেলা অবশ্য এরই মধ্যে ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো সোহানা। সংক্ষেপে রুবেনসনের গল্পটা তাকে শোনালো রানা। সবশেষে বললো, 'ভদ্রলোক এমন-ভাবে ধরলেন ...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ও।

আবছা অন্ধকারে সোহানার ঠোঁটের হাসিটুকু দেখতে পেলো না রানা। সাউল র‍্যাঙ্কিং সম্পর্কে রানারও যে যথেষ্ট আগ্রহ আর দরদ আছে, এটুকু সে উপলব্ধি করতে পারলো। রেবেকার একটা স্মৃতি, রানা সেটা নষ্ট হতে দিতে চায় না। মনে মনে ঠিক করলো, দরকার

হলে রানাকে এই কাজে সাহায্য করবে ও। আগের প্রসঙ্গে ফিরে এসে বললো, 'বসের আরো একটা নির্দেশ আছে। তিনি বলেছেন, হীরেগুলো যেন এ-দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।'

'হীরে!'

'হ্যাঁ,' বললো সোহানা। 'জিম্বাবুইয়ে কোথায় নাকি প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের হীরে আছে। বস গোপন সূত্রে জানতে পেরেছেন, একটি সুপার পাওয়ার সামরিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করার বিনিময়ে এই হীরে হাত করতে চাইছে।

'কতো বললে?' রানার মনে হলো ভুল শুনেছে।

'প্রায় পাঁচ শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওগুলো সাধারণ কোনো হীরে নয়, রানা।'

'মাই গড!' একটা ঢোক গিললো রানা। তারপর বললো, 'অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি যেন!'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে, আঁচ করতে পারো?'

'বই-পত্র পড়ছি, লোকজনকে জিজ্ঞেস করছি,' বললো সোহানা। 'খোঁজ ঠিকই পাবো।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে। 'তোমার সাথে নতুন পরিচয় হয়েছে, বেশিক্ষণ একসাথে থাকলে জেনারেল সন্দেহ করবে। আমি চলি।' নিজের ডাগ-আউটের দিকে চলে গেল সে।

খানিক পর রানাও ফিরে এলো। নিজের ডাগ-আউটে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো একবার। সোহানার ডাগ-আউটে পর্দা ঝুলছে, ভেতরটা অন্ধকার।

মোমবাতি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালো রানা। কেন যেন ঘুম নেই চোখে। হোল্ড-অল টেনে নিয়ে ভেতর থেকে নোট-বুক আর

বল পয়েন্ট কলম বের করলো। কাগজের কোণায় পেনের শিষ ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো ও, তারপর শুরু করলো।

লিখেই চলেছে রানা। শুধু নতুন মোমবাতি জ্বালার জন্যে থামলো ও, খেয়াল নেই মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে কখন। নোটবুকের আর মাত্র কয়েকটা পাতা খালি, এই সময় নিঃশব্দ পায়ে পর্দার সামনে এসে দাঁড়ালো কেউ, পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রানার। পা টিপে ডাগ-আউটের ভেতর ঢুকে পড়লো সোহানা। ছোঁ দিয়ে রানার হাত থেকে কলম আর নোটবুক কেড়ে নিলো সে। 'রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে, সেদিকে খেয়াল নেই, না? শোও, শুয়ে পড়ো···'

'আহা, লাইনটা শেষ করতে দাও···' সোহানার হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রানা।

কিন্তু সোহানা দেবে না। ধস্তাধস্তি শুরু হতে, হঠাৎ পড়ে গিয়ে নিভে গেল মোমবাতি। তারপর...

তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

'ওই গানটা আমাকে একদিন শোনাবে?' অনেকক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে বললো সোহানা। 'ওই যে, লুবনা তোমাকে যে ক্যাসেটটা দিয়েছিল।'

'শোনাবো।' মৃদু হাসলো রানা। 'আমার মৃত্যু-সংবাদ যখন ঢাকায় পৌঁছলো—কেমন লেগেছিল তোমাদের? কেঁদেছিলে?'

'উঁহু'। অনেকে কেঁদেছে, কিন্তু আমি না।' একটু চুপ করে থেকে বললো, 'সবাই যখন হাওয়া-বাতাস করে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো, ততক্ষণে রোম থেকে বুড়োর মেসেজ এসে গেছে। চোখ মেলেই দেখি দুই কান পর্যন্ত লম্বা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল ভাই আর জাহেদ শালা। আচ্ছা···তোমাকে কবর দেয়ার প্ল্যানটা কার?'

'বুড়োর। নইলে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঢাকায় ফিরতে পারছিল না। কর্ণেল গুগলিকে বুঝিয়েছে, রানা এখন 'সিটিং ডাক' যে-কোনো দিক থেকে গুলি আসতে পারে মাফিয়া, সিআইএ বা জিওনিস্ট ইণ্টেলিজেন্সের। রানার মৃত্যু সংবাদ পেলেই কেবল থামবে ওরা, রানা সময় পাবে সুস্থ হয়ে ওঠার।'

'যাই বলো, প্ল্যানটা কিন্তু দারুণ ছিলো।'

'হ্যাঁ। বুড়োটা সত্যিই ভালোবাসে আমাদের।... কিন্তু এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে হতো না? ঘুম পাড়াতে এসে এখন বকিয়ে মারছো দেখছি!'

সকালে লাল টকটকে চোখ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলো রানা। কিন্তু কানায় কানায় ভরে আছে মন। ব্রেকফাস্টের পর র‍্যাঞ্চ নিয়ে অনেক কথা বললো সোহানাকে। তেমন কোনো মন্তব্য করলো না সোহানা, কিন্তু মন দিয়ে শুনলো কথাগুলো। রানা যে সিরিয়াস, এটুকু সে বুঝেছে। কয়েদীদের দেখতে বেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রানাকে একা পেয়ে শুধু বললো, 'দেখো শেষপর্যন্ত কি হয়। বিপদ কোন দিক থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না।'

রানারও তাই মনে হচ্ছে। কোথায় কি যেন একটা পাকিয়ে উঠছে, কিন্তু সেটা যে কী, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবু, কিছু ঘটার আশংকায় তো আর সব কাজ ফেলে রাখা যায় না।

প্রায় সাত শো কয়েদী রয়েছে টুটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে। এগারো বছর আগে এদের বেশিরভাগেরই বয়স ছিলো চোদ্দ কি পনেরো। স্কুল ছেড়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে। গোটা জাতিকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল,

শ্বেতাঙ্গরা বিদায় হলে দেশের লোক-সবাই ধনী হয়ে যাবে ; তারাই হবে খামার, খনি, আর সমস্ত ব্যবসার মালিক। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। স্বাধীনতার সুফল প্রধান একটা উপজাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, ম্যাটাবেল আর অন্যান্য উপজাতির লোকেদের অবস্থা আগের চেয়ে আরো খারাপ হয়েছে। কাজেই তারা আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলে, সামনে যাকে পায় তাকেই খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাদেরই কিছু লোককে ধরে এনে রাখা হয়েছে এ-ধরনের ক্যাম্পগুলোয়।

ফেরার পথে জেনারেলকে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে এরা সবাই ম্যাটাবেল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'এক ক্যাম্পে দুই উপজাতির লোক রাখি না আমরা—রাখলে খুনোখুনি লেগেই থাকবে।'

'শোনা কয়েদী? আছে?'

'আছে বৈকি,' মৃদু হেসে রানাকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল। 'ওদেরকে রাখা হয়েছে ইস্টার্ণ হাইল্যাণ্ডের একটা ক্যাম্পে—সেখানেও এই একই পরিবেশ।'

দিনের বাকি সময়টা রাতের লেখাগুলো সংশোধন করে কাটালো রানা।

সূর্যাস্তের পরপরই জেনারেটর চালু হলো, রেডিওতে কথা বললো জেনারেল উমাঙ্গো। বিশ মিনিট পর রানার ডাগ-আডটে হাজির হলো সে। 'তোমার মেসেজ, রানা। নিউইয়র্ক থেকে, ভায়া ফ্রেঞ্চ এমব্যাসি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানা। মন্টিপিলারকে বলা ছিলো,

জাসটিন চ্যাপেলের মেসেজ পাওয়া মাত্র তার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেসেজটা একটা কাগজে লিখে এনেছে জেনারেল। সেটা নিয়ে পড়তে শুরু করলো রানা। 'মাসুদ রানার জন্যে। আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে আমার উৎসাহে সহকর্মীরা কেউ সাড়া দেয়নি। আপনি যে বইটা লিখবেন, সেটা লেখা শেষ না হলে অ্যাডভান্স দেয়া সম্ভব নয়। এখানে আমাদের লোন কমিটি বলছে উপযুক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া ফাণ্ড দেয়া যাবে না। দুঃখিত। শুভেচ্ছা নেবেন, জাসটিন চ্যাপেল।'

মেসেজটা আবার পড়তে শুরু করলো রানা, এবার ধীরে ধীরে।

'আমার নাক গলানো উচিত নয়,' বিড়বিড় করে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, 'তবু জিজ্ঞেস করি, এটা বোধহয় তোমার শিকারিরা এস্টেট সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার?'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। 'ওরা টাকা দিতে রাজি নয়।'

'চ্যাপেল?'

'একজন বন্ধু, ব্যাংকার—আমি বোধহয় ভদ্রলোকের ওপর খুব বেশি ভরসা করেছিলাম।'

আজ রাতেও ভালো ঘুমাতে পারলো না রানা। মাদুরটাকে লোহার মতো শক্ত মনে হলো, জঙ্গল থেকে ভেসে আসা হায়েনার হাসি শুনে মনে হলো তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।

সকালে উঠেই রওনা হয়ে গেল ওরা। পথে জেনারেল আর সোহানা গল্পে মেতে উঠলেও, রানা বিশেষ কথা বললো না। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ওরাও কেউ ওকে বিরক্ত করলো না।

মিরাণ্ডার সাথে আরেকবার দেখা করার বায়না ধরলো সোহানা, মেয়েটিকে তার খুব ভালো লেগে গেছে, কাজেই টুটি মিশন সেন্টারে

থামাতে হলো ল্যাণ্ড-রোভার। এইবার তৈরি ছিলো মিরাণ্ডা, অতিথিদের চা খাবার অনুরোধ করতে পারলো। গল্প-গুজবে মন নেই রানার, সবার কাছ থেকে দূরে বারান্দার একধারে একটা চেয়ারে একা বসে থাকলো সে। খানিক পর একটা ট্রে হাতে নিয়ে তার কাছে এলো মিরাণ্ডা। ট্রে থেকে চায়ের কাপ তুলতে যাবে রানা, মিরাণ্ডা সিনডেবেল ভাষায় নিচু গলায় বললো, 'চিতা যখন শিকার করে, অন্ধকারেই করে।'

চমকে উঠে মিরাণ্ডার মুখের দিকে তাকালো রানা। দেখলো, হরিণীর কোমল চোখ নয়, দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে।

'টুটি পুনর্বাসন ক্যাম্পে যা ঘটে আপনি তার কিছুই দেখেননি,' আবার বিড়বিড় করে বললো মিরাণ্ডা। 'উমাঙ্গোর পোষা চিতা আর হায়েনারা ম্যাটাবেল কয়েদীদের খেয়ে ফেলছে। আমার কাছ থেকে একটা অ্যাডভাইস নিন, মিঃ অ্যাডভাইজার, মেয়েটাকে নিয়ে এ-দেশ ছেড়ে পালান...'

অবাক হয়ে গেল রানা। শিজারিরার জঙ্গলে মেজর কুকি ওকে মিঃ অ্যাডভাইজার বলে সম্বোধন করেছিল, এই মেয়েটা তা জানলো কিভাবে? জেনারেল উমাঙ্গোর ওপর রেগে আছে ও, কারণটা কি? ওদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে বলছে কেন? ও কিছু বলার আগেই হঠাৎ করে উদয় হলো জেনারেল উমাঙ্গো। দ্রুত মুখ নিচু করে নিলো মিরাণ্ডা, চায়ের কাপটা চেয়ারের হাতলে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কাঁধ ঝাঁকালো জেনারেল।

মিশন সেণ্টার থেকে এয়ারস্ট্রিপ কাছেই, পথে রানার কাঁধে হাত রাখলো জেনারেল। বললো, 'এখান থেকে তোমার শিজারিরা

এস্টেট মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। ফেরার পথে একটু ঘুরে জায়গাটা দেখে যেতে পারি আমরা।'

'কি লাভ।' মাথা নাড়লো রানা।

'কি লাভ মানে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

মেসেজ লেখা কাগজটা পকেট থেকে বের করে সোহানার হাতে ধরিয়ে দিলো রানা।

মেসেজটা পড়া শেষ করে মুখ তুললো সোহানা। 'আমি দুঃখিত, রানা,' শুকনো গলায় বললো সে।

'তবু জায়গাটা আমি একবার দেখতে চাই,' জেনারেল বললো। 'বলা যায় না, আমার পছন্দ হয়ে যেতে পারে।'

ঝট্ করে জেনারেলের দিকে ফিরলো রানা।

হেসে ফেললো জেনারেল। 'আরে না, তোমার শখের জিনিসে আমি হাত দেবো না। তবে, আমার যদি পছন্দ হয়, কেনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিনা দেখবো।'

সোহানাও একটু উৎসাহ দেখালো। 'চলোই না, দেখি জায়গাটা কেমন।' এরপর আর আপত্তি করলো না রানা।

সেসনায় উঠে সোহানা ম্যাপ বের করলো, শিজারিরা নদীর একটা অংশ তাকে দেখিয়ে রানা বললো, 'এখানে।'

বাতাসের গতি, ইত্যাদি চেক করে সোহানা বললো, 'কিছু না, পঁচিশ মিনিটের পথ।'

মিরাণ্ডা, একজন স্কুল মিসট্রেস—ভাবছে রানা—বিদ্রোহী গেরিলাদের সাথে নিশ্চয়ই তার যোগাযোগ আছে। চিতা যখন শিকার করে, অন্ধকারেই করে, এই কথাটার মানে কি? উমাঙ্গোর হায়েনা মানে? ম্যাটাবেল কয়েদীদের যারা পাহারা দিয়ে রেখেছে,

ম্যাশোনারা ?

প্রথমে জেনারেল টস মাজুলেট, তারপর মিরাণ্ডা, দু জনেই চাইছে জিম্বাবুই থেকে চলে যাক ও। কিন্তু কেন ?

'এটাই শিজারিরা নদী,' বললো সোহানা। বাঁক নিতে শুরু করে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো সেসনা। নদীর পাড় ধরে উড়ে গেল প্লেন, বনভূমি এদিকে খুব গভীর হলেও দু'একটা বুনো প্রাণীকে ছুটে পালাতে দেখলো ওরা। এক পাল শিংওয়ালা হরিণকে তাড়া করলো সোহানা। পাহাড়ের ঢালে একটা কালো গণ্ডার দেখা গেল, সাথে একটা বাচ্চা। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো সোহানা, 'দেখো, ওদিকে দেখো!' কিছু না, সবুজ ঘাস মোড়া একটা মাঠ দেখতে পেয়েছে সে। মাঠে এক পাল জেব্রা চরছে। 'প্লেন আমি ওখানে অনায়াসে ল্যাণ্ড করাতে পারি।' বলে কারো অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো সে।

মাঠের ওপর দিয়ে চারবার উড়ে গেল সোহানা, প্রতিবার আরো নিচে দিয়ে। জেব্রাগুলোর পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা। 'একেবারে সমতল, মাটিও শক্ত,' বললো সোহানা। পাঁচ বারের বার ল্যাণ্ড করলো সে, দেড়শো গজের মতো ছুটে দাঁড়িয়ে পড়লো সেসনা।

'বার্ড লেডি,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো জেনারেল।

মাঠ পেরিয়ে সবুজ পাঁচিলের দিকে এগোলো ওরা। একটা গেইম ট্রেইল ধরে জঙ্গলে ঢুকলো। ট্রেইলটা অনেক লম্বা, শেষ মাথায় নদীর ওপর একটা ঝুলে থাকা পাথর।

পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো ওরা। সাদা বালি

মোড়া নদীর পাড়, সরীসৃপের খুলির মতো চকচকে পানিতে ধোয়া পাথর। নদীর ওপর নুয়ে পড়া ডালে পাখির বাসা, স্বচ্ছ সবুজ নদীর পানিতে ঝাঁক বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙিন মাছ, পাড়ের প্রতিটি গাছের শিকড় পাথরের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে নেমে গেছে পানিতে, নদীর ওপারে আবার জঙ্গল।

'অপূর্ব!' মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলো সোহানা। ক্যামেরা নিয়ে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে সে।

'এখানেও তোমার একটা ক্যাম্প হতে পারে,' জেনারেল উমাঙ্গো বললো, আঙুল দিয়ে ওদের নিচে হাতির পায়ের দাগ দেখালো রানাকে। 'কনসরটিয়াম খুব কম দামই চেয়েছে। বছরে তুমি এখান থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারবে, রানা।'

'বাদ দাও,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

'পাগল নাকি!' বিস্মিত দেখালো জেনারেলকে। 'এই জায়গা কেউ হাতছাড়া করে!' এক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলো সে, তারপর আবার বললো, 'শোনো, রানা। ব্যাংক গ্যারান্টি দরকার তোমার, এই তো? যাও, সে ব্যবস্থা আমি করবো।' আড়ষ্ট একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'কিন্তু কমিশন হিসেবে কোম্পানীর খানিকটা শেয়ার কিন্তু আমাকে দিতে হবে।'

হতাশার মধ্যে আলোর একটু আভাস পেলো রানা। তাড়াতাড়ি বললো, 'ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারো, তাহলে তো সেটা তোমার পাওনাই হবে।'

ছবি তোলা শেষ করে সোহানা বললো, 'হারারে আড়াই ঘণ্টার পথ, চলো, রওনা হওয়া যাক।'

নিউ সারাম এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছে ওদের দু'জনের সাথে করমর্দন করলো জেনারেল উমাঙ্গো। সোহানাকে বললো, 'আশা করি আপনার ছবিগুলো ভালো উঠেছে।' তারপর রানার দিকে ফিরলো। 'তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবো তোমার সাথে।' একটা আর্মি জীপ অপেক্ষা করছিল, তাতে উঠে চলে গেল সে।

গভর্ণমেণ্ট হাউসের উল্টো দিকে একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করেছে সোহানা. ফোক্সওয়াগেন থামাতে বললো সে। রানার হাতে হাত রেখে চাপ দিলো একটু, তারপর নেমে পড়লো। 'প্লেন নিয়ে হাইল্যাণ্ডে যাচ্ছি আমি,' বললো সে, 'কাল খুব ভোরে। কবে ফিরবো জানি না। ফিরে এসে হিলটনে খবর নেবো আমি, কেমন?'

সোহানা ওকে অ্যাপার্টমেণ্টে যেতে বললো না দেখে একটু অবাক হলো রানা। জানতে চাইলো, 'তোমার ধারণা, কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে?'

'বিচিত্র কি।'

'হুম! সাবধানে থেকো,' বলে গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

হোটেলে ঢোকার মুখে রানার সামনে দাঁড়ালো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। লোকটাকে হাত কচলাতে দেখে রানা আন্দাজ করলো, দুঃসংবাদ আছে। লোকটা ওকে নিজের অফিসে নিয়ে এসে সবিনয়ে বললো, 'মিঃ রানা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে লোক এসেছিল, ওরা আপনার কামরা সার্চ করেছে। আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু ওরা আমার '

'আমার কামরা সার্চ করেছে? কোন্ অধিকারে?'

'অধিকারের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই,' বললো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট

ম্যানেজার। 'ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। আমি, স্যার…'

তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় উঠে এসে নিজের জিনিস-পত্র চেক করলো রানা। ট্রাভেলার্স চেকগুলো গুণলো ও, ঠিকই আছে। প্লেনের রিটার্ণ টিকিটও নিয়ে যায়নি। না, কিছুই নেয়নি ওরা।

'এ-ধরনের সার্চ কার হুকুমে করা হয়, সাধারণত?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই এসেছিল, তারমানে খুবই ওপর মহল থেকে নির্দেশ পেয়ে…'

টস মাজুলেট, মনে মনে বললো রানা, শালা সত্যি তুমি বদলে গেছো তাহলে।

পরদিন টুটি রিহ্যাবিলিটেশন সেণ্টারের ওপর একটা রিপোর্ট লিখে ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে পৌঁছে দিলো রানা। সাউল র‍্যাঞ্চিং কোম্পানী কেনার জন্যে সরকারী অনুমতি চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটা আবেদন-পত্র জমা দিলো ও। তারপর কয়েকদিন হোটেল ছেড়ে বড় একটা বেরুলো না. বই লেখার কাজে ব্যস্ত রাখলো নিজেকে। শুধু সন্ধ্যের দিকে সোহানার অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে থেকে একবার করে ঘুরে এলো, কিন্তু জানালা বন্ধ দেখে মন খারাপ করে ফিরতে হলো ওকে।

জেনারেল উমাঙ্গো তার কথা রাখেনি, তিন দিন পেরিয়ে গেল, অথচ কোনো যোগাযোগ করেনি সে। কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলো রানা। জেনারেল টস মাজুলেট তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে, নিজের প্রভাব খাটিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া রানার আবেদন-পত্র প্রত্যাখ্যান করাতে সফল হয়েছে সে। কৃষি মন্ত্রী জেনারেল

উমাঙ্গোর ভগ্নীপতি হোক আর যাই হোক, সুবিধে করতে পারেনি সে। জেনারেল মাজুলেট যেখানে জড়িত, সুবিধে করতে পারার কথাও নয়। মাজুলেট মন্ত্রীসভায় একমাত্র ম্যাটাবেল সদস্য হলেও, তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস বা স্পর্ধা কারো নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অবিশ্বাস্য বীরত্ব দেখিয়ে এই লোক খ্যাতির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, দেশের মানুষ তাকে পুজো করতে শুরু করে

এই ক'দিন বার কয়েক ফোন করেছে মন্টিপিলার, ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রানাকে। প্রতিবার এড়িয়ে গেছে রানা। চারদিনের দিন, হঠাৎ করে জেনারেল উমাঙ্গোর ফোন এলো। 'রানা, আজ বিকেলে আমার সাথে দেখা করতে পারো? তিনটের সময়? ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে আসবে।'

বাড়িটা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে একটা পাহাড়ের ওপর, নিচের শান্ত লেকে গোটা বাড়ির প্রতিবিম্ব স্থির হয়ে আছে। থার্ড ব্রিগেডের পুরোদস্তুর ব্যাটল-ড্রেস পরা একজন বডিগার্ড গেটে দাঁড় করিয়ে রানা আর ড্রাইভারকে তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো। পথ দেখিয়ে বাড়ির সামনের অংশে নিয়ে আসা হলো ওকে। ধাপ বেয়ে উঠছে ও, দেখলো সিঁড়ির মাথায় ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল উমাঙ্গো। তার মুখে সাফল্যের হাসি, রানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সামনের একটা কামরায় ঢুকলো সে। দামী সোফায় অপরিচিত কয়েকজন লোককে বসে থাকতে দেখলো রানা।

'রানা, এসো, তোমার সাথে ভদ্রলোকদের পরিচয় করিয়ে দিই,' বললো জেনারেল। 'মিঃ নেবুবি, ল্যাণ্ড ব্যাংক অভ জিম্বাবুয়ের গভর্ণর। ইনি মিঃ হিকলি, গভর্ণরের অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর ইনি আমার অ্যাটর্ণি, মিঃ রামগোপাল। জেন্টেলমেন, ইন মিঃ মাসুদ রানা,

প্রখ্যাত সাংবাদিক।'

সবার সাথে করমর্দন করলো রানা। 'ড্রিঙ্ক, রানা?' জানতে চাইলো জেনারেল। 'আমরা সবাই স্কচ হুইস্কি খাচ্ছি।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো রানা।

'তাহলে কফি, কেমন?' জেনারেলের ইঙ্গিতে একজন উর্দি পরা বেয়ারা কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সাথে সাথেই কফি নিয়ে এলো। রানার পাশের সোফায় বসলো জেনারেল। একটা চুরুট ধরালো সে. আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'প্রথম খবর, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্বিতীয় খবর, বিশ্ব ব্যাংক তোমাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ধার দেয়ার জন্যে যতো বড় অংকের ব্যাংক গ্যারান্টি দাবি করুক, ল্যাণ্ড ব্যাংক অভ জিম্বাবুই তা দিতে রাজি হয়েছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

'তোমার সাথে বিশ্ব ব্যাংকের সম্পর্ক গোপন কোনো ব্যাপার নয়, রানা,' আবার বললো জেনারেল। 'জাসটিন চ্যাপেলকে আমরা ভালো করে চিনি।' হাসলো সে। 'অবশ্যই, ব্যাংক গ্যারান্টি পাবার জন্যে কিছু শর্ত থাকবে, কিন্তু সেগুলো ফরমালিটিজ মাত্র।' অ্যাটর্নি রামগোপালের দিকে ফিরলো সে। 'গোপাল, কাগজ-পত্র সব তৈরি তো? মিঃ রানাকে একটা কপি দাও, তারপর সব আমাদের পড়ে শোনাও একবার।'

রামগোপাল তার বাই ফোকাল চশমা ভালো করে নাকে বসিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, 'এটা একটা ল্যাণ্ড পারচেজ অ্যাপ্রুভ্যাল। অথরিটি ফর মাসুদ রানা, এ বাংলাদেশী সাবজেক্ট…।'

একটা শেষ করে আরেকটা ডকুমেণ্ট পড়ছে রামগোপাল, সবই

গৎ বাঁধা, সেদিকে তেমন খেয়াল নেই রানার। রুবেনসনের স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে দেখে ভারি খুশি সে। মনে মনে বললো, টস মাজুলেট, তুমি হেরে গেছো।

এতো উত্তেজনার মধ্যেও হঠাৎ একটা কথা কানে আসতে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। 'তারমানে? এনিমি অভ দি স্টেট অ্যাণ্ড দি পিপল অভ জিম্বাবুই, এ-সব কি?'

'আমাদের সমস্ত ডকুমেণ্টে থাকে এটা,' রামগোপাল আশ্বস্ত করলো ওকে। 'একটা গৎ আর কি। ল্যাণ্ড ব্যাংক একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান, খাতক যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে, কিংবা তাকে যদি রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়, ল্যাণ্ড ব্যাংক তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।'

'সেটা কি লিগ্যাল?' সন্দিহান দেখালো রানাকে। এ-ব্যাপারেও অ্যাটর্ণি ওকে আশ্বস্ত করলো। এবার রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক কি এই শর্তের ওপর লোন দিতে রাজি হবে?'

'ওদের সাথে আরো লোকের আরো অনেক চুক্তি হয়েছে, সবগুলোতে এই শর্ত ছিলো,' ব্যাংকের গভর্ণর বললেন। 'ওরাও জানে এটা একটা ফরমালিটি মাত্র।'

'আহা, রানা,' হাসতে হাসতে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, 'তুমি তো আর সরকার উৎখাতের জন্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছো না।'

জোর করে একটু হেসে রানা বললো, 'ঠিক আছে। বিশ্ব ব্যাংক যদি আপত্তি না তোলে, আমারও কিছু বলার নেই।'

পড়া শেষ হতে এক ঘণ্টার মতো লাগলো। একে একে সবগুলো কপিতে সই করলেন গভর্ণর নেবুবি, তাঁকে সই করতে দেখার সাক্ষী

হিসেবে জেনারেল উমাঙ্গো আর তার অ্যাটর্ণিও সই করলো। এর-পর রানার, আর রানাকে যারা সই করতে দেখলো তাদের পালা। সবশেষে প্রত্যেকে আবার শপথনামায় সই করলো।

'শুভ কাজ সম্পন্ন হলো—সাইনড, সীলড, অ্যাণ্ড ডেলিভারড,' বললো রামগোপাল।

'তোমাকে বলেছি, রানা?' মিটি মিটি হাসি দেখা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর মুখে। 'গভর্ণর নেবুবি চ্যাপেলের সাথে কাল নিউইয়র্ক সময় দশটায় কথা বলেছেন। ব্যাংক গ্যারান্টি তাঁর হাতে পৌঁছুবার সাথে সাথে তোমার নামে টাকা বরাদ্দ করা হবে।'

আরেক দফা হুইস্কি খাওয়ার পর বিদায় নিলেন গভর্ণর নেবুবি। সহকারীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে যাবার পর জেনারেল উমাঙ্গো রানাকে বললো, 'এবার আমার ফি নিয়ে আলোচনা হবে। রাম-গোপাল কাগজ-পত্র সব তৈরি করে রেখেছে।'

কাগজগুলো পড়তে পড়তে রানার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'পঁচিশ পার্সেন্ট!' অবিশ্বাসের সাথে বললো ও। 'সাউল ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার!'

'নামটা নিশ্চই তুমি বদলাতে চাইবে, রানা?' রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি জেনারেল। হঠাৎ ভুরু কোঁচকালো সে। 'আরেকটা কথা, আমার নমিনি হিসেবে রামগোপাল শেয়ারগুলো হোল্ড করবে। আমি একজন সরকারী কর্মচারী, বোঝোই তো, আমার নামে প্রকাশ্যে সম্পত্তি থাকলে পরে নানান কথা উঠতে পারে।'

চুক্তিপত্রটা আবার পড়ার ভান করলো রানা, কিভাবে আপত্তি জানাবে ভাবছে। ওরা দু'জন নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে ওকে। পঁচিশ পার্সেন্ট মানে স্রেফ ডাকাতি, কিন্তু এ-ছাড়া রানার উপায়ই বা কি?

ধীরে ধীরে কলমের ক্যাপ খুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো রামগোপাল। 'জেনারেল উমাঙ্গো স্লিপিং পার্টনার হিসেবে থাকছেন,' শান্ত স্বরে বললো সে। 'একজন জেনারেলকে পার্টনার হিসেবে পেলে আপনার এই ব্যবসা দিনে দিনে ফেঁপে উঠবে, মিঃ রানা।'

'কপি এই একটাই,' হাসতে হাসতে বললো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমার কাছে থাকবে।' মাথা ঝাঁকালো রানা।

তারমানে উমাঙ্গোর কাছেই শুধু প্রমাণ থাকবে। কিছু এসে যায় না। এই র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী মিঃ রুবেনসনের দরকার। তিনি জানিয়ে গেছেন, কাউকে অর্ধেক শেয়ার দিতে হলেও তাঁর আপত্তি নেই। রামগোপালের হাত থেকে কলমটা নিয়ে সই করে দিলো রানা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস চাপলো জেনারেল।

'ডিক্রু, কংগ্রাচুলেশন্স! এই মাত্র পঁচিশ হাজার ডলার কমিশন পেয়েছো তুমি!'

কালিচরণ ডিক্রু হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। 'তারমানে কনসরটিয়ামের অফার আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন।'

'অবশ্যই।' ডিক্রুর বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে রাস্তায় বেরিয়ে এলো রানা। একটা ট্যাক্সি নিলো, হোটেলে ফিরবে। ফিরবে সোহানার হোটেলের সামনে দিয়ে।

জানালা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। ড্রাইভারের কাঁধে টোকার বদলে রীতিমতো থাবড়া মেরে বসলো রানা। ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সি থামিয়ে দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করলো ড্রাইভার, কিন্তু পেলো তারও বেশি।

'কে?' সোহানার গলা অস্পষ্ট শোনালো।

'আমি, রানা।'

'দরজা খোলা আছে।'

ভেতরে ঢুকে ঘরে কাউকে দেখলো না রানা। 'একটা সুখবর আছে।'

ডার্করুম থেকে জবাব দিলো সোহানা, 'পাঁচ মিনিট সবুর করো। কফি বানাতে ভুলে যাওনি তো?'

সাত মিনিট পর বেরুলো সোহানা। নরম, মোটা সুতো দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে বোনা একটা জার্সি আর শর্টস পরে আছে, মাথার চুল আলগা হয়ে রয়েছে কাঁধের ওপর। ঠোঁটের ওপর-নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রানার চোখে পলক পড়ছে না টের পেয়ে লালচে হয়ে উঠলো চেহারা। 'সুখবর কিনা জানি না, তবে তোমাকেও আমার একটা খবর দেয়ার আছে। আগে তোমারটা শোনা যাক।'

'মিঃ রুবেনসনের কপাল ভালো,' সোহানার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললো রানা, 'সাউল র‍্যাঞ্চিং কিনতে পারবো।'

রানা শান্তভাবে কথা বললেও, ওর চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা টের পেলো সোহানা। 'সব খুলে বলো দেখি।'

'আর কোনো বাধা নেই,' বললো রানা। 'কেনার অনুমতি পেয়েছি, ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা হয়েছে...'

'আচ্ছা!' রানার খুশিতে খুশি হয়ে উঠলো সোহানা। মেয়েটার প্রতি রানার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা উপলব্ধি করে রানার প্রতি তার আকর্ষণ যেন বেড়ে গেল। 'সত্যি, দারুণ একটা খবর। এখন এই সম্পত্তি নিয়ে তুমি কি করতে চাও বলো দেখি।'

দক্ষিণের র‍্যাঞ্চ দুটো, আর শিজারিরা এস্টেটের টুরিস্ট'স স্পট কিভাবে তৈরি করা হবে, সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো রানা। মাঝপথে

ওকে থামিয়ে দিয়ে সোহানা বললো, 'কিন্তু আমার ভাই একটা কথা আছে। যাই করো, আমাকে জিজ্ঞেস না করে করতে পারবে না।'

কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'সত্যি তুমি ইন্টারেস্টেড? আমি র‍্যাঞ্চ দুটোকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছি...' তাড়াহুড়ো করে কাপে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেললো।

'ভেরি গুড।'

'কিন্তু তোমার সময় হবে কি...'

'সময় করে নেবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়,' বললো রানা। 'আপাততঃ মাঝে মধ্যে এসে কাজগুলো তুমি তদারক করে গেলেই হবে। ট্যুরিস্ট'স স্পট তৈরি হয়ে যাবার পর অবশ্য তোমার দায়িত্ব অনেক বাড়বে। ট্যুরিস্টদের জন্যে তোমার তোলা ছবিগুলো বিরাট একটা আকর্ষণ হতে পারে...'

সোহানা বাধা দিয়ে বললো, 'দেখো না, এমন চমৎকার প্ল্যান করবো, সবাই তাজ্জব বনে যাবে।'

কফির কাপটা নামিয়ে রাখলো রানা। 'খবর আছে বললে না? শোনাও এবার।'

'মাস্টার পোচার কে তার একটা আভাস পেয়েছি।'

'মাই গড!' রানার শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'কয়েক শো হাতিকে যে লোক মাইন ফিল্ডে নিয়ে গিয়ে মারলো? এটা একটা খবর বটে। কোথায়? কিভাবে?'

ছোট্ট একটা গল্প শোনালো সোহানা। ইস্টার্ণ হাইল্যাণ্ডের বিশাল

বনভূমি জুড়ে যতো চিতা আছে, ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ওগুলোর ওপর একটা ফটো ফিচার তৈরি করছে সে। চিতা-দের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে স্থানীয় লোকদের লাগিয়ে দিয়েছে, তারা নিয়মিত রিপোর্ট করে। এদের মধ্যে এক বুড়ো নির্জন পাহাড়ী ক্যাম্পে সোহানার সাথে দেখা করতে আসে। আশির ওপর বয়স, তার অষ্টাদশী ছোটো বউ সদ্য এক জোড়া পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছে। বুড়ো নিজে এককালে পোচার ছিলো। শ্যাম্পেনের ভারি ভক্ত, একটা বোতলের জন্যে দু'চারটে বউ বিক্রি করে দিতে পারে। সোহানার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দু'ঢোক গিলেই বক বক করতে শুরু করে বুড়ো। এক লোক তাকে নাকি প্রস্তাব দিয়েছে, চিতার একটা ছালের জন্যে দুশো ডলার পেতে পারে সে। বুড়ো ভয় পেয়ে বলে, এ-কাজ করলে জেলে ভরা হবে তাকে। কিন্তু লোকটা তাকে আশ্বাস দেয়, ছাল কিনবে মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, প্রাক্তন মুক্তি-যোদ্ধা, বড়সড় একটা প্রাইভেট আর্মিও আছে তার। কাজেই বুড়োর ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

দেরাজ খুলে একটা কার্ডবোর্ড ফোল্ডার বের করলো সোহানা, রানার কোলের ওপর ফেলে বললো, 'দেখো।'

ফোল্ডার খুলে দুটো কাগজ বের করলো রানা। প্রথম কাগজে জিম্বাবুই মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যের নাম লেখা রয়েছে। ছাব্বিশটা নাম, প্রতিটি নামের সাথে পোর্টফোলিও উল্লেখ করা আছে।

'তালিকা এখুনি আমরা ছোটো করে আনতে পারি,' বললো সোহানা। 'ক্যাবিনেটের সবাই সত্যিকার যুদ্ধে ছিলেন না। বেশির ভাগই লণ্ডনের রিজ হোটেলে মেয়ে-মদ নিয়ে ফুর্তি করেছেন। রানার চেয়ারের হাতলে বসলো সে। দ্বিতীয় কাগজটা নিয়ে চোখ

বুলালো। 'এতে রয়েছে ছ'জনের নাম। এই ছ'জন যুদ্ধে ছিলেন, প্রত্যেকে এক একজন ফিল্ড কমাণ্ডার।'

'আরো ছোটো করতে হবে তালিকা,' বিড়বিড় করে বললো রানা। দেখলো, তালিকার সবচেয়ে ওপরে রয়েছে জেনারেল উমাঙ্গোর নাম।

'করা হয়েছেও,' বললো সোহানা। 'প্রাইভেট আর্মি—তারমানে নিশ্চয়ই বিদ্রোহী গেরিলারা। ওরা সবাই ম্যাটাবেল। কাজেই তাদের লিডারও একজন ম্যাটাবেলই হবে।' দ্বিতীয় কাগজটা উল্টো করে রানার সামনে ধরলো সে। উল্টো পিঠে একটা মাত্র নাম লেখা রয়েছে। 'স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন ভদ্রলোক। একজন ম্যাটাবেল। ট্যুরইজম, আর ওয়াইল্ড লাইফ মিনিস্টার। কথায় বলে না, রক্ষকই ভক্ষক, এ যেন ঠিক তাই।'

বিড়বিড় করে নামটা পড়লো রানা। 'টস মাজুলেট।' এই অভি-যোগ সত্যি হোক চাইছে না ও। 'কিন্তু সোহানা, মাস্টার পোচার কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে। এতো টাকা মাজুলেট করছে কি? সবাই জানে, অত্যন্ত সাধারণভাবে চলাফেরা করে সে। নিজের বাড়ি নেই, দামী গাড়ি নেই, জমিজমা পর্যন্ত কেনেনি।'

'হয়তো সবচেয়ে দামী জিনিসটা দরকার তার—পাওয়ার। বুঝতে পারছো না, রানা? প্রাইভেট একটা আর্মি পোষা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগে।'

ধীরে ধীরে ঝাপসা একটা নকশা পরিষ্কার ফুটে উঠলো। জাসটিন চ্যাপেল আভাস দিয়ে ওকে বলেছেন, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ব্লকের সমর্থন নিয়ে এখানে কেউ কু করার চেষ্টা করতে পারে। যুদ্ধের সময় ম্যাটাবেল জেড-আই-পি-আর-এ শাখা কম্যুনিস্ট-ব্লকের সহায়তা

পেয়েছিল। তাদের ক্যানডিডেট একজন ম্যাটাবেলই হবে।

টস মাজুলেটই কি সেই ক্যানডিডেট? বিশ্বাস করতে মন চাইলো না। মাজুলেট এক সময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো বলে নয়, রানা তাকে ভালো করে চেনে বলে। এই লোকের চরিত্রে কোনো কালিমা ছিলো না। অসৎভাবে, বা ষড়যন্ত্র করে কিছু অর্জন করার প্রকৃতি নয় তার। আবার, এ-কথাও সত্যি, মানুষ বদলায়। সত্যিই কি মাজুলেট এতোটা বদলে গেছে? ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে সে? 'সে আমার বন্ধু,' বললো ও।

'ছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, চেয়ার ছেড়ে অস্থির ভাবে পায়চারী শুরু করলো। মনে পড়লো, ওপর মহলের কারো নির্দেশে ওর হোটেল কামরা সার্চ করা হয়েছে। মাজুলেট নিশ্চই খবর রাখে, বিশ্ব ব্যাং-কের একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে ও। কু এবং পোচিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে ও, এটাও সে আন্দাজ করে নেবে।'হতে পারে,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু হতে পারে সে-ই হয়তো এই পোচিঙের হোতা।'

'সে-ই, আমি জানি।'

'এখন কি করতে চাও তুমি?' পায়চারী থামিয়ে জানতে চাইলো রানা।

'আমার হাতে কিছু প্রমাণও আছে, সেগুলো আমি জেনারেল উমাঙ্গোর হাতে তুলে দিতে চাই।'

মনে মনে আঁতকে উঠলো রানা। 'মাজুলেট ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'লোকটা বর্বর, রানা। নির্দয় একটা পশু।'

'ওহ্, গড, আই হেট ইট।'

চেয়ারের হাতল থেকে উঠে রানার সামনে দাঁড়ালো সোহানা, ওর একটা হাত ধরলো। 'তুমিও চলো আমার সাথে। শুনি জেনারেল উমাঙ্গো কি বলেন।'

বিমর্ষ চেহারা নিয়ে চুপ করে থাকলো রানা।

'আমি দুঃখিত, রানা,' বললো সোহানা। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমরা এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছি। দেরি করলে আমরা হয়তো অনেক নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে পারবো না। জেনারেল মাজুলেটের নির্দেশে ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা যদি ম্যাশোনা গ্রামগুলোয় হামলা চালায়, কতো লোক মারা যাবে ভেবে দেখেছো?'

রানা ভাবলো, বস কি এই আশংকার কথাই বলেছিলেন? ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের হাতে ম্যাশোনা উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? চোখ বুজে মাজুলেটের চেহারাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করলো ও, বিড়বিড় করে বললো, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক, দেরি করা উচিত হবে না।'

পরদিন খুব সকালে ওদেরকে সময় দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। একজন ম্যাশোনা সৈনিক ওদেরকে পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এলো, অফিসে বসতে দেয়া হলো ওদেরকে। খানিক পর প্রকাণ্ড ধড় নিয়ে ভেতরে ঢুকলো জেনারেল, কোমরে ছোট্ট একটা আণ্ডারওয়্যার ছাড়া সারা শরীর উদোম। হাঁটার সাথে তার শরীরের পেশীগুলো জ্যান্ত সাপের মতো কিলবিল করছে। 'তোমরা আবার কিছু মনে করো না,' হাসতে হাসতে বললো সে, 'বাড়িতে একা যখন থাকি, পুরোপুরি আফ্রিকান হয়ে যাই আমি।' চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো। 'তোমাদের সাথে আড্ডা মারতে পারলে

মন্দ হতো না, কিন্তু ঠিক দশটায় পার্লামেন্ট মিটিং...'

'তাহলে দেরি না করে বলেই ফেলি,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে শুরু করলো সোহানা। 'আমার বিশ্বাস, মাস্টার পোচার কে জানতে পেরেছি আমি।'

ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিলো জেনারেল, থমকে গেল সে। ডেস্কের ওপর হাত দুটো রেখে সোহানার দিকে ঝুঁকলো। অস্বাভাবিক কঠোর হয়ে উঠেছে চেহারা।

'আপনি আমাকে বলেছেন, তার নামটা শুধু বলবো আমি, আপনি তাকে ধ্বংস করবেন,' সোহানা মনে করিয়ে দিলো।

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'হ্যাঁ, মনে আছে। বলুন। নামটা আমি শুনতে চাই।'

তার আগে কিভাবে সূত্র পেলো সেটা ব্যাখ্যা করলো সোহানা। গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর প্রতিটি শব্দ শুনলো জেনারেল। এখনো সে দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো কপালে। সবশেষে সোহানা তাকে শেষ তালিকাটা দিলো, যাতে শুধু একজনের নাম লেখা আছে।

'জেনারেল টস মাজুলেট,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো উমাঙ্গো। 'মাই গড!' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো সে। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। এক সময় ডেস্ক থেকে স্টিকটা তুলে নিলো জেনারেল। ডান হাতের তালুতে ছোটো ছোটো বাড়ি মারছে, আর তাকিয়ে আছে সোহানার মাথার ওপর দিয়ে ম্যাপ ঢাকা দেয়ালের দিকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলো সোহানা, 'জেনারেল?'

চোখ নামিয়ে সোহানার দিকে তাকালো উমাঙ্গো। 'আগুন থেকে

সবচেয়ে গরম কয়লাটা তুলতে বলছেন আপনি আমাকে। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই তো? জেনারেল মাজুলেট রানার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, সেটা আপনাকে প্রভাবিত করেনি তো?'

'ওটা কোনো ব্যাপারই নয়,' মৃদু কণ্ঠে বললো সোহানা।

রানার দিকে তাকালো জেনারেল। 'তুমি কি ভাবছো, রানা?'

খানিক ইতস্তত করে রানা বললো, 'সে আমার বন্ধু। বিপদে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করেছি।'

'সেটা অতীতের ঘটনা,' বললো জেনারেল। 'সে নিজেকে তোমার শত্রু বলে ঘোষণা করেছে।'

'তবু তাকে আমি পছন্দ করি, তাকে আমার ভালো লাগে।'

'অথচ—?'

'অথচ আমার বিশ্বাস সোহানা ঠিক সূত্র ধরেই এগোচ্ছে,' ম্লান গলায় বললো রানা।

চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল জেনারেল, ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো। 'গোটা দেশ বারুদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে,' রঙিন পতাকাগুলোর দিকে চোখ রেখে বললো সে। 'গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি বিদ্রোহ করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখানে। এখানে। এখানে। ওদের গেরিলারা জড়ো হয়েছে জঙ্গলে।' ম্যাপের কয়েক জায়গায় স্টিক দিয়ে টোকা দিলো সে। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন ম্যাটাবেল নেতাদের জেলে ভরেও কোনো লাভ হয়নি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করছিল ওরা। নকোমোকে জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে, অপর দু'জন ক্যাবিনেট মিনিস্টারকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। মন্ত্রীসভায় ম্যাটাবেল সদস্য এখন এই একজনই, টস মাজুলেট।'

'তাতে কি··'

সোহানাকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল উমাঙ্গো বললো, 'জেনারেল মাজুলেটকে শ্রদ্ধা করে না এমন লোক এ-দেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন কি ম্যাশোনাদের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। সন্দেহ নেই, ম্যাটাবেল বিদ্রোহীরা তাকেই তাদের একমাত্র নেতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। এই অবস্থায় আমরা যদি তার গায়ে হাত দিই···'

'লোকটা অপরাধী, জেনেও তাকে আপনারা ছেড়ে দেবেন?' তিক্ত সুরে জানতে চাইলো সোহানা।

'থামুন!' প্রায় ধমকে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসলো সে। 'আমি আসলে বলতে চাইছি, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে তার পরিণতি ভালো নাও হতে পারে। এখনই যদি জেনারেল মাজুলেটকে গ্রেফতার করা হয়, গোটা দেশকে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।'

'তাহলে?'

'আমি কোনো অ্যাকশন নেবো না, তা নয়। তবে, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু করতে রাজি নই।' এখনো দেয়াল জোড়া ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'প্রমাণ চাই, নিরপেক্ষ সাক্ষী চাই। কারণ, তা না হলে, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস বলবে সংখ্যা লঘু ম্যাটাবেলদের ওপর আমরা অত্যাচার চালাচ্ছি। এ-ধরনের অভিযোগ এরই মধ্যে তোলা হয়েছে। জেনারেল মাজুলেটই এখন বিদ্রোহীদের সমস্ত প্রেরণা আর শক্তির একমাত্র উৎস, তাকে আমরা হালকাভাবে নিতে পারি না।'

'আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি,' বললো সোহানা। 'আমি

আর রানা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। জেনারেল মাজু-লেটই যদি পোচার হয়, এতো টাকা কিসে খরচ করছে সে ? আমা-দের ধারণা, তার এই টাকা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যাচ্ছে। আমরা জানি, বিদ্রোহীদের সাথে তার একটা সম্পর্ক থাকা…'

কঠোর হয়ে উঠলো জেনারেলের চেহারা, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে। 'সে যদি মাজুলেট হয়, ফেড়ে আমি তার রক্ত খাবো। কিন্তু তার আগে প্রমাণ যোগাড় করবো আমি, হাত ফস্কে যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে।'

'কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আপনাকে,' তীক্ষ্ণ সুরে জেনারেলকে সাবধান করে দিলো সোহানা। 'দেরি করলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।'

পাঁচ

নিউইয়র্কের সেরা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ পিনটা'স-এর অ্যালকোভ কেবিনে ঢুকলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথা ভর্তি এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল হলদেটে কপাল প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। পিছু ঢুকলো এক তরুণ, লম্বা সুদর্শন।

বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক আর হুইস্কির অর্ডার দিলেন প্রৌঢ়, তারপর যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, জেনারেল উমাঙ্গো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হলো।'

'সেকি! আমার রিপোর্টে সবই তো আছে, আপনি পড়েননি?'

'পড়েছি,' বললেন জাসটিন চ্যাপেল, 'তবু আপনার মুখ থেকে কিছু কিছু শুনতে চাই। আলাপের মধ্যে থেকে অনেক সময় এমন কিছু বেরিয়ে আসে, যা রিপোর্টে পাওয়া যায় না।'

'অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রলোক, চমৎকার ইংরেজী বলেন। ইউনিফর্ম পরলে ব্রিটিশ আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বলে মনে হয়। সাধারণ কাপড়ে মনে হয় কোনো টিভি সিরিজের তুখোড় নায়ক। শুধু আণ্ডারঅয়্যার পরা অবস্থায় বেরিয়ে আসে তার আসল চেহারা—একজন আফ্রিকান।'

'এই তো!' উৎসাহ দিয়ে বললেন জাসটিন চ্যাপেল। 'আপনার রিপোর্টে এই কথাগুলো নেই। বলে যান, বলে যান।'

আরো কিছুক্ষণ কথা বললো রানা।

এরপর চ্যাপেল জানতে চাইলেন, 'ম্যাটাবেল, নডেবেল, আর সিনডেবেল, আমার কাছে খুব জটিল মনে হয়, একটু ব্যাখ্যা করবেন?'

'একজন ম্যাটাবেল নিজেকে নডেবেল বলে, কিন্তু আমরা তাকে ম্যাটাবেল বলি।'

'আচ্ছা, বুঝেছি। আর ম্যাটাবেলরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা সিনডেবেল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে চ্যাপেল বললেন, 'বিশ্ব ব্যাংকের ফিল্ড

এজেন্ট হিসেবে আপনি সত্যি ভালই কাজ দেখিয়েছেন। ওখানে আবার ফিরছেন কবে?'

'আমি শুধু একটা চেক নিতে এসেছি,' বললো রানা। 'ওটা পেলেই...'

বেয়ারা এসে ওদেরকে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করলো। মিটি মিটি হাসছেন চ্যাপেল। বেয়ারা চলে যেতে তিনি বললেন, 'লোনের জন্যে আপনি সরাসরি আবেদন করায় আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সে যাক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করা গেছে, সেজন্যে আমি খুশি। আমাদের হাউজ লইয়ার অপেক্ষা করছে, এখান থেকে সরাসরি সেখানেই যাবো আমরা। সই করে আপনি আপনার দেহ-মন-আত্মা সব বন্ধক রেখে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চেকটা নিয়ে যাবেন। এবার মাস্টার পোচার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'তালিকায় একজনই রয়েছে,' বললো রানা। 'বিকল্প আর কারো নাম এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। জেনারেল মাজুলেট সম্ভবত বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্যেই এ-পথে পা বাড়িয়েছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চ্যাপেল বললেন, 'জেনারেল উমাঙ্গো অ্যাকশন নিতে তেমন উৎসহী নন, কারণটা কি?'

'অত্যন্ত যোগ্য লোক, আঁটঘাট না বেঁধে কোনো কাজে হাত দেয় না,' বললো রানা। 'প্রথমে নিখুঁত একটা পরিকল্পনা তৈরি করবে সে, তারপর জাল বিছাবে। অ্যাকশনে যখন নামবে, আমার বিশ্বাস, সবাইকে চমকে দেবে ও।'

'আমি চাই, মিঃ রানা, জেনারেল উমাঙ্গোকে সম্ভাব্য সব রকমভাবে সাহায্য করবেন আপনি।'

'আপনি জানেন মাজুলেট আমার বন্ধু।'

'ডিভাইডেড লয়ালটি?'

'উঁহু, সে অপরাধী হলে আমি তার পক্ষে থাকছি না।'

'গুড। ইতিমধ্যে আপনি যা খবর সংগ্রহ করেছেন, আমার বোর্ড তাতে ভারি খুশি।'

'ছ্যাটস গুড,' খুশি মনে হাসলো রানা।

জুরিখ হয়ে জিম্বাবুইয়ে ফিরে এলো রানা। কালিচরণ ডিক্রুর কাছ থেকে সস্তায় তোবড়ানো, রঙ চটা একটা ল্যাণ্ড রোভার কিনলো ও, তাতে মাল-পত্তর ভরে রওনা হয়ে গেল কিং'স হেভেনের উদ্দেশে। তার আগে সুখবরটা দিয়ে মিঃ রুবেনসনকে একটা চিঠি লিখলো ও।

শেষ পাহাড়টা থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, চওড়া আকৃতির এক ম্যাটাবেল বৃদ্ধকে রাস্তার কিনারা ঘেঁষে হাঁটতে দেখলো রানা। বুড়োর কোমরে নামকাওয়াস্তে ছোট্ট এক টুকরো পশুর চামড়া, কাঁধে তীর-ধনুক, হাতে একটা লাঠি। মুখে আর হাতে লাল, সবুজ, সাদা রঙের বিচিত্র সব নকশা। একটু ভালো করে নজর করতেই চিনতে পারলো ও, নিলির বাবা, কুয়াকোপা।

কুয়ার কাছে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করলো ও। বুড়ো কাছে আসতে তার হাতে এক প্যাকেট চুরুট আর এক বোতল মদ ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'রাজা মজিলিকাজির আত্মাকে বলবে, আমার জন্যে যেন দোয়া করে। কেমন আছো কুয়াকোপা, তোমাদের সব খবর ভালো তো?'

'এহ হে, এহ্ হে!' আনন্দের আতিশয্যে নাচতে ইচ্ছে করলো বুড়োর। 'ভালো, সব ভালো।'

'আচ্ছা,' এটা সেটা নানা প্রসঙ্গে কথা বলার পর সাবধানে আসল কথাটা পাড়লো রানা, 'বলো তো, কেউ যদি তোমার সব ছাগল কিনে নিতে চায়, তাকে কি বলবে তুমি?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো কুয়াকোপা। রানার মুখে কি যেন খুঁজলো সে। 'বলবো, যাও বাছা, আগে কিং'স হেভেন কেনো, তারপর আমার ছাগল কিনতে এসো।'

'বেশ, ধরো, কিং'স হেভেন কিনে তোমার কাছে ফিরে এলো সে, তখন তুমি কি করবে?'

গম্ভীর হয়ে গেল বুড়ো। 'কথা যখন দিয়ে ফেলবো, তখন বিক্রি করতেই হবে।'

'কতো দাম চাইবে তুমি?'

অনেকক্ষণ হিসেব করে একটা দাম বললো কুয়াকোপা। রানার বাজেটের চেয়ে কম দামই চাইলো বুড়ো। কিন্তু প্রস্তাবটা এখুনি গ্রহণ করলে কুয়াকোপা মনে করবে সে ঠকলো, আরো বেশি দাম চাইলেও হয়তো পেতো। তিন দিন ধরে দর কষাকষি করার পর প্রায় দু'হাজার ছাগল কিনে নিলো রানা। সেদিনই ট্রাকে তুলে বুলা-ওয়ায়ো কসাইখানায় পঠিয়ে দেয়া হলো। ছাগলগুলোর এই কেনা-বেচায় রানার পকেট থেকে প্রায় হাজার দশেক ডলার বেরিয়ে গেল। 'এই যদি হয় ব্যবসার শুরু।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপন মনে হাসলো রানা। নিলিকে পাঠালো তার বাপকে ডেকে আনার জন্যে।

শহর থেকে নিলির জন্যে খাটো স্কার্ট, আর ঢিলেঢালা ব্লাউজ নিয়ে এসেছে রানা। ওগুলো পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয় সে, কিন্তু পরতে বলায় প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। বাপের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে প্রথম দিনটা পালিয়ে পালিয়ে

বেড়ালো সে, পরদিন মেয়েকে ধরে নিয়ে এলো বুড়ো রানার কাছে। রানা বারবার অনুরোধ করার পর নিলি খুব নিচু গলায় জানালো, তার প্রেমিক শহরে চাকরি করে, ওর অনুমতি না পেলে পরপুরুষের দেয়া কাপড় সে পরতে পারে না। শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, ঠিক কথা। সেদিনই শহরে নিলির মনের মানুষকে খবর পাঠানো হলো। প্রেমিক প্রবর খবর পেয়েই ছুটে এলো। রানার সাথে বসে কফি খেলো সে, এক প্যাকেট চুরুট চেয়ে নিলো, তারপর শহরে ফেরার সময় নিলিকে ডেকে বলে গেল, কিং'স হেভেনের মালিক আমাদেরও মালিক, উনি আমাদের খারাপ চাইতে পারেন না। নিলিকে মালিকের সব কথা শুনতে হবে।

ঘরদোর দেখাশোনার দায়িত্ব নিলির হাতেই ছেড়ে দিয়েছে রানা। মেয়েটা খুব সরল। শুধু মেজাজ একটু কড়া। খেতে বসার জন্যে এক বারের জায়গায় দু'বার রানাকে ডাকতে হলে ভীষণ খেপে যায় নিলি, ঝড়ের বেগে ছুটে এসে কোমরে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায়, ভয়ই পেয়ে যায় রানা। তার সাথে বুঝেশুনে, নরম সুরে কথা বলতে হয় ওকে।

'বলো তো, কুয়াকোপা, গরু সম্পর্কে কি জানো তুমি?' বুড়োকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো রানা।

নিজের হাঁটুতে হাত রাখলো বুড়ো। 'আমি যখন এতোটুকু, তখনই পাহাড়ে গরুর পাল নিয়ে যেতাম। পালে বাঘ পড়লো, তখন আমি এতোটুকু,' নিজের কোমরে হাত রাখলো সে। তারপর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমার এই বয়সে পাঁচশো গরু ছাগল দেখাশোনা করেছি, তার আগে বাঘ মেরেছি চারটে। মালিক, আপনি বরং জিজ্ঞেস করুন, গরু সম্পর্কে কি জানি না আমি। বাচ্চা

বিয়োতে পারি, রোগ সারাতে পারি…'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'কিং'স হেভেনে প্রচুর গরু আসছে। দেখাশোনার জন্যে আমার লোক দরকার। বিশজন পুরুষ আর বিশজন মেয়ে বাছাই করো তুমি।'

জবরদখলকারীদের কাউকে তাড়িয়ে না দিয়ে ওদেরকে গ্রাস-ল্যাণ্ডে নতুন ঘর বানিয়ে থাকতে দিলো রানা। প্রত্যেক পরিবারের কর্তাকে বাঁশ, তার, টিন ইত্যাদি কেনার জন্যে টাকা দিলো। ঠিক হলো, প্রত্যেক পরিবার থেকে তিনজন সমর্থ নারী বা পুরুষ কিং'স হেভেনে চাকরি করবে। মোট চল্লিশ জনকে একদিন জড়ো করা হলো বাড়ির সামনে। তাদেরকে চাকরির প্রকৃতি আর শর্ত বুঝিয়ে দিলো রানা। তার আগে কুয়াকোপা একটা বক্তৃতা মতো দিলো।

রানা বললো, 'মাসিক বেতন ছাড়াও প্রত্যেকে তোমরা বছরশেষে এক জোড়া করে গরু পাবে। কিন্তু কেউ যদি কিছু চুরি করে, তার কপালে কিছুই জুটবে না, উল্টে তাকে এই এলাকা থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে।'

'এহ্ হে! এহ্ হে!' সবাই উল্লাসে ফেটে পড়লো।

সবচেয়ে আগে ধরা হলো বেড়া তৈরির কাজটা। মেরামতের বাইরে চলে গেছে ওটা। কয়েক মাইল পর্যন্ত কাঁটাতার গায়েব হয়ে গেছে। খবর নিতে গিয়ে রানা জানলো, জিম্বাবুই সরকারের আম-দানী নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কাঁটাতার আমদানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নিরাশ হতে গিয়েও মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসায় ফোন করলো জেনারেল উমাঙ্গোকে। 'রট, এখানে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।'

সব শুনে জেনারেল জানতে চাইলো, 'কতোটা লাগবে তোমার?'

'কম করেও বারো শো বেল।'

'আর কিছু ?'

'না···দাঁড়াও, সরি টু বদার ইউ, রট,—সোহানার কোনো খবর পাচ্ছি না। টেলিফোন ধরছে না, টেলিগ্রামেরও কোনো উত্তর আসছে না।'

'দশ মিনিট পর ফোন করো আমাকে,' বললো জেনারেল। দশ মিনিট পর রানা ফোন করলো। জেনারেল জানালো, 'তোমার বান্ধবী সেসনা নিয়ে কেনিয়ায় গেছে—মাসাই মারা-র কিচওয়া টিমবু-তে।'

'ফিরবে কবে জানো ?'

'না। তবে ফেরার সাথে সাথে তোমাকে আমি খবর দেবো।'

জেনারেল উমাঙ্গোর বাহু কতোটা লম্বা উপলব্ধি করতে পেরে প্রভাবিত হলো রানা, জিম্বাবুইয়ের বাইরেও হাত বাড়াতে পারে লোকটা। সন্দেহ নেই, সোহানার ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। নিশ্চই ওর ওপরও।

কিচওয়া টিমবু-তে কেন গেছে সোহানা, আন্দাজ করতে পারলো রানা। মারা প্রান্তরের মালিকের আমন্ত্রণ পেয়ে বছর কয়েক আগে ওখানে ও নিজেও একবার গিয়েছিল। ওখানে এখন ক্যাম্পের চার-ধারে গণ্ডারের বড় বড় কয়েকটা পাল বাচ্চা প্রসব করবে—দর্শনীয় একটা ব্যাপার। ক্যামেরা নিয়ে ওখানে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করছে না সোহানা।

শহর থেকে কিং'স হেভেনে ফেরার পথে পোস্ট অফিসে থামলো রানা, একটা টেলিগ্রাম পাঠালো সোহানাকে।

তিন দিন পর কিং'স হেভেনে ট্রাকের একটা কনভয় এসে থামলো, থার্ড ব্রিগেডের একটা প্ল্যাটুন বারো শো বেল কাঁটাতার নামালো

ছাদহীন ট্র্যাক্টর শেডে। 'ইনভয়েস নিয়ে এসেছো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

সার্জেন্ট বললো, 'পেমেন্ট সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমাকে শুধু মালটা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে।'

খালি ট্রাকগুলো সগর্জনে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল, সে-দিকে তাকিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। একটা অপরাধ-বোধ জাগলো মনে। আশংকা করলো, ইনভয়েস হয়তো কোনো দিনই দাখিল করা হবে না। জানে, এটা আফ্রিকা মহাদেশ—আরো জানে, জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তর্কে নামলে তার পরিণতি ভাল নাও হতে পারে।

লেবারদের সাথে নিজেও কাজে নেমে পড়লো রানা। একটানা পাঁচ দিন কাজ করার পর কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করা গেল। পাঁচ দিন পরও যখন টেলিফোন এলো না, বিবেকের দংশন অনুভব করলো রানা। ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে বুলাওয়ায়োতে চলে এলো ও, সোজা জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িতে হাজির হলো।

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড,' সহাস্যে বললো জেনারেল, 'সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছো তুমি। কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ইনভয়েস এখনো পাঠায়নি আমার কাছে। এতোই যখন অস্থির হয়ে উঠেছো, এক কাজ করো, একটা চেক লিখে দাও, ব্যাপারটা এখুনি আমি চুকিয়ে ফেলি। ভাল কথা, ওটা যেন বিয়ারার চেক হয়, কেমন?'

পরের কয়েক হপ্তা অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটলো রানার। সকাল সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠে, ম্যাটাবেল শ্রমিকদের নিয়ে কিং'স

হেভেনকে বাসযোগ্য করে তোলার কাজে লেগে যায়। দুপুরে শ্রমিকদের সাথে বসে খায়, জাকারানডা গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটা ঘুম দেয়। রাতে, বাড়ির বারান্দায় টেবিল সামনে নিয়ে বসে—টেবিলে কাগজ, হাতে বলপয়েন্ট কলম। গ্যাস লাইটের হিস হিস আওয়াজে পোকামাকড়দের চেঁচামেচি চাপা পড়ে যায়।

এক সন্ধ্যায়, জাকারানডা গাছের নিচে ল্যাণ্ড রোভার পার্ক করলো রানা, বাড়ির দিকে হাঁটা ধরলো। জিভে পানি আসা গরুর মাংসের গন্ধে থমকে দাঁড়ালো ও। বারান্দায় উঠলো পা টিপে টিপে। কিচেনের দরজাটা আধ খোলা, উঁকি দেয়ার আগেই এক প্রৌঢ় বেরিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো।

'আমাকে খবর দেননি কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, চোখেমুখে রাগ। 'কিং'স হেভেনের রান্নাঘরে আমি ছাড়া আর কার ঢোকার অধিকার আছে?'

'টস্‌নে!' প্রৌঢ়কে বুকে জড়িয়ে ধরলো রানা। এই টস্‌নে রেবেকাদের পুরানো বাবুর্চি, রেবেকাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতো।

'মালিক, আপনার কাপড়চোপড় নোংরা, আপনার বিছানায় ছারপোকা,' চেহারায় রাজ্যের অসন্তোষ নিয়ে বললো টস্‌নে। 'ওই পুঁচকে ছুঁড়ি নিলি সারাদিন শুধু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আর গান গায়। ওকে আমি বিদায় করবো।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হাসলো রানা। 'হ্যাঁ, বিদায় করে দাও ওকে। ভারি পাজি মেয়ে, আমার কোনো কথাই শোনে না। ভাবছি, তোমার ছেলে এই মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে কিভাবে!'

'অ্যা—ও, আচ্ছা, তারমানে, বুঝেছি!' মাথা চুলকাতে শুরু

করলো প্রৌঢ় টস্‌নে। 'তাহলে তো…মানে…'

'মানে ওকে বিদায় করে দেয়া উচিত হবে না,' বললো রানা।

'ঠিক,' তাড়াতাড়ি সায় দিলো প্রৌঢ়। 'আজকালকার ছেলেরা… বোঝেনই তো! তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েরা এই বয়সে একটু অমন করেই, এতে দোষের কিছু নেই।'

হাসি চেপে রান্নাঘরের দিকে তাকালো রানা। 'কিসের আওয়াজ? ওখানে আর কেউ আছে নাকি?'

'আলায়তুনে,' একগাল হাসলো টস্‌নে। 'আপনি ওকে এই এতোটুকু দেখেছেন,' নিজের হাঁটুর কাছে হাত রাখলো সে।

কয়েক পা এগিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলো রানা। অর্ধ উলঙ্গ এক যুবতী, লম্বা, একহারা গড়ন। ওদের উপস্থিতি টেরই পেলো না সে, পিছন ফিরে কাজ করছে। রানার সমস্ত কাপড়চোপড় আর বাড়ির প্রতিটি পর্দা, চাদর ইত্যাদি সব ধুয়ে ফেলা হয়েছে, টেবিলে ফেলে এক এক করে ইস্ত্রি করছে মেয়েটা। এতোক্ষণে লক্ষ্য করলো রানা, বারান্দা থেকে শুরু করে রান্নাঘর, বেডরুম, সিটিংরুম, সবগুলোর মেঝে মার্বেলের মতো চকচক করছে। দরজার কড়া, নব, ছিটকিনি পর্যন্ত ঝকঝক করছে।

'আমার বড় বউয়ের দুই ভাইকে খবর দিয়েছি,' বললো টস্‌নে। 'একজন কাঠ মিস্ত্রী, আরেকজন রাজ মিস্ত্রী। এক হপ্তার মধ্যে বাড়ির চেহারা বদলে ফেলবে ওরা। পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিনার রেডি হয়ে যাবে। যান, হাত-মুখ ধুয়ে নিন।'

পরের হপ্তায় গরুগুলোর থাকার জায়গা তৈরি হয়ে গেল। বাড়ি-টাও এখন বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যায় কুয়াকোপা আর টস্‌নেকে ডেকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো রানা, বললো দিন কয়েকের

জন্যে বাইরে যাচ্ছে ও।

পরবর্তী দুই হপ্তা প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে সেরা জাতের গরু দেখলো রানা। সাথে একজন ব্রোকারকে নিয়েছে, গরু সম্পর্কে এক্সপার্ট। দুই হপ্তায় প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেললো ওরা। ব্রোকার তৃপ্তির হাসি হেসে বললো, 'গোটা আফ্রিকায় এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে ভালো স্টক আর কারো নেই।'

কিং'স হেভেনে ফিরে এলো রানা। প্রথম চালানে চারটে যুবক ষাঁড় কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছুবে, দ্বিতীয় চালানে আসবে কিছু যুবতী গাভী। এক হপ্তার ভেতর ষাঁড়গুলোর একমাত্র কাজ হবে গাভীগুলোকে গর্ভবতী করা। প্রতিটি ষাঁড়ের জন্যে পনেরো হাজার ডলার করে দাম দিতে হয়েছে ওকে।

জেনারেল উমাঙ্গো জেদ ধরে বসলো, প্রথম চালানের আগমন উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করতেই হবে। অনুষ্ঠানে অতিথি হবার জন্যে দু'জন মন্ত্রীকে রাজিও করিয়ে ফেললো সে। তবে, প্রধানমন্ত্রী মুগাবে বা পর্যটন মন্ত্রী টস মাজুলেটকে সেদিন পাওয়া যাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চাশ জন অতিথির জন্যে রাজকীয় খানাপিনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো টস্‌নে, সাথে মেয়ে আলায়তুনে আর ভাবী পুত্রবধূ নিলি। নিলি আর আলায়তুনে, দু'জনের মধ্যে ভারি ভাব। প্রায় রোজ রাতেই রানার কাছে এসে বায়না ধরে ওরা, দেশ বিদেশের গল্প শোনাও। রানা ইতস্তত করলে নিলি ভয় দেখিয়ে বলে, আবার কাল থেকেই সে আগের পোশাক পরতে শুরু করবে, তারমানে প্রায় উলঙ্গ থাকবে সে। আর আলায়তুনে হুমকি দেয়, যে-সব জিনিস খুব কম করে খেতে বলেছে রানা—শুকনো মরিচ, চর্বি,

তেল, পচা মাংস, কাঁচা মাছ, ইত্যাদি—বেশি বেশি করে খাবে সে। লেখাপড়া না জানলে কি হবে, ব্ল্যাকমেইলিং করতে কারো চেয়ে কম যায় না। অগত্যা প্রায় রোজই ওদের বায়না রক্ষা করতে হয় রানাকে।

মিনিস্টারদের দলটা মার্সিডিজের মিছিল নিয়ে এলো। প্রত্যেক মন্ত্রীর সাথে পাঁচ-সাতজন করে সশস্ত্র বডিগার্ড, তাদের প্রত্যেকের চোখে অ্যাভিয়েটর'স সানগ্লাস। সম্মানী অতিথিদের স্ত্রীরা প'রে এসেছেন পুরোদস্তুর সাফারি প্রিন্ট, গাঢ় রঙ যতো আছে সবগুলো ব্যবহার করা হয়েছে প্রিন্টে। নারী-পুরুষ সবাই পৌঁছেই ঢক ঢক করে মদ গিলতে শুরু করলো। বিশ মিনিটের মধ্যে শুরু হয়ে গেল খিলখিল হাসি, টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে গ্লাস ভাঙার আওয়াজ। শিক্ষামন্ত্রীর বড় বউ ব্লাউজের বোতাম খুলে কুমড়ো আকৃতির একটা স্তন বের করে কোমরে ঝুলে থাকা বাচ্চাকে দুধ খেতে দিলেন, ওদিকে সস্তা শ্যাম্পেনের গ্লাসে নিজেও ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন। 'রিফুয়েলিং ইন ফ্লাইট,' রানার এক প্রতিবেশী, বাবা হোসেইনি, হাসি চেপে ফিসফিস করে মন্তব্য করলো।

সবার শেষে পৌঁছলো জেনারেল উমাঙ্গো। ফুল আর্মি ড্রেস পরে এলো সে, সাথে এক তরুণ এইড। একে তার সাথে আগেও দেখেছে রানা, থার্ড ব্রিগেডের একজন ক্যাপটেন, কিন্তু কথাবার্তা হয়নি। এবার উমাঙ্গো ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো।

ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ লম্বা, কিন্তু সাংঘাতিক রোগা, দেখে মনে হয় ধাক্কা দিলে ভেঙে পড়বে কাঠামোটা। তার চোখে স্টীল রিমের চশমা, রুগ্ন প্রফেসরের মতো লাগে। কিন্তু হ্যাণ্ডশেক করার সময় টের পেলো রানা, শুকনো হাড়েও যথেষ্ট শক্তি রাখে হোসে ভালডেজ। লোকটার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে থাকলেও, সুযোগ

মিললো না—ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে সগর্জনে নামতে শুরু করেছে ষাঁড়বাহী ট্রেইলর।

ফাঁক ফাঁক করে বাঁশ পুতে গোল করে খানিকটা জায়গা ঘেরা হয়েছে, ষাঁড়গুলোকে প্রথমে এখানেই নামানো হবে। লাল ধুলোর পাহাড় তুলে ঘেরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক নামানো হলো, কিন্তু টেইলগেট তোলার আগে জেনারেল উমাঙ্গো ডায়াসে উঠে উপস্থিত মেহমানদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করে দিলো। রানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো সে, বললো, রানাকে সামান্য সাহায্য করতে পেরে গর্ব বোধ করছে সে। সবশেষে সকৌতুকে ঘোষণা করলো, 'এখন আমরা চার মরদকে অভ্যর্থনা জানাবো, যারা বছর ঘুরতেই শ' শ', হাজার হাজার ছেলেমেয়ের বাপ হবে।' সে-ই প্রথম হাততালি দিলো, বাকি সবাই অনুকরণ করলো তাকে।

গেটটা তুললো রানা, নতুন মেহমানদের একজন ট্রেইলরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রোদের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকালো। প্রকাণ্ড একটা পশু, এক টনের ওপর হবে ওজন, লালচে-খয়েরি রঙের চামড়া চকচক করছে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ষোলো ঘণ্টা নির্জীব করে রাখা হয়েছিল, ওষুধের প্রভাব ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে, গোটা দুনিয়ার ওপর তার এখন ভারি রাগ। আওয়াজ লক্ষ্য করে অতিথিদের দিকে তাকালো সে, সামনের দিকে বাঁকানো শিং জোড়া নাড়লো, যেন এ সব তার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এরপর তার দৃষ্টি আটকে গেল ভদ্রমহিলাদের রঙচঙে কাপড়ের ওপর। মুখ খুলে গগনবিদারী একটা হুংকার ছাড়লো সে, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাখালদেরকে সাথে নিয়ে লাফ দিলো নিচে, হিমবাহের মতো নেমে এলো মাটিতে।

রাখালরা হাতের রশি ছেড়ে দিলো, তা না হলে রশির অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টানে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের সাথে সংঘর্ষে ছাতু হয়ে যেতো তারা। বাঁশের সবগুলো খুঁটি চোখের পলকে বিস্ফোরিত হলো, বিস্ফোরিত হলো সম্মানিত অতিথিদের ভিড়টাও। উচ্চপদস্থ অফিসাররা জান বাঁচানোর দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে যার যার স্ত্রীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। সবাই একটা করে জাকারানডা গাছ বেছে নিয়ে ছুটছে। মেয়েদের পিঠে ঝুলে থাকা থলের ভেতর বাচ্চারা তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলো, তাদের চিৎকার চাপা পড়ে গেল ছুটন্ত মায়েদের বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদে।

লাঞ্চের জন্যে একটা মস্ত তাঁবু খাটানো হয়েছিল, সেটাকে লক্ষ্য করে তেড়ে গেল ষাঁড় মহাশয়। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো সে, অপর দিক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল তাঁবু, ষাঁড়ের বিশাল ঘাড়ে শোভা পেতে দেখা গেল রাজ্যের দড়িদড়া।

তাঁবু থেকে বেরিয়েই ষাঁড়ের চোখ পড়লো এক মন্ত্রীর ছোটো বউয়ের ওপর। রঙচঙে সাফারি হাঁটুর ওপর তুলে খিঁচে দৌড় দিলেন ভদ্রমহিলা, ষাঁড়ও তাকে তাড়া করলো। প্রতি মুহূর্তে দ্রুত ছোটো হয়ে আসছে মাঝখানের ফাঁকটা। সামনের দিকে বাঁকানো শিং দিয়ে গুঁতো দিলো ষাঁড়, আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো ভদ্রমহিলার গলা চিরে। ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, জোড়া শিং তাকে জখম করেনি। শুধু রঙিন ড্রেসটাকে শিঙে বাধিয়ে ওপর দিকে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে ষাঁড়, চোখের পলকে নগ্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রমহিলা।

মন্ত্রী মহোদয়ের নিরাবরণ স্ত্রী কোনো রকমে তাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর দৌড় দিলেন পাহাড়ের দিকে। তার লম্বা পায়ে

ঝড়ের গতি, গোটা ছাতি জুড়ে থাকা স্তন জোড়া হরদম লাফাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, মিঃ রানা,' প্রতিবেশী বাবা হোসেইনি, কৃতজ্ঞ চিত্তে বললো, 'জানতাম না আপনার অনুষ্ঠান সূচীতে এতো মজাদার…' অনেকের মতো সে-ও একটু বেশি শ্যাম্পেন গিলেছে।

বহু-রঙা সিল্ক ড্রেসটা ষাঁড়ের মাথায় জড়িয়ে গেছে, তাতে সে আরো ক্ষেপে উঠলো। সশস্ত্র মাথা এদিক ওদিক ঘন ঘন নাড়লো, যেন বাতাসের সাথেই যুদ্ধ তার। ক্ষুদে একটা চোখে হিংস্র দৃষ্টি—ওই একটাই বেরিয়ে আছে, অপরটা কাপড়ে ঢাকা। সামনে শিক্ষা মন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে চোখটা যেন দপ করে জ্বলে উঠলো।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী, মনে হলো তাঁর পদভারে গোটা পাহাড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিক্ষামন্ত্রী কয়েক মন ভার বহন করছেন, সব তাঁর নিজেরই চর্বি আর মাংস। ওয়েস্টকোটের নিচে বিশাল ভূড়ি প্রতি মুহূর্তে আরো যেন ফুলে উঠছে। অনেক দিনের পুরনো ছাইয়ের মতো চেহারা, গলা থেকে চিঁ চিঁ মেয়েলি চিৎকার বেরিয়ে আসছে বিরতিহীন। 'মারো। শালার ব্যাটাকে গুলি করে মারো।'

কিন্তু তাঁর বডিগার্ডরা নির্দেশটা মানলো না। ওরা তাঁর পঞ্চাশ গজ আগে চলে গেছে, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব আরো বেড়েই চলেছে। ট্র্যান্সপোর্টারে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে রানা, শিং বাঁকিয়ে ষাঁড়টাকে শিক্ষামন্ত্রীর পিছু ধাওয়া করতে দেখে আঁতকে উঠলো ও। ষাঁড়ের পা থেকে ধুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে, আবার একটা গগনবিদারী ডাক ছাড়লো সে। এই আওয়াজ অকস্মাৎ ধাক্কা দিয়ে যেন শূন্যে তুলে দিলো তাঁকে। সেই সাথে প্রমাণ হয়ে গেল

পাহাড় বেয়ে ওঠার চেয়ে গাছ বেয়ে ওঠায় অনেক বেশি পারঙ্গম তিনি। চোখের পলকে একটা জাকারানডা গাছের কাণ্ড বেয়ে উঠে গিয়ে নিচের সারির ডালপালা আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকলেন। যমদূত তাঁর ঠিক নিচেই।

আবার হাঁক ছাড়লো ষাঁড়, ঘন ঘন পা ঘষছে মাটিতে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে শূন্যে ঝুলে থাকা কাপুরুষ প্রতিপক্ষের দিকে। 'বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয়। 'গুলি করে মারো ওটাকে!'

পিছন ফিরে তাকালো বডিগার্ডরা। চার্জ পেয়ে শত্রু ধাওয়া করছে না দেখে সাহস ফিরে পেলো। কাঁধ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নামিয়ে লক্ষ্য স্থির করলো ওরা।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলো রানা। 'খবরদার, কেউ গুলি করবে না!' ও জানে, ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে মারা হলে বীমা কোম্পানী টাকা দেবে না। তাছাড়া, পনেরো হাজার ডলারও বড় কথা নয়, উঁচু ঢাল থেকে গুলি করলে নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের কারো না কারো গায়ে লাগবে বুলেট।

দু'জন বডিগার্ড রাইফেল নামিয়ে নিলো, কিন্তু বাকি দু'জন রানার কথায় কান দিলো না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে শিউরে উঠলো রানা, যে কোনো মুহূর্তে গুলি করবে ওরা। ট্রেইলর থেকে নেমে ছুটলো ও। 'না! খবরদার!'

ষাঁড়ের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন, রানার চিৎকার শুনে সাইট থেকে চোখ তুলে তাকালো। এই সময় মট্ করে একটা আওয়াজ হলো। সরু তিনটে ডাল ধরে ঝুলে ছিলো শিক্ষামন্ত্রী, একটা ভেঙে গেছে। ষাঁড় লাফ দিলো, মন্ত্রীর পায়ের

তলায় ঘষা খেলো একটা শিঙের ডগা। দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুতে শুরু করলো তাঁর গলা থেকে। সুড়সুড়ি লাগায় হাসছেন, নাকি অন্য কিছু, ঠিক বোঝা গেল না।

বডিগার্ডদের পিছনে হঠাৎ একজন লোককে দেখা গেল। রাইফেলধারীদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সে, দু'দিকে দুই হাত লম্বা করে দিয়ে রাইফেল দুটোর মুখ অন্যদিকে সরিয়ে দিলো।

'কুয়াকোপা!' স্বস্তির পরশ অনুভব করলো রানা।

ষাঁড়ের দিকে ফিরলো কুয়াকোপা, এক পা এক পা করে এগুলো ওটার দিকে। 'সালামালেকুম, বাহাদুর ষাঁড়!' নরম সুরে বললো বুড়ো। আওয়াজ পেয়ে ঝট করে মাথা ফেরালো বাহাদুর। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে শিং বাঁকালো।

'তুমি কি সুন্দর!' ষাঁড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো কুয়াকোপা। 'তোমার মাথা যেন পাহাড়ের চূড়া, তোমার চোখ যেন একজোড়া চাঁদ।' ষাঁড় আবার শিং দিয়ে গুঁতো মারার ভঙ্গি করলো, কিন্তু আগের মতো প্রচণ্ড বেগে নয়। বাচ্চাদের কান্না, আর মেয়েদের চিৎকার থেমে গেছে, সবচেয়ে ভীতু লোকটাও এখন আর ছুটছে না। সবার চোখ স্থির হয়ে আছে বৃদ্ধ কুয়াকোপা আর ষাঁড়ের দিকে।

'তোমার শিং যেন চোখা বর্শা, আর তোমার বিচি—আহা, তোমার বিচি! ঠিক যেন গ্র্যানিট পাথরের একজোড়া বোল্ডার! দশ হাজার গাভী ওগুলোর ওজন অনুভব করে ধন্য হবে।' এক পা পিছিয়ে গেল ষাঁড়। আবার গুঁতো মারার ভঙ্গি করলো সে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে।

সামনে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো কুয়াকোপা।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। 'বাহাদুর ষাঁড়, তুমি আমার পরাণের বন্ধু…।' হাত দিয়ে ষাঁড়ের ভেজা, চকলেট রঙের নাক আলতোভাবে স্পর্শ করলো সে। নার্ভাস ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল ষাঁড়, তারপর সাবধানে এগিয়ে এসে বুড়োর হাত শুকলো। 'হাজার ষাঁড়ের বাপ তুমি, ছুকরি গাভীগুলোর তোমাকে ভারি পছন্দ,' কোমল সুরে বলে চলেছে বুড়ো। আলতোভাবে তর্জনীটা ব্রোঞ্জ রিঙের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিলো সে, অপর হাত রাখলো ষাঁড়ের মাথায়। ঝুঁকে নাকের সামনে মুখ নামালো, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়লো ভেতরে। কেঁপে উঠলো ষাঁড়; পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা, ওটার কাঁধের পেশীতে ঢিল পড়লো। সিধে হলো কুয়াকোপা, নোজরিঙে এখনো ঢুকে আছে আঙুল, ধীর পায়ে হাঁটা ধরলো—লেজ দুলিয়ে তার সাথে সাথে এগোলো বাহাদুর। দর্শকদের মধ্যে থেকে দুর্বল গুঞ্জন উঠলো একটা—বিস্ময় আর স্বস্তি মেশানো। রানার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো কুয়াকোপা, 'মালিক, ম্যাশোনা বাঁদরগুলোকে আমাদের মাটি থেকে ভাগান তাড়াতাড়ি। আমার বাহাদুর ওদেরকে পছন্দ করে না।' মনে মনে আঁতকে উঠলো রানা, সম্মানী অতিথিরা কেউ সিনডেবেলে ভাষা জানলে কেলেংকারীর আর শেষ থাকবে না।

শিক্ষামন্ত্রী এখনো ডাল দুটো ধরে ঝুলছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ছুটলো রানা। বডিগার্ডরা ইতিমধ্যে গাছের তলায় পৌঁচেছে। 'ডাল ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ে যান, স্যার,' মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছে তারা।

অবশেষে ভুরিভোজনের পর সবাই বিদায় নিলো। জেনারেল উমাঙ্গো গেল সবার শেষে। ফার্ম, বাড়ি, ইত্যাদি সব তাকে ঘুরিয়ে দেখালো

রানা। 'এই অল্প ক'দিনে এতোকিছু করে ফেলেছো!' তাজ্জব বনে গেল জেনারেল। ভারি খুশি আর তৃপ্ত দেখালো তাকে। 'না, সত্যি তুমি কাজের লোক হে, আমার পঁচিশ পার্সেন্ট মনে হচ্ছে-রাজা করে দেবে আমাকে। সামনে কিন্তু আরো বড় কাজ রয়েছে, তাই না? শিজারিরা এস্টেটে হাত দেবে কবে?'

'সবগুলো গরু আসুক,' বললো রানা। 'সোহানাকেও দরকার হবে।'

'তোমাকে বলিনি? তোমার বান্ধবী তো কাল সকালে হারারে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে।'

'কাল তাহলে শহরে গিয়ে টেলিফোন করবো ওকে।'

'এখনো ওরা তোমার টেলিফোন দেয়নি?' বিরক্ত হলো জেনারেল। 'ঠিক আছে, কাল সকালেই পেয়ে যাবে তুমি।'

পরদিন দুপুরের আগেই টেলিফোন লাইন্সম্যান এলো, তার এক ঘণ্টা পর পুব আকাশে উদয় হলো সেসনা। এয়ারস্ট্রিপটা অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি, পেট্রল ভেজা ছেঁড়া কম্বল জ্বেলে রানওয়ের কিনারাগুলো চিহ্নিত করলো রানা, হাত নেড়ে সোহানাকে বুঝিয়ে দিলো কোন্ দিকে বইছে বাতাস। ঠিক পার্ক করা ল্যাণ্ডরোভারের পাশে থামলো সেসনা। লাফ দিয়ে কেবিন থেকে নামলো সোহানা, মাথার হুড খুলে রানাকে যেন সদ্য ফোটা একটা গোলাপ উপহার দিলো সে। 'ওপর থেকে কী সুন্দর দেখালো র‍্যাঞ্চটাকে!'

'এসো, সব তোমাকে দেখাই।'

হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে ফেললো সোহানা, প্রথমে একটা পা তুলে দিয়ে ছোট এক লাফে উঠে পড়লো সামনের সিটে—যেন ব্যস্ত এক কিশোর।

শেষ বিকেলের রোদে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে বাড়ির সামনে নামলো ওরা। সোহানাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বারান্দা থেকে নেমে এলো নিলি, আলায়তুনে আর টস্‌নে। নিলির দিকে তাকিয়ে সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না সোহানা। ক্ষীণ একটু মুচকি হেসে রানাকে বললো, 'স্বস্তি এইটুকু যে ওর সাথে আমাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে না।'

'বলো, সম্ভবত,' সংশোধন করে দিলো রানা।

'তবে রে,' বলে কিল তুললো সোহানা। অমনি খিল খিল করে হেসে উঠলো নিলি আর আলায়তুনে।

রানা বললো, 'টস্‌নে তোমার জন্যে একটা ঘর খালি করে রেখেছে।' আলায়তুনেকে দেখালো ও। 'বাপ-বেটি সেই দুপুর থেকে এটা সেটা অনেক কিছু রান্না করেছে তোমার জন্যে। নিলি তোমাকে গোসলখানায় নিয়ে যাবে, গরম পানি রাখা আছে ওখানে। জেনারেটর চালু করা গেছে, ঘরে আলো থাকবে রাতে।'

'ওদের কাছে আমি তোমার কে?' তির্যক চোখে তাকালো সোহানা।

'সেটা চুপি চুপি ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো,' মুচকি হেসে বললো রানা।

এগিয়ে গিয়ে নিলির একটা হাত ধরলো সোহানা। 'চলো ভাই, গোসলখানাটা দেখিয়ে দেবে।' চলে গেল ওরা।

পাগড়ির মতো করে তোয়ালেটা মাথায় জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সোহানা, রানার পাশের চেয়ারটায় ধপ্‌ করে বসে নিচু পাঁচিলে তুলে দিলো পা জোড়া। 'আহ্‌, কি আরাম!' গা থেকে সাবানের গন্ধ আসছে, চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে গোলাপি

আভা।

একটা ট্রে হাতে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো নিলি। ধূমায়িত কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিলো ওরা। নিলি চলে গেলে, ওরা দু'জন তাকিয়ে থাকলো অস্তমান সূর্যের দিকে।

পশ্চিম আকাশে রক্তলাল রঙ ঢেলে দেয়া হয়েছে যেন, গোধূলি লগ্নে চরাচরে নেমে এলো অটুট নিস্তব্ধতা। দূর থেকে ভেসে আসছে ম্যাটাবেল রাখালের সুরেলা গান। এমন একটা পরিবেশ, কারো মুখে কথা থাকে না।

সূর্য অস্ত যাবার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো ওরা। তারপর উঠে গিয়ে ঘর থেকে একবার ঘুরে এলো রানা। সোহানার হাতে পাণ্ডুলিপিটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'তিন ভাগ লেখা হয়ে গেছে, বাকিটা দু'এক হপ্তার মধ্যে শেষ করে ফেলব। তোমার তোলা একশো ফটো থাকলে তিনশো পৃষ্ঠার ঢাউস একটা বই হয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলো ও।

'ফটোগুলো তোমার জন্যে বাছাই করে রেখেছি আমি,' বললো সোহানা।

ডিনারের পর বারান্দায় আবার ওদেরকে কফি দিয়ে গেল নিলি। আলো নিভিয়ে দিলো রানা। অন্ধকারে বসে থেকে মাসাসা গাছের মাথায় চাঁদ উঠতে দেখলো ওরা, গাছগুলো পাহাড়ের চূড়ায় গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোহানার একটা হাত ধরলো রানা, মৃদু চাপ দিলো।

তারপর একসময় নিজের ঘরে যাবার জন্যে উঠলো সোহানা। কিন্তু তারপরও অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করলো সে, যেন যেতে ইচ্ছে করছে না।

ধীরে ধীরে হাত তুলে সোহানার পিঠ স্পর্শ করলো রানা, নিজের দিকে টানলো তাকে। মুখের ওপর রানার নিঃশ্বাস অনুভব করলো সোহানা। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে রানার ঠোঁটে আলতোভাবে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালো সে, আর তারপরই নিজেকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, শান্ত পায়ে চলে গেল বারান্দা থেকে। শুনতে পেলো, পিছনে পায়ের শব্দ।

গরুর শেষ চালানটা পৌঁছুলো, সেই সাথে পাঁচ মাইল দূরে কুইন'স হেভেনও মেরামতের পর বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। দু'জন ম্যাটাবেলকে চাকরি দিলো রানা, একজন ওভারশিয়ার, অপরজন আর্কিটেক্ট। দু'জনেই তারা সপরিবারে কুইন'স হেভেনে উঠলো। ওভারশিয়ারকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এবার রানা মনোযোগ দিলো শিজারিরা এস্টেটের ওপর। ছোটো আকারের বেশ কয়েকটা বাংলো তৈরি করা হবে, আর্কিটেক্টের ডিজাইন ওদের দু'জনেরই পছন্দ হলো। এক হপ্তার জন্যে জঙ্গলে তাঁবু ফেললো ওরা, শিজারিরা এস্টেটের প্রায় প্রতি ইঞ্চি মাটিতে পা পড়লো ওদের। বাংলোগুলোয় রাতে থাকবে ট্যুরিস্টরা, প্রথম দিনেই জায়গা নির্বাচনের কাজ শেষ করলো ওরা। এরপর গেস্ট-লজের জন্যে জায়গা বাছা হলো, ট্যুরিস্টদের বড়সড় কোনো পার্টি এসে একসাথে থাকতে চাইলে এই লজগুলো ব্যবহার করবে তারা। প্রতিটি বাংলো আর গেস্ট-লজের সাথে আলাদা সার্ভিস কমপ্লেক্স থাকবে। জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশে ওদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে থার্ড ব্রিগেডের একটা স্কোয়াড এলো ওদের সাথে, স্কোয়াডের নেতৃত্বে রয়েছে ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ।

এই ক'দিন কাছ থেকে দেখে লোকটাকে আরো ভালো করে জানার সুযোগ পেলো রানা। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল ইকনমিক্সে একটা কোর্স শেষ করেছে ভালডেজ। ইংরেজী, সিনডে-বেল, আর মাতৃভাষা শোনা বলতে পারে। ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে রোজ রাতেই সোহানা আর রানার সাথে গল্প করে সে। তার একটা খেদ হলো, জিম্বাবুইয়ের উপজাতীয় কোন্দল আজও মিটলো না। 'এই দেশের মানুষ পরস্পরকে কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে ছটফট করছে, অথচ এর একটা সমাধান করার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।' ব্যক্তিগত ভাবে ভালডেজের দৃষ্টিভঙ্গি উদার, শোনা ব্রিগেডের কোনো অফিসারের মধ্যে যা আশা করা যায় না। দুই প্রধান উপজাতির মধ্যে শান্তি চায় সে, এমনকি মধ্যস্থতা করার ব্যাপারেও ভীষণ আগ্রহী। তার কথা হলো, 'বেশি দিন এভাবে চলতে থাকলে, মিঃ রানা, দেশটা আমাদের টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিছু একটা এখুনি করা দরকার। ম্যাটাবেলদের কিছু কিছু দাবি ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু···'

রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু আপনি একজন শোনা, আপনি মধ্যস্থতা করতে চাইলে ম্যাটাবেলরা ভাববে আপনি নিজেদের পক্ষ নিয়েই কথা বলবেন...'

'প্রথমে আমি একজন দেশপ্রেমিক, মিঃ রানা,' শান্তভাবে বললো ভালডাজ। 'আমার ছেলে সারাক্ষণ রাইফেল হাতে ঘুরে বেড়াবে, এটা আমি চাইতে পারি না। আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতিকে মেরে না ফেললে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটা হয় রাগের কথা, না হয় ঘৃণার কথা। এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা বিপজ্জনক।'

প্রতিটি আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু তা থেকে পরিস্থিতির একটা আভাস পেতে কষ্ট হয় না। সবাই বোঝে, এখানে কাজ করতে হলে সশস্ত্র একটা স্কোয়াড থাকা একান্ত দরকার— আপাত দৃষ্টিতে জায়গাটাকে দুর্গম আর নির্জন বলে মনে হলেও।

একদিন সশস্ত্র সৈনিকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে এলো ওরা, একটা উই-ঢিবি আবিষ্কার করে উত্তেজনায় ফেটে পড়লো সোহানা। চারপাশের গাছপালা বন-জঙ্গলের চেয়ে উঁচু ঢিবিটা, ওপরে উঠে দাঁড়ালে কাছেই ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। গোবর গাদা দেখে রানা বুঝলো, কালো গণ্ডারদের আরো একটা ঠিকানা পাওয়া গেল, মলত্যাগ করার জন্যে এখানেও আসে আরেকটা দল। দু'জনেই একমত হলো, ট্যুরিস্টদের জন্যে এটা একটা চমৎকার স্টেজ হতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক দানবের অপেক্ষায় চুপচাপ এখানে বসে থাকবে তারা।

হাঁটু ভাঁজ করে পাশাপাশি বসে রয়েছে ওরা, কথা বলছে ফিসফিস করে, মাথা দুটো কাছাকাছি। হঠাৎ ওদের নিচের ঘন, কালো ঝোপের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। 'নড়ো না,' অস্ফুটে বললো ও। 'এক চুল নড়ো না!'

ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে রানার দৃষ্টি অনুসরণ করলো সোহানা, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার আওয়াজ পেলো রানা।

'কারা ওরা?' বিড়বিড় করে জানতে চাইলো সোহানা, কিন্তু উত্তর দিলো না রানা।

শুধু দু'জোড়া চোখ দেখা গেল। চিতা বাঘের মতো নিঃশব্দে ঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এলো ওরা। 'তাহলে, মিঃ অ্যাডভাইজার,' ওদের মধ্যে একজন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আমাদের খুঁজে বের

করার জন্যে ম্যাশোনা খুনীগুলোকে সাথে করে এনেছো ?'

'ব্যাপারটা তা নয়, মেজর কুকি,' নিচু গলায় বললো রানা। 'আমাদের নিরাপত্তার জন্যে সরকার ওদেরকে পাঠিয়েছে।'

'আমরা তোমার বন্ধু, প্রটেকশনের দরকার কি ?'

'সরকার তা জানে না। কেউ জানে না তোমাদের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তোমরা এখানে থাকো, সেটাও ওদের কল্পনার বাইরে।'

'বলছো, আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে আসোনি ? তাহলে কেন এসেছো ? তাড়াতাড়ি বলো।'

'শিজারিরা এস্টেট কিনে নিয়েছি আমি। আমার সাথে একজন ম্যাটাবেল আর্কিটেক্টও আছে। আমরা এখানে কয়েকটা বাংলো বানাবো, ট্যুরিস্টরা এসে থাকবে।'

গেরিলা দু'জন গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো। তারপর মেজর কুকি জানতে চাইলো, 'তাহলে আমরা কোথায় যাবো ?'

'তোমরা আমার বন্ধু,' মনে করিয়ে দিলো রানা। 'শিজারিরা এস্টেটেই থাকবে তোমরা। আমি তোমাদের টাকা আর খাবার দেবো, তোমরা আমার জানোয়ার, বাংলো সব দেখেশুনে রাখবে। আড়াল থেকে ট্যুরিস্টদের ওপর নজর রাখবে, কিন্তু ওদের কাউকে জিম্মি রাখার চিন্তা মাথায় আনবে না। বন্ধুদের সাথে এরকম একটা সমঝোতায় আসা যায় না ?'

'বন্ধুত্বের দাম কতো ধরতে চাও তুমি ?' দ্রুত জানতে চাইলো গেরিলা লিডার।

'প্রতি মাসে পাঁচশো ডলার।'

'এক হাজার,' দাবি করলো মেজর কুকি।

'ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়া করে না,' রাজি হলো রানা। 'সাথে এখন ছয়শো ডলার আছে, নিয়ে যাও, বাকিটা আমি ডুমুর গাছের তলায় পুঁতে রেখে যাবো—যেখানে আমরা তাঁবু ফেলেছি।'

'ঠিক আছে,' বললো গেরিলা লিডার। 'প্রতি মাসে হয় এখানে, না হয় ওখানে দেখা করবো আমরা।' হাত তুলে দুটো পাহাড়ের চূড়া দেখালো সে, দুটো জায়গাই নদীর কাছ থেকে বেশ দূরে। 'সিগন্যাল হবে, সবুজ পাতার ছোটো আগুন, অথবা পাঁচ সেকেণ্ড পর পর তিনবার রাইফেলের আওয়াজ।'

'বেশ।'

'এবার, মিঃ অ্যাডভাইজার, তোমার পায়ের সামনে গর্তের ভেতর টাকা রাখো, তারপর বউকে নিয়ে কেটে পড়ো।'

মুচকি হেসে রানা বললো, 'ও আমার বউ নয়।'

'না হলেও, হবে,' মন্তব্য করলো মেজর কুকি। 'তোমার ওপর খুব বেশি আস্থা ওর—যেভাবে তোমার কাঁধ খামচে ধরেছে, দেখো, নিশ্চই মাংসের ভেতর নখ ঢুকে গেছে।'

ঝট করে রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিলো সোহানা। ফেরার পথে অবশ্য প্রায় সারাক্ষণ ওর গা ঘেঁষে থাকলো সে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো। অনেকটা দূরে এসে ফিসফিস করে বললো, 'মাই গড, রানা! ওরা ম্যাটাবেল খুনী! ওরা আমাদের খুন করলো না কেন!'

'একটাই কারণ—টাকা।' হাসছে রানা। 'যাই বলো, প্রটেকশনের জন্যে খুবই কম খরচ পড়বে মিঃ রুবেনসনের। মাসে মাত্র এক হাজার ডলার, বিনিময়ে দক্ষ একদল গেরিলাকে বডিগার্ড হিসেবে পেয়ে

গেলেন ভদ্রলোক।'

'কিন্তু ওদের সাথে সম্পর্ক রাখা বিপজ্জনক নয়?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা। 'বিদ্রোহীদের সহায়তা করার জন্যে যদি গ্রেফতার হও?'

'ঝুঁকি আছে বৈকি,' স্বীকার করলো রানা। 'কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি। তবে যতোদিন কেউ না জানছে বিপদের আশংকা নেই।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল সোহানার। 'মিঃ রুবেন-সনকে আসতে বলে চিঠি লিখেছো শুনলাম, কই, ভদ্রলোক আসছেন না যে?'

গম্ভীর হলো রানা। 'অস্ট্রেলিয়ার জিম্বাবুই এমব্যাসী জানিয়েছে, এতো তাড়াতাড়ি আবার তাঁকে ভিসা দেয়া সম্ভব নয়। অন্তত মাস তিন-চার অপেক্ষা করতে হবে।'

হেসে উঠলো সোহানা। 'মিঃ রুবেনসনের লাভই হলো। তিন মাস পর এসে উনি একেবারে তৈরি অবস্থায় পাবেন র‍্যাঞ্চটাকে। আর শিজারিরার ট্যুরিস্ট'স স্পট দেখে আহ্লাদে আটখানা হবেন।

ছয়

বাংলো তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। লেবারের অভাব রয়েছে জানতে পেরে রানাকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল উমাঙ্গো, তিন দিন পর আমি ট্রাকের একটা কনভয় দুশো কয়েদীকে নিয়ে হাজির হলো। এদের সবাইকে দুটি পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আনা হয়েছে।

তিক্ত কণ্ঠে সোহানা বললো, 'স্লেভ-লেবার!'

রানা বললো, 'কিন্তু এই সাহায্য এখন আমি ফিরিয়ে দিতেও পারি না।'

বাংলোগুলোর ফার্ণিচার আর অভ্যন্তরীণ সজ্জা সোহানার দায়িত্ব, রাত জেগে ক্যাটালগ ঘাঁটলো সে। রোজই টেলিফোনে অর্ডার দেয়া হচ্ছে, পরদিন ট্রাকে করে চলে আসছে মালামাল। মাঝখানে জিম্বা-বুইয়ের বাইরেও যেতে হলো ওকে, ফেরার পথে কয়েকটা সমস্যার সমাধান করে এলো। বড়সড় এক হোটেল চেইনের পাঁচজন শেফকে ভাগিয়ে আনলো সে, পাঁচজনই সুইটজ্যারল্যাণ্ডে ট্রেনিং পেয়েছে। ছয়জন যুবতী সাফারি গাইডকেও মোটা বেতনের লোভ দেখিয়ে দলে টানা হলো।

আগামী মাসের শেষ দিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, জেনারেল উমাঙ্গো প্রস্তাব দিলো প্রধান অতিথি হিসেবে সোফিয়া লোরেনকে নিমন্ত্রণ করা হোক। এ প্রস্তাবে ভেটো দিলো সোহানা। তার যুক্তি, আরো কম বয়েসী কেউ হতে হবে। 'প্রিন্স এণ্ড্রু আর প্রিন্সেস ডায়না হলে কেমন হয়?'

'ও কে,' বলে নিজের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলো উমাঙ্গো।

ওঁদের নিমন্ত্রণ করার জন্যে একে-তাকে ধরতে হবে, সেসনা নিয়ে তাই আবার বেরিয়ে পড়তে হলো সোহানাকে।

পাঁচদিন পর হারারে থেকে টেলিফোন করলো সে। 'শিজারিরা নদী পর্যন্ত রাস্তা কমপ্লিট?'

'কমপ্লিট,' বললো রানা। 'ওদিকের সব খবর কি?'

'ভালো। আমি আসছি। কোথায় থাকবে তুমি?'

'শিজারিরা,' বললো রানা। 'কাঠ মিস্ত্রী আর ইলেকট্রিশিয়ানরা কাজ শেষ করে এনেছে, ওদের সাথে আমাকে থাকতে হবে।'

নদীর ধারে, ঘাস মোড়া মাঠে ল্যাণ্ড করলো সেসনা। দেখেই রানা বুঝলো, কোনো কারণে ভয়ানক রেগে আছে সোহানা। 'কি ব্যাপার, সোহানা?'

'এক জোড়া গণ্ডার মারা হয়েছে,' হন হন করে এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো সোহানা। 'আকাশ থেকে ওগুলোর লাশ দেখতে পেয়েছি।'

রাগে দিশেহারা বোধ করলো রানা। 'কোথায়?'

খাদের ঝোপের ভেতর। ত্রিশ গজের মধ্যে দুটো লাশ পড়ে রয়েছে। ওগুলোর ওপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে গেছি, শিংগুলো নিয়ে গেছে। 'আমার ধারণা, ডালিম আর জ্যোছনার লাশ ওগুলো।'

প্লেন নিয়ে ঘুরে ঘুরে গণ্ডারগুলো গুণে রেখেছিল ওরা। আরো হয়তো বেশি আছে, কিন্তু ওদের চোখে সাতাশটা কালো গণ্ডার ধরা পড়েছিল। নয়টা যুবতী, সাতটা যুবক, চারটে বুড়ো-বুড়ি, সাতটা বাচ্চা। সাত জোড়া যুবক-যুবতীর নামকরণ করেছিল ওরা। ডালিমের খড়গ বিক্রি করে একজন পোচার কম করেও দশ হাজার ডলার আয় করবে।

রানার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইলো। জ্যোছনার পেটে বাচ্চা ছিলো। 'খাদ ধরে যেতে হলে অনেক সময় লেগে যাবে,' বললো ও। 'পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

'একটা জায়গা দেখে এসেছি, সেসনা নামাতে পারবো,' বললো সোহানা। 'ওখান থেকে মৃতদেহ মাইল খানেক দূরে।'

এস্টেটের একবারে শেষ প্রান্তে গণ্ডার দুটো মেরেছে পোচাররা। উপত্যকার ঢাল প্রায় খাড়াভাবে নদীর দিকে নেমে গেছে, ঢালের কিনারায় ঘন ঝোপের ভেতর পাওয়া গেল লাশ দুটো। রানা আগে আগে এলো, হাতে কক্ করা রাইফেল। পোচাররা এখনো কাছে পিঠে থাকতে পারে।

লাশগুলোর আশপাশে সব গাছেই দু'চারটে করে শকুন বসে আছে। হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই যা দেখে ডালিম আর জ্যোছনাকে সনাক্ত করা যায়। ওদেরকে কাছে ঘেঁষতে দেখে পাঁচ ছয়টা হায়েনা মুখ ভেঙচে ছুটে পালালো। শকুনের পালক, হায়েনা আর চিতাবাঘের শুকনো মল ইত্যাদি দেখে রানা বুঝলো, অন্তত পাঁচদিন আগে খুন করা হয়েছে ওদেরকে।

'বাস্টার্ডস!' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'ধরতে পারলে ওদের আমি খুন করবো।'

পাহাড়ের মাথায় সেই বিকেল থেকে আগুন জ্বেলে বসে আছে রানা। মাঝে মধ্যে সবুজ কাঁচা পাতা ফেলছে সোহানা, আগুন থেকে হু হু করে ধোঁয়া উঠছে।

সন্ধ্যের দিকে ঝোপ ভেদ করে একটা মাথা বেরিয়ে এলো। 'এতো তাড়াতাড়ি ডাক পড়লো কেন?'

'এই তোমাদের পাহারা দেয়ার নমুনা?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আমার দুটো গণ্ডারকে মেরে শিং চুরি করা হয়েছে। কোথায় ছিলে তোমরা?'

অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না মেজর কুকি। তারপর জানতে চাইলো, 'কোথায়?'

জায়গার বর্ণনা দিলো রানা।

'এখান থেকে, বা আমাদের ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে,' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বললো গেরিলা লিডার। 'আমরা জানতাম না। কিন্তু কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাকে আমরা ঠিকই চিনতে পারবো। অনুসরণ করা কোনো সমস্যাই নয়।'

'ওদেরকে শুধু চিনতে পারলেই হবে না,' বললো রানা। 'ওরা কার কাছে শিং বিক্রি করেছে তাও জানতে হবে।'

'ওই লোকের নাম নিয়ে আসবো,' কথা দিলো মেজর কুকি। 'এই পাহাড় থেকে সিগন্যাল দেবো আমরা।'

বারো দিন পর এক বিকেলে বায়নোকুলার চোখে নিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ ধোঁয়ার আভাস পেলো রানা। ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে একাই রওনা হয়ে গেল ও। ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্টের কি একটা কাজে হারারে-তে গেছে সোহানা।

'আমার টাকা এনেছো?' রানাকে দেখেই জানতে চাইলো মেজর

কুকি।

পকেট থেকে নিঃশব্দে এক হাজার ডলার বের করে মেজরের হাতে ধরিয়ে দিলো রানা।

'সিগারেট?'

এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো রানা। 'কি জানতে পারলে সব বলো আমাকে।'

পায়ের ছাপগুলো ছিলো দশ দিনের পুরানো, তার ওপর লোক তিনজন ফেরার পথে ওগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তবু অনুসরণ করতে অসুবিধে হয়নি, কারণ ম্যাটাবেল গেরিলারা পায়ের ছাপ ধরার ব্যাপারে এক্সপার্ট। উপত্যকার এক ধারে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা গ্রাম আছে, সেখানে থাকে ওরা, হাঁটলে তিন দিনের পথ। বাটোনকা উপজাতির লোক ওরা। সেখানে গিয়ে শিংগুলো ওদের কাছে পায় গেরিলারা। তিনজনকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে ফিরে আসে।

মেজর কুকি থামতে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কি বললো ওরা?'

'বললো, মোটর কার নিয়ে এক লোক এসে তাদের কাছ থেকে হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং ইত্যাদি কিনে নিয়ে যায়। টুটি মিশনের দিক থেকে সাঙ্গানি নদীর তীরে আসে সে, প্রতি পূর্ণিমার রাতে। সে রাতে ওরা রাস্তার ধারে তার জন্যে অপেক্ষা করে।'

আগুনের দিকে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো রানা। তারপর বললো, 'ওদেরকে তুমি বলো...'

'তা সম্ভব নয়।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার।

'ওরা বেঁচে নেই।'

হতাশায় রানার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'তিনজনই?'

'হ্যাঁ,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো মেজর কুকি।

'কিন্তু...'

রানাকে বাধা দিয়ে মেজর বললো, 'চিন্তার কিছু নেই, মিঃ অ্যাড-ভাইজার। তোমার শিং আমরা নিয়ে এসেছি।'

কাঁধে শিং ভর্তি ব্যাগ ঝুলিয়ে ল্যাণ্ড রোভারের কাছে ফিরে এলো রানা। মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে। তিনজন মূর্খ গ্রামবাসীকে মেরে ফেলেছে গেরিলারা। অথচ আসল শত্রু ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল।

বিবেকের দংশন অনুভব করলো ও। কাজটা গেরিলাদের দেয়া উচিত হয়নি ওর।

জেনারেল উমাঙ্গোর ডেস্কে এক লাইনে সাজানো রয়েছে গণ্ডারের চারটে শিং। কার্পেটের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারী করছে সে। তার পরনে শুধু একটা সাদা সিল্ক শর্টস। দ্রুত হাঁটার সাথে ছন্দ রেখে পেশীগুলো জ্যান্ত সরীসৃপের মতো কিলবিল করছে সারা গায়ে।

একটা সোফায় পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা আর সোহানা। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ।

'আমার নিজের সূত্র থেকেও খবর এসেছে, রানা,' বললো জেনা-রেল। 'প্রতিটি তদন্তে দেখা যাচ্ছে, মিস সোহানার ধারণাই ঠিক। সংঘবদ্ধ একটা পোচিং রিঙের অস্তিত্ব সত্যি আছে, গোটা দেশে জাল পেতে আছে তারা। অজ্ঞ গ্রামবাসীদের টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানছে, তারাই জন্তু-জানোয়ার মেরে শিং আর দাঁত জড়ো

করছে এক জায়গায়। কিছু সরকারী কর্মচারীও এই কাজে জড়িত—ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, রেঞ্জার, এরা। জড়ো করা দাঁত আর শিং সরকারী গাড়িতে করে লুকিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে শহরে। সোজা এয়ারপোর্টে ঢুকছে গাড়ি, প্লেনে তুলে দেশের সম্পদ পাচার করে দেয়া হচ্ছে বিদেশে।' হতাশ ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা নাড়লো জেনারেল। 'কোনো সন্দেহ নেই, সরকারী মহলের কোনো প্রভাবশালী লোক এই রিঙের হোতা।'

'সবার চোখের সামনে দিয়ে প্লেনে করে পাচার হয়ে যাচ্ছে?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইলো রানা।

সোহানার প্রশ্ন, 'এয়ার জিম্বাবুই কার পোর্টফোলিও?'

'জেনারেল টস মাজুলেটের। সবার চোখের সামনে দিয়ে, হ্যাঁ। সরকারী গাড়ি, সরকারী প্লেন, সরকারী নিরাপত্তা রক্ষীদের পাহারা—কার কি বলার আছে? ভুলে যেয়ো না, রানা, জেনারেল মাজু-লেটকে কমবেশি সবাই ভয় করে।'

'ক'দিন পরপর এই ঘটনা ঘটে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ক্যাপটেন ভালডেজের দিকে তাকালো জেনারেল উমাঙ্গো। ভালডেজ বললো, 'রেগুলার কোনো প্যাটার্ণ নেই। বর্ষা মউশুমে জঙ্গলের অবস্থা খারাপ থাকে, শিকার পাওয়া কঠিন। কিন্তু শুকনো সময়ে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। তবে আমাদের কাছে খবর আছে, আগামী দু'হপ্তার মধ্যে একটা কনসাইনমেণ্ট পাচার করা হবে।'

জেনারেলের ভুরু কুঁচকে ওঠায় হঠাৎ চুপ করে গেল ক্যাপটেন। বোঝা গেল, এই তথ্যটা ওদেরকে উমাঙ্গো নিজে দিতে চেয়েছিল। 'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন।' ডেস্কের পিছনে বসে একটা সিগার ধরালো

সে। 'আমরা আরো জেনেছি, অর্গানাইজেশনের চীফ প্রায় প্রতিটি অপারেশনে নিজে অংশগ্রহণ করে।' সোহানার দিকে তাকালো সে। 'মাইনফিল্ডে কয়েক শো হাতিকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হয়, আপনি ফটো তুলেছিলেন, মনে আছে? আমাদের সোর্স থেকে জানা গেছে, একজন মন্ত্রী, কে তা জানা যায়নি, সরকারী হেলিকপ্টার নিয়ে ওখানে গিয়েছিল। এ-ধরনের আরো ছটো ঘটনার কথা শোনা যাচ্ছে, এয়ারপোর্টে কনসাইনমেন্ট পৌঁছুবার সময় কেবিনেটের একজন সদস্য নাকি উপস্থিত ছিলো।'

'হয়তো নিজের লোকদের ওপর তার বিশ্বাস নেই,' বললো সোহানা।

জেনারেল জানালো, রিঙের ভেতর নিজেদের একজন লোককে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী কনসাইনমেন্ট সম্পর্কে আগেভাগে খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে। ভাগ্য বিরূপ না হলে হাতেনাতে ধরা যাবে তাকে। তা যদি সম্ভব না হয়, এয়ারপোর্টে পৌঁছুবার সাথে সাথে আটক করা হবে কনসাইনমেন্ট। যাদের অ্যারেস্ট করা হবে তাদের ছ'একজনকে রাজসাক্ষী বানালেই আসল অপরাধীর পরিচয় বেরিয়ে আসবে।

'পোচিং রিঙের হোতাকে গ্রেফতার করার সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী থাকলে ভালো হয়,' বললো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমি চাই, রানা, তোমরা ছ'জনেই আমার সাথে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। জানতে চাইলো, 'পোচিঙের শাস্তি কি?'

'আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ শাস্তি।'

'এ যথেষ্ট নয়।'

'জানি। পার্লামেন্টে নতুন একটা সংশোধনী বিল তোলা হয়েছে,' জেনারেল বললো। 'আমিই তুলেছি। আশা করছি বৃহস্পতিবারে পাশ হয়ে যাবে ওটা। তখন পোচিঙের জন্যে শাস্তি হবে বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

'বারো বছর—হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'এটা ঠিক আছে।'

ক'দিন পরই এক সকালে জেনারেল উমাঙ্গোর ডাক এলো। আশা করা হচ্ছে আজ রাতেই বোধ হয় পোচিং রিঙের হোতা মুভ করবে। জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িটাকে অপারেশন্যাল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে পৌঁছুতে হবে রানাকে। টেলিফোনে ক্যাপটেন ভালডেজ আরো জানালো, সোহানার সাথে কথা হয়েছে জেনারেলের, রানাকে নিয়ে আসার জন্যে এখুনি হারারে এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হচ্ছে সোহানা।

দু'ঘণ্টার মধ্যে কিং'স হেভেনে পৌঁছে গেল সোহানা, ওর জন্যে এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করছিল রানা। সরাসরি হারারে এয়ারপোর্টে পৌঁছুলো ওরা, ওখান থেকে গাড়ি করে জেনারেল উমাঙ্গোর বাড়িতে।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে চারদিকে অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়লো। সামনের লনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সুপার ফ্রেলন হেলিকপ্টার, পাশেই পাইলট আর ইঞ্জিনিয়ার হাতে সিগারেট নিয়ে গল্প করছে। গাড়ি-পথ ধরে রানা আর সোহানাকে আসতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো দু'জন, তারপর গুরুত্বপূর্ণ কেউ

নয় ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিলো। বাড়ির এক পাশে ধূসর রঙের চারটে আর্মি ট্রাক রয়েছে, সেগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ফুল ব্যাটল-কিট সহ থার্ড ব্রিগেডের ট্রুপাররা। সবাই খুব অস্থির, যেন নির্দিষ্ট একটা নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

জেনারেল উমাঙ্গোর অফিসে একজোড়া ক্যাম্প টেবিল ফেলা হয়েছে, দেয়ালে সাঁটা বিশাল রিলিফ ম্যাপের দিকে মুখ করে। প্রথম টেবিলে তিনজন জুনিয়ার অফিসার বসে আছে। দ্বিতীয় টেবিলে একটা রেডিও অ্যাপারাটাস রয়েছে, ক্যাপটেন ভালডাজ অপারেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে মাইক্রোফোনে কথা বলছে শোনা ভাষায়। হঠাৎ চুপ করে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ম্যাপের পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্টকে একটা নির্দেশ দিলো সে। সাথে সাথে রঙিন একটা মার্কার সরিয়ে নতুন পজিশনে রাখলো সার্জেন্ট।

রানা আর সোহানাকে দেখে শুধু মৃদু একটু হাসলো জেনারেল উমাঙ্গো। টেলিফোনে কথা বলছে সে। খানিক পর রিসিভার নামিয়ে ওদের দিকে ফিরে দ্রুত ব্যাখ্যা করলো, 'তিনটে গুদাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমরা। একটা চিমানিমানি পাহাড়ের শাম্বা-তে, বেশিরভাগ চিতার ছাল আর আইভরি রাখা হয়। দ্বিতীয়টা দক্ষিণের সিরেজীর কাছে একটা ট্রেডিং পোস্টে—সবই আইভরি। তৃতীয়টা উত্তরে, সম্ভবত টুটি মিশনে। এটাই সবচেয়ে বড় আর দামী কনসাইনমেন্ট—আইভরি আর গণ্ডারের শিং। খবর আছে, তিনটে গুদাম থেকে আজই রওনা হবে ট্রাকগুলো।'

ক্যাপটেন ভালডাজ বাধা দিলো জেনারেলকে। তার হাত থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে পড়লো জেনারেল, বললো, 'গুড। উত্তরের রাস্তায় দুটো প্ল্যাটুন পাঠাও, একেবারে কারোই পর্যন্ত।' আবার

রানার দিকে ফিরলো সে। 'অপারেশন কোড নেম, বাদা। এটা একটা শোনা শব্দ, মানে চিতা। অপারেশন চলার সময় আমরা যাকে সন্দেহ করছি তাকে বাদা বলে ডাকা হবে।' মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এই মাত্র খবর পেলাম, হারারে থেকে রওনা হয়েছে বাদা। অফিশিয়াল ম্যাসিডিজে রয়েছে সে, সাথে ড্রাইভার আর দু'জন বডি-গার্ড। তিনজনই ম্যাটাবেল, অবশ্যই।'

'কোন্ দিকে যাচ্ছে?' দ্রুত জানতে চাইলো সোহানা।

'এই মুহূর্তে উত্তরেই যাচ্ছে, কিন্তু এখনো কিছু বলা যায় না।'

'তারমানে সবচেয়ে বড় চালানটার দিকে যাচ্ছে।' ফিসফিস করে বললো সোহানা, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তার রক্ত।

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বললো জেনারেল। 'এখন দেখা যাক, বাদা উত্তরে গেলে আমরা কি করবো। চিমানিমানি আর সিরেজী থেকে যে ট্রাকগুলো আসবে, ওগুলোকে আমরা বাধা না দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আসতে দেবো। এয়ারপোর্টে ঢোকার সাথে সাথে থার্ড ব্রিগেডের ট্রুপাররা ওগুলোকে ঘিরে ফেলবে, গ্রেফতার করা হবে ড্রাইভারদের। সারাটা পথে আমাদের লোক থাকবে, ট্রাকগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে।'

রানা একটু গম্ভীর, কিন্তু জেনারেলের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও।

'বাদা, যদি পুব বা পশ্চিমে রওনা হয়, আমরাও তাহলে ওই সেক্টরে অপারেশন পরিচালনা করবো…'

'তাকে ধরার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইলো সোহানা।

'আসলে সুযোগের ওপর নির্ভর করবো আমরা,' বললো জেনা-রেল, 'আর সুযোগ পাবো কি পাবো না সেটা নির্ভর করছে বাদার

অ্যাকশনের ওপর। তার সাথে কনসাইনমেন্টের ফিজিক্যাল কানেক-শন হতে দিতে হবে, তবেই তাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব। ট্রাক আর মার্সিডিজ, দুটোর ওপরই নজর রাখবো আমরা। দুটো এক সাথে হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বো।' হাত দুটো ওপরে তুলে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করলো জেনারেল।

রেডিও সেট ঘড় ঘড় করে উঠলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর ক্যাপটেন ভালডেজ শান্ত গলায় বললো, 'আর কোনো সন্দেহ নেই, স্যার। কারোই রোড ধরে উত্তরে ছুটছে মার্সিডিজ।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন, কণ্ডিশন থ্রি পর্যন্ত যেতে পারি আমরা,' নির্দেশ দিলো জেনারেল। হোলস্টারের মুখে বোতাম এঁটে দিলো সে। 'টুটি রোড থেকে সার্ভেইল্যান্স টিম কিছু বলছে না?'

মাইক্রোফোনে তিনবার ডাকলো ক্যাপটেন, সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'নেগেটিভ, জেনারেল।'

'এতো তাড়াতাড়ি আশাও করা যায় না।' লাল বেরেট একটু তেরছা ভঙ্গিতে মাথায় পরলো জেনারেল, রূপালি চিতার মাথা তার ডান চোখের ওপর চকচক করছে। 'তবে এখুনি আমরা আমা-দের ফরওয়ার্ড পজিশনে মুভ করতে পারি।' সবাইকে পথ দেখিয়ে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে।

তাকে দেখেই সিগারেট ফেলে, হ্যাচ দিয়ে হেলিকপ্টারে ঢুকে পড়লো ক্রুরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো জেনারেল, স্টার্টার-মটর জ্যান্ত হয়ে উঠলো, মাথার ওপর ঘুরতে শুরু করলো রোটর।

বেঞ্চে বসে ওয়েস্ট-বেল্ট বাঁধছে সবাই, রানা বললো, 'রট, এটা একটা ফুল স্কেল মিলিটারী অপারেশন, প্রায় ক্রুসেডের মতো।

তারচেয়ে সব দায়িত্ব পুলিশের হাতে ছেড়ে দিলে না কেন?'

'পুলিশ শুধু অযোগ্য নয়, ঘুষখোরও,' স্পষ্ট করে বললো জেনারেল। 'তাছাড়া, রানা, ওগুলো আমারও গণ্ডার ছিলো।'

আকাশে উঠে উত্তর দিকে উড়ে চললো হেলিকপ্টার। মেইন রোড থেকে অনেকটা দূরে থাকলো ওরা, মার্সিডিজ থেকে কেউ যাতে ওদেরকে দেখতে না পায়। এক ঘণ্টা পর কারোই-এর মিলিটারী দুর্গে নামলো হেলিকপ্টার। হাতঘড়ি দেখলো রানা। চারটে বাজে।

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো। 'হ্যাঁ, এটা বোধহয় একটা নাইট অপারেশনই হতে যাচ্ছে।'

কারোই গ্রাম বলতে একটা রাস্তার দু'ধারে দু'চারটে দোকানপাট, একটা সার্ভিস-স্টেশন, একটা পোস্ট অফিস, আর ছোটো একটা পুলিশ স্টেশন। মিলিটারী বেস শহরের আরো খানিক সামনে —গোটা এলাকা কাঁটাতারের বেড়া, আর বিশ ফিট চওড়া বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ঢালু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

লোকাল কমাণ্ড্যান্ট, তরুণ এক সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট, জেনারেলের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরকে দেখে কি করবে ভেবে পেলো না। জেনারেল যতোবার কথা বলে, নাটকীয় ভঙ্গিতে ততোবার স্যালুট করতে শুরু করলো সে।

'এই ইডিয়েটকে সরাও,' ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। কমাণ্ড পোস্টের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলো সে। 'বাদার সর্বশেষ পজিশন বলো।'

রেডিও সেট থেকে মুখ তুলে ভালডাজ জানালো, 'বাদা তেইশ মিনিট আগে সিনাইয়া পেরিয়েছে।'

'গুড। ভেহিকেলের নিখুঁত বর্ণনা পেয়েছি আমরা ?'

'ডার্ক ব্লু মার্সিডিজ দুশো আট, বনেটে পতাকা, রেজিস্ট্রেশন পি. এল. ছয় শো চুয়াত্তর। মটর সাইকেল আউটরাইডার বা অন্য কোনো এসকর্ট ভেহিকেল নেই। চারজন আরোহী।'

'সব ইউনিটকে এই বর্ণনা পাঠিয়ে দাও,' নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'তারপর আরেকবার স্মরণ করিয়ে দাও, কোনো অবস্থা-তেই গুলি করা চলবে না। বাদাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় গ্রেফতার করবো।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'বাদা আহত হলে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি খেপে যাবে, সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' আবার ক্যাপটেনের দিকে তাকালো সে। 'এমনকি নিজের জান বাঁচাবার জন্যেও কেউ গুলি করতে পারবে না। এই নির্দেশ কেউ অমান্য করলে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। বাদাকে বা বাদার গাড়িকে লক্ষ্য করে কেউ একটা ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়তে পারবে না।'

এক এক করে প্রতিটি ইউনিটকে ডাকলো ক্যাপটেন, জেনারেলের নির্দেশ কয়েকবার করে রিপিট করলো। এরপর শুধু অপেক্ষার পালা, আর সস্তা এনামেলের মগে চুমুক দিয়ে তেতো চা খাওয়া।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। ঝাঁকি খেয়ে সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লো ক্যাপটেন। 'ট্রাকটাকে দেখা গেছে,' দ্রুত অনুবাদ করলো সে। 'সবুজ পাঁচ টনি ফোর্ড, ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। ক্যাবে একজন ড্রাইভার, একজন আরোহী। খুব ভারি, সাসপেনসনের ওপর চেপে বসে আছে। দশ মিনিট আগে সানিয়াটি নদী পেরিয়েছে ওটা, আসছে টুটি মিশনের দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সামনের রোড জাংশনে পৌঁছে যাবে, এখান থেকে বিশ মাইল উত্তরে।'

'তারমানে একই পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছে ট্রাক আর মার্সিডিজ,'

নরম সুরে বললো জেনারেল উমাঙ্গো, তার চোখে প্রত্যাশার চকচকে আলো, যেমন দেখা যায় শিকারীর চোখে।

খানিক পরপর রিপোর্ট আসছে। উত্তর দিকে, অর্থাৎ ওদের দিকে ছুটে আসছে মার্সিডিজ। একটা সেকেণ্ডারি রোড ধরে ধীর গতিতে উল্টোদিক থেকে আসছে ভারি ট্রাক।

জেনারেল উমাঙ্গো এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে না। চেয়ারে হেলান দিয়ে, কমাণ্ড্যান্টের ডেস্কে পা তুলে দিয়েছে সে, চামড়া মোড়া স্টিক দিয়ে জাংগল বুটের রাবার সোলের কিনারায় একঘেয়ে ছন্দে বাড়ি মারছে—এক সময় রানার কাছে বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো ব্যাপারটা। ক্যাপটেনের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরালো ও, চলতি মাসে দ্বিতীয়বার। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে ছোটো অফিসের ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করলো ও।

আরেকটা রিপোর্ট এলো। মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে ক্যাপটেন বললো, 'গ্রামে পৌঁছে গেছে মার্সিডিজ। গ্যাসোলিন নেয়ার জন্যে সার্ভিস স্টেশনে থেমেছে ওরা।'

ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে গাড়িতে বসে রয়েছে টস মাজুলেট, ভাবলো রানা। মনে মনে আরেকবার প্রার্থনা করলো ও, রিঙের লিডার যেন অন্য কেউ হয়, মার্সিডিজে যেন অন্য কেউ থাকে।

বন্ধুর প্রতি সৎ থাকতে চাইছে রানা, আবার একজন ক্রিমিন্যালকে আইনের হাতে তুলে দেয়ার তাগাদাও অনুভব করছে। এক সময় মনে হলো, এই দ্বন্দ্ব ওকে পাগল করে ছাড়বে। পায়চারী করতে করতে মাথার চুলে আঙুল চালালো, চোখ দুটো লালচে হয়ে

উঠেছে।

নিঃশব্দে ওকে লক্ষ্য করছে সোহানা।

ছোটো অফিসের ভেতর হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে এলো রানার। ছোট্ট উঠনে বেরিয়ে এলো ও, উঠনটা চারদিক থেকে উঁচু বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা। সূর্য ডুবে গেছে, দিনের শেষ আলোও যাই যাই করছে।

পাশে এসে দাঁড়ালো সোহানা। 'এতো মন খারাপ করো না তো,' নিচু গলায় বললো সে। 'আমার একটা কথা শুনবে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা বললো, 'বলো।'

'তুমি যেয়ো না,' বললো সোহানা। 'এখানে থেকে যাও।'

মাথা নাড়লো রানা। 'না। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। দেখতে চাই সত্যি ওর স্খলন ঘটেছে কিনা।' হঠাৎ ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোহানার একটা কাঁধ খামচে ধরলো ও। 'জানো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! ওকে আমি ভালোবাসি, এই কথাটা আমি ভুলে থাকতে পারছি না!' রানার মতো সোহানার চোখও ছলছল করে উঠলো, কিন্তু তার এই চোখের পানি টস মাজুলেটের জন্যে নয়, রানার জন্যে ওর কষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে সোহানা।

'রানা

কথাটা শেষ করতে পারলো না সোহানা, দড়াম করে খুলে গেল কমাণ্ড পোস্টের দরজা, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'আমরা রওনা হচ্ছি, রানা!'

মাথা নিচু করে জেনারেলকে অনুসরণ করলো রানা, পাশে সোহানা, ওর হাত ধরে আছে। দুর্গের গেটের কাছে এসে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো ওরা।

সন্ধ্যে নামতেই ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করলো, শীত শীত করছে ওদের। ল্যাণ্ড-রোভারের বনেট থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে উইণ্ড-স্ক্রীন।

হোসে ভালডেজ গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে জেনারেল উমাঙ্গো। পিছনের সিটে রেডিও অপারেটরের সাথে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রানা আর সোহানা। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ভালডেজ, পার্কিং লাইট ছাড়া আর কোনো আলো জ্বলছে না। হুড খোলা দুটো আর্মি ট্রাকে থার্ড ব্রিগেড ট্রুপারদের কালো মাথা গিজ গিজ করছে, পিছু পিছু আসছে ট্রাক দুটো।

প্রায় আধ মাইল সামনে রয়েছে মার্সিডিজ। মাঝে মধ্যে গাড়ি-টার টেইল-লাইট দেখতে পেলো ওরা, ঘন জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ী রাস্তা ধরে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে।

ওডোমিটার চেক করলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'তেইশ মাইল এসেছি আমরা, সানিয়াটি আর টুটির দিকে বাঁকটা আর দু'মাইল সামনে।' স্টিক দিয়ে ক্যাপটেনের কাঁধে টোকা দিলো সে। 'থামো। জাংশান ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করো।'

শুধু ঠাণ্ডায় নয়, উত্তেজনাতেও রানার শরীর শির শির করছে। ইঞ্জিন চালু রেখেই জাংশান ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করলো ভালডেজ, ফরওয়ার্ড অবজারভেশন টিম গা ঢাকা দিয়ে আছে ওখানে।

'এই তো, যা ভেবেছি।' ভালডেজের গলা কেঁপে গেল। 'বাদা মেইন রোড থেকে বাঁক নিয়েছে, জেনারেল। টার্গেট ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়েছে, ক্রসরোড থেকে দু'মাইল দূরে। বোঝাই যাচ্ছে, আগে থেকে ঠিক করা ছিলো এখানে ওরা মিলিত হবে।'

'গাড়ি ছাড়ো।' নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ফলো দেম।'

আগের চেয়ে জোরে গাড়ি ছোটালো ভালডেজ।

'ওই বাঁক দেখা যায়!' চাপা গলায় বললো জেনারেল। আবছা অন্ধকারেও ধুলো ভরা মেটো পথটা দেখা গেল।

ল্যাণ্ড-রোভারের স্পীড কমিয়ে বাঁক নিলো ভালডেজ। একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে দাঁড়ালো একজন থার্ড ব্রিগেড সার্জেন্ট। লাফ দিয়ে ফুটবোর্ডে উঠলো সে, মুক্ত হাতটা দিয়ে কোনোরকমে স্যালুট করলো। 'এক মিনিট আগে এখান দিয়ে গেছে ওরা, জেনারেল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে, যেন কতো মাইল দৌড়ে এসেছে। 'ট্রাকটা খানিক সামনে। সেটার পিছনে রোডব্লক সেট করেছি আমরা; আপনারা এগিয়ে গেলে এখানেও আরেকটা রোডব্লক থাকবে। ওদের আমরা বোতলের ভেতর আটকে ফেলেছি, স্যার।'

'ক্যারি অন, সার্জেন্ট!' মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো, ক্যাপটেনের দিকে তাকালো। 'পথটা এখান থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে নদীর দিকে। আমরা গড়াতে শুরু করলেই ট্রাকগুলোর ইঞ্জিন অফ করে দিতে বলবে।'

প্রায় একসাথে বন্ধ হয়ে গেল তিনটে ইঞ্জিন, গাড়িগুলো ঢালু পথ বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা, কানে বিস্ফোরণের মতো বাজলো।

পথের বাঁক, মোড় আর মোচড়গুলো আবছা অন্ধকারে অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো ওদের সামনে। ঢাল এই একটাই নয়, একের পর এক অনেকগুলো। কিছুদূর পর পর খানিকটা করে সমতল পথ। ল্যাণ্ড-রোভারের ঠিক পিছনেই রয়েছে ট্রুপারদের ট্রাকগুলো, অন্ধকারে বিশাল আকৃতির কালো দানব মনে

হচ্ছে ওগুলোকে, কোনো আলো জ্বলছে না। প্রতিটি বাঁকে ঝাঁকি খেলো ল্যাণ্ড-রোভার, প্রতিবার রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরে প্রায় ঝুলে থাকলো সোহানা।

'ওই তো ওরা!' হঠাৎ কথা বলে ওঠায়, হিংস্র, কর্কশ শোনালো জেনারেল উম্নাঙ্গোর গলা।

ওদের নিচে, গাছগুলোর সামনে মার্সিডিজের হেডলাইট কখনো উজ্জ্বল দেখালো, কখনো নিষ্প্রভ। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। এক সেকেণ্ডের জন্যে হেডলাইট জোড়া সামনের বাঁকে হারিয়ে গেল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো আলো, আলোর লম্বা দুটো টানেল মেটো পথের হলদেটে মেঝে উদ্ভাসিত করে তুললো। হঠাৎ করেই উল্টো দিক থেকে জ্বলে উঠলো চোখ ধাঁধানো আরো এক জোড়া হেডলাইট। এতো দূর থেকেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। এই দ্বিতীয় জোড়া হেডলাইট ঘন ঘন তিন বার নিভলো আর জ্বললো—বোঝাই যায়, এটা এক ধরনের সিগন্যাল। সাথে সাথে মন্থর হলো মার্সিডিজের গতি।

'ওদের পেয়েছি।' হিস হিস করে উঠলো জেনারেল উমাঙ্গো। হাত বাড়িয়ে পার্কিং লাইট অফ করে দিলো সে।

ওদের নিচে, রাস্তা থেকে সরে গিয়ে, অন্ধকার ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছিলো ট্রাকটা। ট্রাকের ওপর চৌকো একটা ফ্রেম, ফ্রেমের ওপর তেরপল। হেলেদুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথের ওপর চলে এলো, জোড়া আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মার্সিডিজ। দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা।

দু'জন লোক নামলো মার্সিডিজ থেকে। কয়েক পা হেঁটে ট্রাকের দিকে এগোলো তারা, একজনের হাতে একটা রাইফেল। ক্যাবের

পাশে দাঁড়ালো তারা। ক্যাবের খোলা জানালা দিয়ে ট্রাক ড্রাইভা-রের সাথে কথা বলছে।

গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো ল্যাণ্ড-রোভার, নিচের উপত্যকায় সমতল পথের ওপর উজ্জ্বল আলোর বন্যা। রানার একটা কনুই খামচে ধরেছে সোহানা।

নিচের রাস্তায় একজন লোক তেরপল ঢাকা ট্রাকের পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরালো সে, মুখ তুলে ওপরের রাস্তায় তাকালো। দ্রুতগতি ল্যাণ্ড-রোভারকে দেখে পাথর হয়ে গেল সে। এখন ওরা এতো কাছে চলে এসেছে, ট্রাক আর মার্সিডিজের ইঞ্জিনের আওয়াজ সত্ত্বেও নুড়ি পাথরের সাথে চাকার ঘষা শুনতে না পাবার কোনো কারণ নেই।

ল্যাণ্ড-রোভারের হেডলাইট জ্বাললো জেনারেল উমাঙ্গো, একই সাথে ইলেকট্রনিক বুলহর্ন তুললো মুখে। 'নড়বে না!' উচ্চকিত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠলো নিস্তব্ধ রাতে। 'কেউ পালাতে চেষ্টা করবে না!'

লোক দু'জন লাফ দিয়ে মার্সিডিজের দিকে ফিরতে চেষ্টা করলো। সগর্জনে স্টার্ট নিলো ল্যাণ্ড-রোভার, ঝাঁকি দিয়ে ছুটলো সামনে।

'ওখানেই দাঁড়াও তোমরা। অস্ত্র ফেলে দাও!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্তত করতে লাগলো লোক দু'জন। প্রথম লোকটা হাতের রাইফেল ফেলে দিলো, তারপর দু'জনেই হাত তুললো মাথার ওপর, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিট পিট করছে।

একটু বেঁকে গিয়ে মার্সিডিজের সামনে থামলো ল্যাণ্ড-রোভার,

মার্সিডিজের পথ আটকে দিয়ে। লাফ দিয়ে নিচে নেমে খোলা জানালার দিকে ছুটলো ক্যাপটেন ভালডেজ, হাতের উজি সাবমেশিনগানটা তাক করলো গাড়ির ভেতরে। 'বেরোও!' হুংকার ছাড়লো সে। 'সবাই বেরিয়ে এসো!'

ধুলোর পাহাড় তুলে ওদের পিছনে এসে থামলো ট্রুপারদের ট্রাক দুটো। ঝুপ ঝুপ করে লাফ দিয়ে নামলো সশস্ত্র ট্রুপাররা, ছুটে গিয়ে নিরস্ত্র লোক দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো মাটিতে। চোখের পলকে মার্সিডিজকে ঘিরে ফেললো তারা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো দরজাগুলো। ভেতর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হলো ড্রাইভার সহ এক লোককে।

দীর্ঘদেহী পুরুষ, চওড়া কাঁধ—জেনারেল টস মাজুলেটকে চিনতে না পারার কোনো কারণ নেই। কালো গ্র্যানিট পাথরের মতো শক্ত চোয়ালে উজ্জ্বল আলো পড়ে চকচক করছে। একটা ঝাঁকি দিয়ে গা থেকে সৈনিকদের হাত সরিয়ে দিলো মাজুলেট, অগ্নিদৃষ্টি হানলো—ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে এলো সৈনিকরা। 'কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো জানো? এতো স্পর্ধা, আমার গায়ে হাত দাও!'

গাঢ় রঙের স্ল্যাকস আর সাদা শার্ট পরে আছে সে। কোঁকড়া চুল ভরা মাথাটাকে কামানের গোলার মতো লাগলো। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে, দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। নিজেদের অজান্তেই আরো এক পা করে পিছিয়ে এলো সৈনিকরা, কি করবে বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে হেডলাইটের পিছনের অন্ধকার থেকে সামনে, আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলো জেনারেল উমাঙ্গো। দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো মাজুলেট।

'আচ্ছা, তুমি !' গর্জে উঠলো সে। 'চীফ পোচার !'

'ট্রাক খোলো !' হুকুম দিলো উমাঙ্গো।

তুই জেনারেল পরস্পরের দিকে এমন প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে তাকিয়ে আছে, ওদের চারপাশের আর সব কিছু নিতান্ত তাৎপর্যহীন বলে মনে হলো। এ যেন তুই জন্মশত্রু মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—মহাদেশের সমস্ত ঘৃণা, হিংসা, আক্রোশ আর নির্দয়তার প্রতিনিধিত্ব করছে এই দু'জন।

ল্যাণ্ড-রোভার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এগোতে গেল রানা, কিন্তু হতভম্ব হয়ে মার্সিডিজের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। এ-ধরনের কিছু আশা করেনি ও। সাথে সাথে বুঝে নিলো, পরস্পরের প্রতি ওদের এই আক্রোশ আর ঘৃণা বহু দিনের পুরানো, এই মুহূর্তের কোনো ব্যাপার নয়। মনে হলো, যে-কোনো মুহূর্তে পরস্পরের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওরা।

আটক করা ট্রাকের পিছনে থেকে টুপাররা কাঠের বড় বড় বাক্স টেনে নামাতে শুরু করেছে। পথের ওপর পড়ে গিয়ে একটা বাক্স ভেঙে গেল, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো লম্বা আইভরি, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় সাদা আগুনের মতো দেখালো ওগুলোকে। আরেকটা বাক্স থেকে মহামূল্যবান সোনালি চিতার ছাল বের করলো একজন সৈনিক।

'এই তো প্রমাণ !' উল্লাসে ফেটে পড়লো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ম্যাটাবেল কুকুরটাকে গ্রেফতার করো !'

'তোমার মতলব যাই হোক, এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে, উমাঙ্গো,' জেনারেল মাজুলেটের ভারি গলা শোনা গেল। এখনো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'শোনা বেশ্যার পেট থেকে

বেরিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছো, তোমার হাত ভেঙে দেয়া হবে।'

'বাঁধো ওকে! আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও!' প্রচণ্ড রাগে মাটিতে পা ঠুকলো জেনারেল উমাঙ্গো।

কিন্তু কে বাঁধবে! মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার দিকে এক পা এগোতেই সাহস পেলো না কেউ। মাজুলেটের শরীর থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে শক্তি, সাহস, আর ব্যক্তিত্বের আলো। জেনারেল উমাঙ্গোর হুকুম পেয়েও ইতস্তত করছে সৈনিকরা।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মাঝখানে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে পড়লো সোহানা। পথের ওপর নামানো হয়েছে চিতার ছাল আর হাতির দাঁত, সেদিকে এগোলো। এক সেকেণ্ডের জন্যে সৈনিক আর মাজুলেটের মাঝখানে চলে এলো সে। মাজুলেটের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেউটের ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে খপ্ করে সোহানাকে ধরে ফেললো সে, হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর এনে ফেললো।

পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা, এতো দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করাও সম্ভব হয়নি। সোহানার হাত বাঁকা করে মোচড়ালো মাজুলেট। ককিয়ে উঠলো সোহানা, তার পা দুটো মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়লো। তাকে ঢালের মতো করে নিজের সামনে ধরে আছে মাজুলেট, ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে একটা রাইফেল তুলে নিলো। তার পিছনটা আড়াল করে রেখেছে ল্যাণ্ড-রোভার, সামনে রয়েছে সোহানা।

গুলি করার জন্যে সাব-মেশিনগান তুললো একজন সৈনিক।

'না! খবরদার!'

রানা থামতেই জেনারেল উমাঙ্গো নির্দেশ দিলো, 'কেউ গুলি করলে তাকে আমি জ্যান্ত কবর দেবো! ম্যাটাবেল কুকুরটাকে

জ্যান্ত চাই আমি।'

সোহানার বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে এলো রাইফেলের ব্যারেল, পিস্তলের মতো করে এক হাতে সেটা ধরে আছে মাজুলেট। জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে লক্ষ্যস্থির করলো সে, এক পা এক পা করে ল্যাণ্ড রোভারের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ল্যাণ্ড-রোভারের ইঞ্জিন এখনো সচল।

'কোথায় পালাবে তুমি!' উমাঙ্গোর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। 'সামনে পিছনে দু'দিকেই রোডব্লক। আমার সাথে একশো লোক রয়েছে। এতোদিনে পেয়েছি তোমাকে।'

রেট-অভ-ফায়ার সিলেক্টর আঙুল দিয়ে ঠেলে দিলো মাজুলেট, জেনারেল উমাঙ্গোর পেটের দিকে তাক করলো রাইফেল। মাজুলেটের বাঁ কাঁধের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, গুলি হবার এক পলক আগে ও দেখলো, রাইফেলের ব্যারেল চুল পরিমাণ সরে গেল। বুঝলো, ইচ্ছে করেই উমাঙ্গোর কোমর থেকে এক ইঞ্চি দূরে গুলি করলো মাজুলেট।

বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল, গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন কাভারের খোঁজে ছিটকে গেল চারদিকে।

এক হাতে ধরা মাজুলেটের রাইফেল ওপর দিকে মুখ তুললো, তেরপল ঢাকা ট্রাকে গিয়ে লাগলো গুলি, কয়েক ডজন ফুটো দেখা গেল তেরপলে। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল জেনারেল উমাঙ্গো, গুলি না লাগলেও ভয় পেয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে ট্রাকের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। প্রচুর সময় পেলেও, মাজুলেট ওর দিকে দ্বিতীয়বার গুলি করলো না।

সৈনিকরা চারদিকে ছুটোছুটি করছে, গুলি করলে নিজেদের

লোককেই জখম করবে ওরা। ধাক্কা দিয়ে সোহানাকে ল্যাণ্ড-রোভারের প্যাসেঞ্জার সিটে ফেলে দিলো মাজুলেট, একই সাথে নিজে উঠে বসলো ড্রাইভিং সিটে। গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিলো গাড়ি।

'খবরদার, কেউ গুলি করবে না!' ট্রাকের পিছন থেকে নির্দেশ দিলো জেনারেল উমাঙ্গো। 'ওকে আমি জ্যান্ত চাই!'

একজন ট্রুপার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভারের ফুটবোর্ডে, কনুইয়ের এক প্রচণ্ড গুঁতো দিয়ে তাকে ফেলে দিলো মাজুলেট। আরেকজন সৈনিক বোকার মতো ল্যাণ্ড-রোভারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছুটে এসে তার বুকে ধাক্কা দিলো ল্যাণ্ড-রোভার। থ্যাচ্ করে একটা আওয়াজ হলো। বার কয়েক ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো ল্যাণ্ড-রোভার, মট মট করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো।

অন্ধকার পাহাড়ের দিকে ছুটে চলে গেল ল্যাণ্ড-রোভার।

সাত

এক ঝটকায় মার্সিডিজের দরজা খুললো রানা। লাফিয়ে উঠে হুইল ধরলো। খোলা জানালা দিয়ে জেনারেল উম্যাঙ্গোর চিৎকার ভেসে এলো, 'রানা! ওয়েট!'

গ্রাহ্য না করে মার্সিডিজ সিধে করলো রানা, চাপ দিলো অ্যাকসিলারেটরে। তীর বেগে ছুটলো গাড়ি।

পাহাড়ী রাস্তা, প্রথম বাঁকটা যেন স্যাঁৎ করে উড়ে চলে এলো সামনে। পথের কিনারা উঁচু-নিচু, চাকাগুলো যেন হাতুড়িপেটা শুরু করলো মাটিকে, অসম্ভব ঝাঁকি খেলো গাড়ি। পিছনটা কাত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বুকের রক্ত পানি হয়ে গেল রানার। পথের কিনারা থেকে নেমে গেল পিছনের একটা চাকা, বাকি তিনটে অবশ্য পরমুহূর্তে টেনে নিলো সেটাকে। বাঁক নেয়া শেষ করে সামনে ল্যাণ্ড-রোভারের লাল টেইল লাইট দেখতে পেলো ও, সাদা ধুলোর ভেতর অস্পষ্ট।

পরবর্তী বাঁক গ্রাস করলো ওটাকে, ধুলোর ভেতর পথ হারালো রানা। ডান পা তুলে নিয়ে ঘন ঘন এদিক ওদিক হুইল ঘোরালো, মার্সিডিজের নাক বাঁকের হদিশ পাবার ব্যগ্র চেষ্টা করছে। আবার

পিছনের একটা চাকা কিনারা থেকে নেমে গিয়েও উঠে এলো, অল্পের জন্যে রক্ষা হলো, বাঁক নিয়ে সিধে হলো গাড়ি।

ধুলোর ভেতর মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল ল্যাণ্ড-রোভারকে। মার্সি-ডিজের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সোহানা। কিনারায় তার শরীর খানিকটা মোচড় খেয়ে রয়েছে, ছুটন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে নেমে পড়ার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু মাজুলেটের একটা লম্বা হাত এগিয়ে এসে তার কাঁধ খামচে ধরলো, হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এসে ঠেসে ধরলো সিটের সাথে।

স্কার্ফটা মাথা থেকে উড়ে গেল, ডানা ঝাপটানো পাখির মতো হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। ঘন কালো চুল খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মাথায় আর মুখে। পরমুহূর্তে আবার ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। প্রচণ্ড রাগে মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল রানার। মাজুলেটের ওপর ঘৃণায় রী রী করে উঠলো শরীর। পরবর্তী বাঁকটা নিখুঁতভাবে পেরিয়ে এলো ও। বাঁক নেয়া শেষ করে আবার বাড়িয়ে দিলো স্পীড।

আরেকটা বাঁক নেয়ার পর আরো কাছে চলে এলো ল্যাণ্ড-রোভার, মাঝখানে তিনশো গজ দূরত্ব। মাথা উঁচু করে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। আবার বাঁক এসে ছিনিয়ে নিলো তাকে। স্পীড কমিয়ে মোড় ঘুরলো রানা। সামনে রোডব্লক।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে তিন টনী একটা আর্মি ট্রাক। মাটির উঁচু পাড় আর ট্রাকের মাঝখানের ফাঁকটা সদ্য ফেলা কাঁটা-ঝোপ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে, কয়েক গজ চওড়া। ঝোপের ভেতর লোহার বারও দেখা গেল, প্রতিজোড়া বারের মাঝখানে লোহার মোটা চেইন। এই ব্যারিয়ার একটা বুলডোজারকেও ঠেকিয়ে দেবে।

ব্যারিয়ারের সামনে পাঁচজন সৈনিক, হাতের রাইফেল তুলে থামার নির্দেশ দিচ্ছে। এখনো ওরা গুলি করছে না দেখে রানা আশা করলো, জেনারেল উমাঙ্গো সম্ভবত রেডিওতে যোগাযোগ করেছে ওদের সাথে। তবু খোলা ল্যাণ্ড-রোভারে আধশোয়া অবস্থায় সোহানাকে পড়ে থাকতে দেখে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ শুরু করলো। গুলি হলে সোহানা ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

অ্যাকসিলারেটরের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, ছুটো গাড়ির মাঝখানে দূরত্ব এখন আরো কমে এসেছে। ব্যারিয়ারের একশো গজ এদিকে রাস্তা বরাবর ডানদিকের পাড়টা নিচু। হঠাৎ সেদিকে ফিরলো মাজুলেট, ভোঁতা নাক ল্যাণ্ড-রোভার উড়ে পেরিয়ে গেল জায়গাটা, চার চাকা দিয়ে মাটি খামচে চূড়া টপকালো, ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের হলুদ, উঁচু ঘাসের ভেতর। রানা বুঝলো, মাজুলেটকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। মার্সিডিজের ইঞ্জিন মাটির খুব কাছাকাছি ঝুলছে, পাড়ের মাথায় পেটটা বেধে যাবে। নিচু জায়গা-টাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো মার্সিডিজ। উড়ে সামনে চলে এলো রোডব্লক, সংঘর্ষের আগ মুহূর্তে সজোরে ব্রেক করলো রানা। ঘুরে গিয়ে রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো মার্সিডিজ, মুহূর্তের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল ধুলি-ঝড়ে। শরীরের এক ধাক্কায় দরজা খুললো রানা, হোঁচট খেতে খেতে রাস্তায় নামলো।

হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ের মাথায় উঠলো রানা। বিশ গজ সামনে ল্যাণ্ড-রোভার, লো গিয়ারে গর্জন করছে ইঞ্জিন, এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে। গাছগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা দখল করে রয়েছে ঘন হলুদ ঘাস, আঙুলের মতো মোটা ডাঁটা, মাথা সমান উঁচু। সেগুলোকে নত করে এগিয়ে যাচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভার গতি

মন্থর হলেও ঘুর পথে রোডব্লককে পাশ কাটাচ্ছে মাজুলেট।

ছুটলো রানা। সোহানার জন্যে উদ্বেগ ওর পায়ে যেন ঝড়ের গতি এনে দিলো, উঁচু-নিচু মাটিতে মাত্র একবার হোঁচট খেলো ও।

ওকে পিছু নিতে দেখলো মাজুলেট, এক হাতে রাইফেল তুললো। রানার দিকে লক্ষ্য স্থির করছে সে, রাইফেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সোহানা। নিচু হলো রাইফেলের ব্যারেল। অপর হাতটা হুইল থেকে সরাতে পারছে না মাজুলেট, মুঠোর ভেতর জ্যান্ত কৈ মাছের মতো লাফাচ্ছে সেটা। ইতিমধ্যে রোডব্লক ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, প্রতি মুহূর্তে ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে চলে আসছে রানা।

মাজুলেট আর সোহানা ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু দশাসই কালো লোকটা শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করে নিলো। হাতটাকে দা-এর মতো ব্যবহার করলো সে, কানের নিচে একটা কোপ খেয়ে ড্যাশ বোর্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সোহানা। এবার দু'হাতে হুইল ধরলো মাজুলেট, ঘুরে গেল ল্যাণ্ড-রোভার, খানিকটা পিছিয়ে পড়লো রানা।

একটা ঢাল বেয়ে উঠলো গাড়ি। ঢালের মাথায় মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো, তারপরই ঝাঁপ দিলো ওপর থেকে—ঘুরন্ত চাকা আর মেটাল বডির কর্কশ আওয়াজ নিয়ে আছাড় খেলো রাস্তার ওপর।

ঢাল থেকে পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে ল্যাণ্ড-রোভার, প্রাণপণে ছুটলো রানা। ঢালের মাথায় উঠে এলো ও। ওর দশ ফুট নিচে, কী আশ্চর্য, এখনো চার চাকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাণ্ড-রোভার। স্টিয়ারিং হুইলের সাথে বাড়ি খেয়ে কপাল ফেটে গেছে মাজুলেটের, গাড়িটাকে আয়ত্তে আনার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা

চালাচ্ছে।

লাফ দিলো রানা, পতনের ফলে দম আটকে এলো। ল্যাণ্ড-রোভার হঠাৎ গতি পেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। এই সময় সেটার টেইল-গেটের ওপর অর্ধেক শরীর দিয়ে পড়লো রানা। শক্ত লোহার সাথে ঠোকর খেয়ে পাঁজরগুলো যেন গুঁড়িয়ে গেল। কেউ যেন মুঠোর ভেতর নিয়ে চেপে ধরেছে ফুসফুস, হুস করে বেরিয়ে গেল বুকের সব বাতাস। চোখে ঝাপসা দেখলো রানা। রেডিও সেটটা ধরে ফেলে কোনো রকমে ঝুলে থাকলো।

ব্যথা আর আতংকে ফোঁপাচ্ছে সোহানা। আওয়াজটা প্রকৃতিস্থ করলো রানাকে, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। টেইল-গেটের পিছনে ঝুলে রয়েছে ও, পা দুটো শূন্যে। ওর পিছনে, রোডব্লক পেরিয়ে এসেছে আর্মি ট্রাক। হেডলাইটের আলো নিয়ে সগর্জনে ধাওয়া করে আসছে সেটা। ল্যাণ্ড-রোভারের সামনে, মেইন রোডে একটা তেমাথা—গতি ফিরে পেয়ে সেদিকে ছুটছে মাজুলেট।

বাঁকের জন্যে তৈরি ছিলো রানা, তবু অনুভব করলো বাহু দুটো শোল্ডার-সকেট থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়। মাত্র দু'চাকায় ভর করে বাঁদিকে বাঁক নিলো মাজুলেট, উত্তর দিকে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। জিম্বাবুই সীমান্ত একশো মাইল সামনে। পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, পথের সবখানে ৎসেৎসি মাছির ঝাঁক, কোথাও কোনো লোক-বসতি নেই। সাথে জিম্মি থাকায় মাজুলেটের পক্ষে সীমান্তে পৌঁছানো সম্ভব, রানা যদি হাল ছেড়ে দেয়, কিংবা বাধা দিতে গিয়ে সোহানা আর নিজের মৃত্যু ডেকে আনে।

একটু একটু করে নিজেকে ল্যাণ্ড-রোভারে তুলে আনতে চাইছে রানা। সিটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সোহানা, প্রতিটি

ঝাঁকির সাথে তার মাথা এদিক-ওদিক দুলছে। তার পাশে দীর্ঘদেহী মাজুলেটের চওড়া কাঁধ, সাদা শার্ট হেডলাইটের আলোয় ঝলমল্ করছে।

শরীরটা আরো একটু তোলার জন্যে সিটের পিছনটা এক হাতে ধরলো রানা। সাথে সাথে ঘুরে গেল ল্যাণ্ড-রোভারের নাক, আচমকা ঝাঁকি খেয়ে আরেকটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলো রানা। পলকের জন্যে মাজুলেটের রক্তচক্ষু দেখা গেল ভিউমিররে। রানাকে লক্ষ্য করছিল সে, দুর্বল মুহূর্তে গাড়ির নাক ঘুরিয়ে বেসামাল করতে চেয়েছিল ওকে।

ঘন ঘন দিক বদল করছে ল্যাণ্ড-রোভার, গাড়ির গায়ে একবার এদিক একবার ওদিক আছাড় খাচ্ছে রানার শরীর। শুধু বাঁ হাতে রেডিও সেটটা ধরে আছে ও, শরীরের সমস্ত ভার পড়ায় মনে হলো ছিঁড়ে যাবে হাতটা। স্টীলের কিনারায় আহত পাঁজর ঘষা খেলো, চোখে অন্ধকার দেখলো ও, কিন্তু রেডিও সেটটা ছাড়লো না কিছুতেই।

রানাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিতে চাইছে মাজুলেট। এঁকেবেঁকে ছুটছে ল্যাণ্ড-রোভার, ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে রাস্তার দু'দিকের পাড়ে।

গাড়ি একবার সিধে হতেই সুযোগটা নিলো রানা। পিছনের সিট ধরে ফেললো ও, সিটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলো শরীরটা, তারপর মুক্ত হাতটাকে মাজুলেটের ঘাড়ের ওপর চাবুকের মতো ব্যবহার করলো। প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে গুঙিয়ে উঠলো মাজুলেট, হুইল থেকে হাত দুটো ছুটে গেল। পিছনে হাত উঠিয়ে রানার কব্জি আর কনুই ধরতে চেষ্টা করলো সে, আহত পশুর মতো ফোঁসফোঁস করছে। পোষ না মানা হুইল আপনা থেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। রাস্তা

থেকে ছিটকে সরে এলো ল্যাণ্ড-রোভার, হেলেদুলে ঢালের মাথায় উঠলো, তারপর ডিগবাজি খেতে শুরু করলো।

সিট থেকে হাতটা ছুটে গেল রানার, ছিটকে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। দড়াম করে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো শরীরটা, একটা কি দুটো গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা তুললো ও।

মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে ল্যাণ্ড-রোভার। হেডলাইট এখনো জ্বলছে, বিশ গজ দূরে আলোর একটা টানেলের মধ্যে শুয়ে আছে সোহানা। ছোট্ট একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। চোখ দুটো বন্ধ, মুখে প্রশান্তির ভাব, কিন্তু কপাল আর চুলের মাঝখানে মোটা লাল একটা দাগ জ্বল জ্বল করছে।

রক্ত দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার দিকে এগোলো ও, আবছা অন্ধকার থেকে উঠে দাঁড়ালো একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি।

টলছে মাজুলেট, হাত দুটো আহত ঘাড়ের ওপর। তাকে দেখে রাগে যেন অন্ধ হয়ে গেল রানা। দাঁড়ালো।

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখলো মাজুলেট, স্থির হয়ে গেল সে। তারপর সামনে এগোলো। সামনাসামনি হলো ওরা, পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। অনেক দিন আগে, যখন বন্ধুত্ব ছিলো, কুস্তি আর বক্সিং লড়েছে ওরা। মাজুলেটের গায়ে অসুরের শক্তি, সে-কথা ভুলে গেছে রানা। ওকে দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে নিলো মাজুলেট, ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু মাজুলেটকে ছাড়লো না রানা, তাকে নিয়ে ঘাসের ওপর পড়লো ও। রানার ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে যেতে চাইলো মাজুলেট। বাধা না দিয়ে নিজেও তার সাথে খানিকটা

গড়ালো রানা, উঠে পড়লো মাজুলেটের গায়ে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো মোটা গলাটা।

ছটফট করছে মাজুলেট, উরুর চাপ দিয়ে তাকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো রানা। মাজুলেটের গলায় ওর আঙুল ডেবে যাচ্ছে। লোমশ কালো দুটো হাত উঠে এসে রানার গলা চেপে ধরলো। কিন্তু শক্তি ফুরিয়ে এসেছে মাজুলেটের। হাত দুটোয় জোর পাচ্ছে না। নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়লো একটু পরই।

তার গলায় চাপ আরো বাড়ালো রানা। দম আটকে গেছে মাজুলেটের। মারা যাচ্ছে সে।

হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে সরে এলো রানা। কাঁপছে ও, হাঁপাচ্ছে। মাজুলেটকে খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

হামাগুড়ি দিয়ে সোহানার দিকে এগোলো রানা। সোহানার মাথাটা তুলে কোলের ওপর রাখলো। এক হাত দিয়ে রক্তের ধারাটা মুছলো, সোহানার চোখে পড়ার আগেই। ওদের ওপরে, রাস্তায়, ব্রেক করার আওয়াজ হলো। আর্মি ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলো সৈনিকরা। ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে তারা।

ঘুম থেকে যেন এক শিশু জাগছে, নড়ে উঠে বিড়বিড় করে কি যেন বললো সোহানা।

বেঁচে আছে, এখনো বেঁচে আছে। ফিসফিস করে বললো রানা, 'সোহানা, চোখ খোলো!' ঠোঁট নামিয়ে তার চোখে চুমো খেলো ও।

সোহানার দুটো পাঁজরে চিড় ধরেছে, মচকে গেছে ডান পায়ের গোড়ালি। কপালের ওপর খুলিটা ফাটেনি, শুধু খুলির চামড়া

ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু ঘাড়ে যেখানে মাজুলেট রদ্দা মেরেছিল, জায়-গাটা ফুলে আছে, ব্যথাও খুব। জেনারেল উমাঙ্গোই সব ব্যবস্থা করে দিলো, হারারে-র একটা সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হলো সোহানা।

টস মাজুলেটের মুক্তির দাবিতে ম্যাটাবেল উপজাতির লোকেরা সারা দেশে মিছিল বের করলো। কিন্তু থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা ম্যাটাবেলদের প্রতিটি সমাবেশ ভেঙে দিলো, কোথাও কোনো ধর্মঘট সফল হতে পারেনি। কয়েক দিনে গ্রেফতার হলো প্রায় দু'হাজার ম্যাটাবেল।

শিজারিরা ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে রানা। সোহানাকে ফেলে হারারে থেকে নড়ার উপায় নেই ওর।

ম্যাশোনাল্যাণ্ড ডিভিশনের দু'নম্বর কোর্টে মামলা উঠলো। কোর্ট ভবন, আশপাশের সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এদের বেশির ভাগই ম্যাটাবেল। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে থার্ড ব্রিগেডকে তলব করা হয়েছে, হাতে কারবাইন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে তারা। জনতার মধ্যে কোনো রকম অশান্ত ভাব নেই, সবাই গম্ভীর এবং বিষণ্ন। শুধু আসামীকে যখন কোর্ট ভবনে নিয়ে আসা হলো, ভিড়ের মধ্যে থেকে চাপা একটা গুঞ্জন উঠলো। আর, কোর্টরুমের ভেতরে, দর্শকদের আসন থেকে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে জেনারেল মাজুলেটকে স্যালুট করলেন এক ভদ্রমহিলা, চিৎকার করে বললেন, 'নেতা দীর্ঘজীবী হোন। এ প্রহসন বন্ধ করো।' সশস্ত্র গার্ডরা ছুটে এলো, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সাথে সাথে কোর্টরুম থেকে বের করে দেয়া হলো ভদ্রমহিলাকে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো

জেনারেল টস মাজুলেট। শুধু তার শারীরিক উপস্থিতিই আর সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে। তার রাশভারি চেহারা, চওড়া কাঁধ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠলো, তাতে এমনকি মাননীয় বিচারককেও সাধারণ একজন লোক বলে মনে হলো।

বিচারকের দু'পাশে কালো আলখাল্লা পরা দু'জন জুরী বসে আছেন, ইচ্ছে করলে বিচারক তাঁদের পরামর্শ চাইতে পারবেন, কিন্তু বিচারকের রায়ই চূড়ান্ত, জুরীদের মতামত তিনি গ্রাহ্য করতেও পারেন, নাও পারেন। ওঁরা তিনজনই শোনা।

বড় ধরনের অভিযোগের সংখ্যা আট। শিকার করা নিষিদ্ধ এমন বন্য প্রাণীর দাঁত এবং ছাল অবৈধভাবে রফতানী, একজন ভদ্রমহিলাকে জিম্মি রাখা, মারণাস্ত্র ছিনতাই, গুরুতর শারীরিক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, খুন করার চেষ্টা, গ্রেফতার এড়াবার জন্যে শক্তি প্রয়োগ, মোটর ভেহিকেল চুরি, সরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন। ছোটোখাটো আরো বারোটা অভিযোগও আছে।

'মাই গড,' সোহানাকে ফিসফিস করে বললো রানা, 'ওরা দেখছি ওকে ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে।'

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' একমত হলো সোহানা। 'আমিও চাই শয়তানটা উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

'দুঃখিত, ডার্লিং,' মৃদু হেসে বললো রানা, 'ওগুলোর একটাও ক্যাপিটাল চার্জ নয়।'

কিন্তু শুনানি চলাকালে কেন যেন বার বার মনে হলো রানার, গোটা ব্যাপারটা স্রেফ একটা প্রহসনের অংশ মাত্র। মাজুলেট যেন পৌরাণিক কাহিনীর একজন বীর, আর নীচ প্রকৃতির কিছু লোক

তাকে অপদস্থ করার জন্যে একজোট হয়েছে।

প্রথম সাক্ষী হিসেবে এলো জেনারেল রট উমাঙ্গো। আসামী পক্ষের উকিল একজন শ্বেতাঙ্গ, ঝানু আইনবিদ, ক্রস এগজামিন করে উমাঙ্গোকে তার জবানবন্দি থেকে এক চুল সরাতে পারলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সাক্ষীর আশায় থাকলেন ভদ্রলোক।

দ্বিতীয় সাক্ষী তেরপল ঢাকা ট্রাকের ড্রাইভার। লোকটা প্রাক্তন ম্যাটাবেল গেরিলা, সম্প্রতি একটা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেয়েছে। সবার আগে এই ড্রাইভারই মাজুলেটকে ডোবালো।

ড্রাইভার জানালো, মাসকয়েক আগে জেনারেল টস মাজুলেটের নির্দেশে অবৈধ হাতি শিকারে অংশগ্রহণ করে সে। প্রায় তিন শো হাতিকে খেদিয়ে মাইনফিল্ডে নিয়ে যায় তারা। হাতিগুলো মারা যাবার পর সেখানে জেনারেল মাজুলেট স্বয়ং একটা সরকারী হেলি-কপ্টার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর সরকারী বাহি-নীর হাতে গ্রেফতার হয় সে, কিন্তু কিছুদিন আগে জেনারেল মাজু-লেট নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। না, পুনর্বাসন কেন্দ্রে ক্যাপ্টেন হোসে ভালডেজ বা থার্ড ব্রিগেডের আর কেউ তার সাথে দেখা করেনি। না, জেনারেল মাজুলেটের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে কেউ তাকে মুক্তি দেয়নি। পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বেরুবার পর তাকে নির্দেশ দেয়া হয় জেনারেল মাজুলেটের সাথে দেখা করার জন্যে। দেখা হলে জেনারেল মাজুলেট তাকে একটা দায়িত্ব দেয়। টুটি মিশন থেকে আইভরি আর চিতার ছালসহ একটা ট্রাক বিমান বন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

রানা লক্ষ্য করলো, জেরার সময় ড্রাইভার একবারও মাজুলেটের

দিকে তাকালো না।

তিনদিন পর সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ালো রানা। শপথ নেয়ার পর অপেক্ষা করছে ও, আসামী পক্ষের উকিল জেরা শুরু করেননি এখনো, এই সময় ডান হাত দিয়ে একটা সংকেত দিলো জেনারেল মাজুলেট।

গেরিলা হিসেবে ট্রেনিং নেয়ার সময় এই পদ্ধতির সংকেত রানাই শিখিয়েছিল মাজুলেটকে। যুদ্ধের সময় বহুবার এই সংকেত ব্যবহার করে বিপদ এড়িয়ে গেছে ওরা। এটা শুধু ওরা দু'জনেই জানে, ওদের এই নিঃশব্দ ভাষা তৃতীয় কেউ বুঝবে না।

ডান হাতটা মুঠো করলো মাজুলেট, চার আঙুলের ভেতর চাপা পড়ে গেল বুড়ো আঙুলটা। এর অর্থ হলো, 'সাবধান। সামনে চরম বিপদ।'

গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। এটা কি একটা হুমকি, না সৎ পরামর্শ? একদৃষ্টে মাজুলেটের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কিন্তু মাজুলেট অন্য দিকে ফিরে আছে, তার চেহারা নির্লিপ্ত। রানা তাকে একটা সংকেত দিয়ে জানতে চাইলো, 'আবার বলো। তোমার সংকেত আমি ধরতে পারিনি।' কিন্তু মাজুলেট ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

প্রশ্ন পর্ব শেষ হতে আসামী পক্ষের উকিল ক্রস এগজামিনের জন্যে উঠলেন, কিন্তু হাত নেড়ে তাঁকে নিষেধ করলো মাজুলেট। 'নো কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ,' বলে বসে পড়লেন শ্বেতাঙ্গ আইনবিদ। জেরার মুখে পড়তে হলো না রানাকে, উইটনেস বক্স থেকে নেমে এলো ও।

এরপর সোহানার পালা। গোড়ালি এখন আর ফুলে নেই, তবু

একটু একটু খোঁড়াচ্ছে সে। জেরার শুরুতেই জিজ্ঞেস করা হলো, জেনারেল মাজুলেট তাকে ধরার পর কি অনুভূতি হয়েছিল তার? সোহানা বললো, মৃত্যুভয় জেগেছিল মনে। এরপর হাসপাতালের রিপোর্ট চাওয়া হলো, এই রিপোর্টে লেখা আছে কোথায়, কি ধরনের আঘাত পেয়েছে সোহানা। এবারও মাজুলেটের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে শ্বেতাঙ্গ উকিল ক্রস এগজামিন থেকে রেহাই দিলো সাক্ষীকে।

পরদিন মাজুলেটের শোফার সাক্ষী দিলো। না, কোথায় যেতে হবে তা তাকে জেনারেল মাজুলেট বলেননি। ডান দিকে বাঁক নাও, বাঁ দিকে ঘোরো, এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার পর থেকে জেলখানায় আছে সে। তার মাথা ফুলে আছে কেন? কেউ কি মেরেছে? আসামী পক্ষের উকিলের এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বলে দাবি করলো পাবলিক প্রসিকিউটর। বিচারক বললেন, সাক্ষী ইচ্ছে করলে এই প্রশ্নের উত্তর না-ও দিতে পারে। এরপর আসামী পক্ষের উকিল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, তাঁর আর কোনো প্রশ্ন নেই। এবার সাক্ষীর সামনে দাঁড়ালো, পাবলিক প্রসিকিউটর। ট্রাকটা তাহলে হেডলাইট জ্বেলে সংকেত দেয় তোমাকে? হ্যাঁ। তারপর কি ঘটলো? জেনারেল মাজুলেট বললেন, ওই আমাদের ট্রাক—একপাশে গাড়ি থামাও!

পাবলিক প্রসিকিউটর বিজয়ীর হাসি হেসে বললো, 'নো ফারদার কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ।'

আবারো লক্ষ্য করলো রানা, সাক্ষী ভুলেও একবার মাজুলেটের দিকে তাকালো না।

এরপর টুটি মিশনের শিক্ষিকা মিরাণ্ডা নয়নির পালা। উইটনেস

বক্সে দাঁড়িয়ে শপথ নিলো সে, তারপর মুখ তুলে কোমল দৃষ্টিতে মাজুলেটের দিকে তাকালো। মাজুলেট হাসলো না, কিন্তু রেলিঙ ধরে থাকা তার ডান হাতটা নিঃশব্দে নড়ে উঠলো। রানা বুঝলো, মেয়েটাকে গোপন সিগন্যাল দিচ্ছে মাজুলেট।

'সাহসে বুক বাঁধো,' সংকেত দিলো মাজুলেট। 'আমি তো এখনো বেঁচে আছি।' মেয়েটার চেহারায় আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো।

শুরু হলো জেরা। জেনারেল মাজুলেটের সাথে আপনার সম্পর্ক কি? পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি। জেনারেল কি প্রায়ই টুটি মিশনে আপনার সাথে দেখা করতে যেতেন? হ্যাঁ। ঘটনার রাতে কি জেনারেলের যাবার কথা ছিলো? ছিলো, আগের দিন ওর সাথে আমার টেলিফোনে কথা হয়। সে-রাতে আপনার সাথে জেনারেলের দেখা করার পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিলো কি? ছিলো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার বাবার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল ও।

এরপর পাবলিক প্রসিকিউটর ক্রস এগজামিন শুরু করলো। আপনি মন্ত্রী মহোদয় জেনারেল মাজুলেটকে কতোটুকু ভালোবাসেন, তাঁর উপকারের জন্যে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন? পারবো। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলতে হলে বলবেন কি? আসামীর উকিল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, পাবলিক প্রসিকিউটর তাড়াতাড়ি বললো, প্রশ্নটা আমি ফিরিয়ে নিলাম। তারপর সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলো সে, যদি বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, টুটি মিশনে একটা গুদামের ব্যবস্থা করবেন আপনি, সেখানে হাতির দাঁত আর চিতার ছাল রাখা হবে, আপনি কি বলবেন? না, এ-ধরনের নির্দেশ ও দিতে পারে না…।

যদি বলা হয়, হাতির দাঁতগুলো আপনি দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাকে তুলতে বলেছেন ? না ! যদি বলা হয়, আপনি জানতেন ট্রাক ভরা হাতির দাঁত ইত্যাদি বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে ? না, এ মিথ্যে ! ও একজন সৎ মানুষ, ওর চরিত্রে কোনো কালিমা নেই…।

'নো ফারদার কোশ্চেন, ইওর লর্ডশিপ,' বললো পাবলিক প্রসি-কিউটর, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার কালো তেল চকচকে চেহারা।

এরপর আসামীর পালা।

প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে প্রশ্ন করা হলো জেনারেল মাজুলেটকে। না, তার কোনো জমিজমা বা বাড়ি নেই। না, তার নিজের গাড়ি নেই, সরকারী গাড়ি ব্যবহার করে সে। না, ফরেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টও নেই। কোরাই রোডে কেন গিয়েছিলেন সে-রাতে ? মিস মিরাণ্ডা আর তার বাবার সাথে দেখা করার জন্যে। টুটি মিশনে আপনি যাবেন, আর কেউ তা জানতো ? ওখানে আমার যাওয়াটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়, ডেস্ক ডায়রীতে লিখে রেখে-ছিলাম। কোথায় সেটা ? নেই, আমার সেক্রেটারী বলছে, ডেস্ক থেকে ওটা গায়েব হয়ে গেছে। রওনা হবার আগে আপনি আপনার শোফারকে বলেছিলেন, কোথায় যেতে হবে ? বলেছিলাম। কিন্তু আপনার শোফার তাহলে অস্বীকার করছে কেন ? হয় ওর স্মরণশক্তি দুর্বল, না হয় কেউ তাকে মিথ্যে কথা বলতে প্ররোচিত করেছে। রওনা হবার পর কি ঘটলো ? কোরই রোডে, রাস্তার একধারে একটা ট্রাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তারপর ? ট্রাকের হেড-লাইট তিনবার নিভলো, তিনবার জ্বললো। সেই সাথে রাস্তার ওপর উঠে এলো ট্রাক। আপনার শোফারকে কি বললেন আপনি ?

বললাম, এক পাশে থামো, কিন্তু সাবধান—এটা একটা অ্যামবুশও হতে পারে। আপনি তাহলে ট্রাকটাকে ওখানে আশা করছিলেন না? না। আপনি কি বলেছিলেন, ওই আমাদের ট্রাক, একপাশে গাড়ি থামাও? না, বলিনি। এটা একটা অ্যামবুশও হতে পারে, এই কথা দিয়ে আপনি আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? বেশ কিছু-দিন থেকেই রাস্তা-ঘাটে সশস্ত্র ডাকাতরা গাড়ি থামাচ্ছিল—বিশেষ করে নির্জন রাস্তায় রাতের বেলা। এরপর কি ঘটলো? আমার গাড়ি থেকে বডিগার্ডরা ট্রাক ড্রাইভারের সাথে কথা বলার জন্যে নেমে গেল। ট্রাক ড্রাইভারকে আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, কিন্তু তাকে আগে কখনো দেখিনি আমি। এরপর কি ঘটলো? হঠাৎ করে আমাদের পিছনে আরো গাড়ি দেখলাম। বুল-হর্ণের আওয়াজ পেলাম, বডিগার্ডদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেণ্ডার করতে বলছে। থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা আমার মার্সিডিজ ঘিরে ফেললো, টেনে-হিঁচড়ে নামানো হলো আমাকে। তাদের কাউকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন? হ্যাঁ, তাদের মধ্যে জেনারেল রট উমাঙ্গো ছিলেন। তাঁকে দেখে নিশ্চই আপনি স্বস্তি বোধ করেন? ঠিক উল্টোটা, আমি বুঝতে পারি, কপালে খারাবি আছে। কেন, এরকম মনে হলো কেন? কারণ জেনারেল উমাঙ্গো এমন একটা কুখ্যাত ব্রিগেডের কমাণ্ডে আছে যে ব্রিগেডের কাজই হলো খ্যাতিমান ম্যাটাবেলদের ধ্বংস করা।

পাবলিক প্রসিকিউটার চিৎকার জুড়ে দিলো, 'আই অবজেক্ট, ইওর অনার! থার্ড ব্রিগেড রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর একটা ইউনিট, এবং জেনারেল রট উমাঙ্গো জনপ্রিয় ও সম্মানী একজন অফিসার...'

বিচারক রাগে কাঁপতে শুরু করলেন। 'প্রখ্যাত একজন মুক্তি-

যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ একজন অফিসারের বিরুদ্ধে ভিত্তি-হীন অভিযোগ এই কোর্ট বরদাস্ত করবে না। আসামী যদি এভাবে কথা বলেন, তাঁকে আমি ঘৃণা ছড়াবার অভিযোগে দোষী বলে রায় দেবো।'

আসামী পক্ষের উকিল আসামীকে আবার জেরা শুরু করলেন। আপনি উপলব্ধি করলেন, আপনার প্রাণ বিপন্ন? হ্যাঁ। ট্রাক থেকে আইভরি আর ফার নামানো হলো, আপনি দেখতে পেয়েছিলেন? হ্যাঁ। আপনার প্রতিক্রিয়া কি হলো? বুঝলাম, এটা আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র। ওরা আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর আপত্তি জানালো।

বিচারক বললেন, 'এরপর আমি আর আসামীকে সাবধান করবো না।'

এরপর ক্রস এগজামিন। মিস সোহানাকে আপনি শুধু জিম্মিই রাখেননি, তাঁকে আপনি আঘাতও করেন—কেন? তিনি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে চেষ্টা করছিলেন, আমি চাইনি পড়ে গিয়ে তিনি আহত হোন। আপনি জেনারেল উমাঙ্গোর দিকে রাইফেল তাক করেছিলেন? হ্যাঁ, রাইফেল তাক করে তাকে আমি হুমকি দিয়েছিলাম এবং তারপর আপনি তার তলপেট লক্ষ্য করে গুলি করেন? না, তাকে লক্ষ্য করে গুলি করিনি। তা করলে তাকে গুলিটা লাগতো।

পরদিন আরো দু'ঘণ্টা ধরে ক্রস এগজামিনেশন চললো। অধি-বেশন মুলতবি করে দিয়ে বিচারক বললেন, 'রায় দেবো আগামী-কাল।'

পরদিন। কোর্ট এলাকা লোকে লোকারণ্য। কোর্টরুমের ভেতর

পিন-পতন স্তব্ধতা। বিচারক তাঁর রায় পড়তে শুরু করলেন।

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না রানা। সারা শরীর শক্ত পাথর হয়ে গেল ওর। প্রতিটি অভিযোগ আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চারণ করলেন বিচারক, সেই সাথে আসামীকে গিল্‌টি বলে রায় দিয়ে শাস্তির মেয়াদ ঘোষণা করলেন। সব মিলিয়ে চল্লিশ বছর জেল খাটতে হবে মাজুলেটকে। অর্থাৎ একটা শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে আরেকটা শাস্তির মেয়াদ শুরু হবে। জেলখানায় মাজুলেট যদি খুব ভালো আচরণও করে, ত্রিশ বছরের আগে বেরুতে পারবে না সে। রায় ঘোষণা শেষ হতে পিছনের আসন থেকে কান্নার রোল উঠলো। ম্যাটাবেল্‌ দর্শকরা বুক চাপড়ে কাঁদছে।

দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো দুঃসংবাদ, কোর্ট এলাকায় দাঙ্গা বেধে গেল। গুলি না চালিয়ে উপায় থাকলো না পুলিশের, ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়লো সতেরো জন ম্যাটাবেল।

রায় ঘোষণার সময় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলো মাজুলেট, তার ঠোঁটে বিদ্রূপ মেশানো এক চিলতে হাসি। রানার সাথে চোখাচোখি হলো তার। মাজুলেটের মুখ থেকে অদৃশ্য হলো হাসি। সংকেত দিলো সে, 'পালাও রানা, তোমার সামনে বিপদ রয়েছে।'

মিরাণ্ডা নয়নি বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালো, শেষ একবার প্রিয়তমকে দেখতে চায়। মাজুলেট কোর্ট রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, মিরাণ্ডার উদ্দেশে শেষ সংকেতটা দিলো সে, 'গা ঢাকা দাও। লুকিয়ে পড়ো। ওরা তোমার ক্ষতি করবে।'

মিরাণ্ডার চেহারা দেখে রানা বুঝলো, মেসেজটা ধরতে পেরেছে সে।

শহরের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, ফলে কারফিউ জারি না

করে উপায় থাকলো না। কোর্ট ভবনে দু'ঘণ্টার মতো আটকে থাকলো ওরা, খবর পেয়ে জেনারেল উমাঙ্গো ওদের জন্য কারফিউ পাস আর থার্ড ব্রিগেডের একটা এসকর্ট পাঠিয়ে দিলো। রাজ-ধানীতে সোহানা একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া নিয়েছে, ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে সরাসরি সেখানে চলে এলো রানা। পথে ওরা কেউ কোনো কথা বলেনি।

'এখন?' জানতে চাইলো সোহানা।

'বুঝলাম না!' অকারণ ঝাঁঝের সাথে বললো রানা।

'অ্যাই!' চোখ পাকালো সোহানা। 'আমি তোমার বন্ধু—চিনতে পারছো না?'

'চল্লিশ বছর!' ফিসফিস করে বললো রানা। 'এ অবিশ্বাস্য! যদি জানতাম...'

'তখনও কিছু করার ছিল না তোমার, এখনও নেই।'

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঘুসি মারলো রানা। 'দ্য পুওর বাস্টার্ড—ফরটি ইয়ারস!'

চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকালো সোহানা, রানার একটা হাত ধরলো। 'আসছো আমার সাথে?' মাথা নাড়লো রানা।

'কিং'স হেভেনে ফিরতে হবে আমাকে। এই শালার মামলার জন্যে ওদিকের কোনো কাজই এগোয়নি।'

'মানে?' বিস্মিত হলো সোহানা। 'এখুনি তুমি রওনা হতে চাইছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'ক'টা দিন আমি একা থাকতে চাই, সোহানা।'

'নিজের ওপর যাতে টরচার চালাতে পারো। কিন্তু তাতো আমি হতে দেবো না। দাঁড়াও, ব্যাগে দু'একটা জিনিস ভরে এখুনি আমি ফিরে আসছি, ইঞ্জিন বন্ধ ক'রো না।' ঘাড় ফিরিয়ে আর্মি জীপটাকে একবার দেখে নিলো সোহানা। 'ওদের বলো, এখান থেকে আমরা নিজেরাই যেতে পারবো, এসকর্ট লাগবে না।'

দীর্ঘ পথে খুব কম কথা বললো ওরা, কিং'স হেভেনে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এরই মধ্যে সোহানার ভক্ত হয়ে গেছে টসনে। মেয়ে আলায়তুনে আর ভাবী পুত্রবধূ নিলিকে ডেকে বললো, মালিক রাঙা বউ নিয়ে এসেছে। নিলি এসে বললো, বিবি সাহেবার জন্যে বাথরুমে গরম পানি দেয়া হয়েছে। বাথরুম থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটু থমকালো সোহানা। টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে রানা, সামনে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। মেহমানদের জন্যে এই শেষ একটা বোতল ছিলো, রানার হুকুম পেয়ে বের করেছে টসনে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে সামনের একটা চেয়ারে বসলো সোহানা। একটা সিগারেট ধরালো রানা। ঢক ঢক করে আধ গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ফেললো।

'রানা,' মৃদু সুরে বললো সোহানা, 'বেশি খেয়ো না।'

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, একটু পর চাঁদ উঠবে। গুলির শব্দ হলো, মনে হলো রাইফেল, কিন্তু বহুদূরে। সোহানার কথা যেন শুনতেই পায়নি ও।

উঠনে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে চিতা আর হায়েনার ডাক। দশ মিনিট চুপচাপ থাকলো সোহানা, ইতিমধ্যে বারতিনেক গ্লাসে চুমুক দিয়েছে রানা। আবার গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালো ও, আরো তিনবার গুলির আওয়াজ হয়েছে।

'না,' বললো সোহানা। 'আর নয়।'

গ্লাসটা ধরেও ছেড়ে দিলো রানা, ফিরিয়ে নিলো খালি হাত। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ও। পায়চারী শুরু করলো। 'কি থেকে কি হয়ে গেল!' বিড়বিড় করে বললো ও।

'পাপ করলে ভুগতে হয়, রানা।'

থমকে দাঁড়ালো রানা। 'তাই বলে চল্লিশ বছর!' আবার পায়-চারী শুরু করলো ও। তারপর সোহানার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো, কণ্ঠস্বরে দ্বিধা আর সংশয়, 'সোহানা, আমরা কোনো ভুল করিনি তো? গোটা ব্যাপারটা সূক্ষ্ম কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো?'

'মামলা চলার সময় এরকম একটা সন্দেহ আমারও যে হয়নি তা নয়,' বললো সোহানা। 'কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটরের ক্রস এগজা-মিন আমার সমস্ত সন্দেহ দুর করে দিয়েছে। মাজুলেট যে অপরাধী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড পেয়েছে সে। চল্লিশ বছর···আমিও আশা করিনি।'

ডিনারের পর আবার ওরা বারান্দায় বসলো। 'আজ রাতে আমি ঘুমাতে পারবো না,' বললো রানা। 'তুমি বাধা না দিলে বোতলটা আমি শেষ করতে চাই।'

'না।' মাথা নাড়লো সোহানা। 'আমি তোমাকে ঘুম পাড়াবো।'

চেয়ার ছাড়লো রানা, টেবিল ঘুরে সোহানার সামনে থামলো। রানার একটা হাত ধরলো সোহানা, দাঁড়ালো। রানার কাঁধে মাথা রাখলো সে, বললো, 'চলো।' তার মুখটা তুলে ধরে আলতো করে চুমো খেলো রানা।

রানার কাঁধে মাথা রেখে এগোলো সোহানা, রানার বেডরুমে

ঢুকলো ওরা। বিছানায় চারটে বালিশ দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকালো রানা, লক্ষ্য করে লজ্জিত একটু হেসে সোহানা বললো, 'আমি না, এ নিশ্চয়ই নিলির কাণ্ড!'

নারীর সমস্ত আদর আর ভালোবাসা দিয়ে রানাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলো সোহানা। রানা হয়তো ঘুমিয়েও পড়তো, কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে মাঝেমধ্যেই গুলির আওয়াজ হলো, চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলো না রানা। মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে টসনের খোঁজ করলো ও।

গুলির শব্দ বহু দূর থেকে এলেও, টসনে আর আলায়তুনে জেগে ছিলো। আলায়তুর্নেকে সোহানার কাছে রেখে টসনেকে নিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো রানা। গ্র্যাসল্যাণ্ডে মেয়েকে নিয়ে কুয়াকোপা, আর তার লোকেরা কেমন আছে দেখে আসবে। ওরা নিশ্চই আতংকের মধ্যে আছে।

জেগেই ছিলো কুয়াকোপা। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। সবাইকে ডেকে যথাসম্ভব আশ্বাস দিলো রানা, বললো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সাথে সাথে তাকে যেন খবর দেয়া হয়।

রাত তিনটের পর গুলির আওয়াজ থামলো। চারটের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো রানা। এতোক্ষণে ঢিল পড়লো সোহানার পেশীতে, বিছানার ওপর বসে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। দরজা খোলাই ছিলো, ভোরের আলো ফুটতে ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকলো টসনে। এক কাপ কফি দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল সে।

সকাল দশটায় ঘুম ভাঙলো রানার। শাওয়ার সেরে ব্রেকফাস্ট করলো ও। কুয়াকোপা আর টসনে এলো কাজের ফিরিস্তি নিয়ে। উঠনে দাঁড়িয়ে থাকলো কুয়াকোপার দলবল। সবাই খুব অস্থির,

উদ্বিগ্ন। রানার মনে হলো, খারাপ কোনো খবর আছে, কিন্তু ওরা তাকে ব্যাপারটা গোপন করে যাচ্ছে। বার বার জিজ্ঞেস করেও লাভ হলো না কোনো। কেউ বলতে পারলো না, বা বললো না কাল রাতে কোথায় গুলি হয়েছে।

আজ কোনো কাজ হবে না বলে ওদেরকে বিদায় করে দিলো রানা। ঠিক করলো, ল্যাণ্ড-রোভার নিয়ে নিজেই দেখতে যাবে প্রতিবেশীদের সবাই নিরাপদে আছে কিনা। কিন্তু বাধা দিলো সোহানা। 'তোমাকে আমি একা ছাড়বো না,' বললো সে। 'সিরি-য়াস কিছু ঘটে থাকলে টিভি আর রেডিওতে নিশ্চয়ই বলতো।'

সন্ধ্যের পর টিভি স্টেশন খুললো। অন্ধকার ঘরে বসে আছে ওরা। সাতটায় শুরু হলো খবর পড়া। প্রথমেই শোনা গেল জেনা-রেল টস মাজুলেটের নাম।

সেটের সামনে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলো ওরা। সোহানার চোখে আতংক, রানার চোখে অবিশ্বাস। খবর পড়া শেষ হতে সেট অফ করে দিলো রানা। টলতে টলতে চেয়ারে ফিরে এলো ও। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে থাকলো ওরা। রানার একটা হাত ধরলো সোহানা, সেটা থরথর করে কাঁপছে। 'ছোট্ট দুটো বাচ্চা—একে-বারে শিশু। ওদের আতংকের কথা কল্পনা করতে পারো।'

'ওদের আমি চিনতাম। বোস বাবু মাটির মানুষ ছিলেন।' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার, বিড়বিড় করে বললো, 'কিন্তু ম্যাটাবেলরা ওদের মারবে কেন? বোস বাবুকে ওরা দেবতার মতো ভক্তি করতো...।'

'এখন বুঝলে তো, জানোয়ারটাকে জেলে ভরে ঠিক কাজই করেছে ওরা।'

মাথা নাড়লো রানা। 'কিছুই বুঝতে পারছি না, সোহানা। নিরীহ মানুষ মেরে কি লাভ ওদের? এ কাজ কেন করলো ওরা?'

'মাসুম বাচ্চা···আই হেট হিম।'

'ওরা তার নাম ব্যবহার করেছে, তারমানে এই নয় যে হুকুমটা মাজুলেট দিয়েছিল। সে হয়তো কিছু জানেই না।' কথাটায় যুক্তি নেই, জানে রানা।

বিড়বিড় করছে সোহানা। 'ছোটোটার বয়স মাত্র পাঁচ!' চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়লো।

'গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।' চেয়ার ছেড়ে আলমিরার সামনে দাঁড়ালো রানা। হুইস্কির বোতলটা বের করে ফিরে এলো সোহানার পাশে। অস্ফুটে কি যেন বলছে সোহানা, বোঝা গেল না। বোতলের ছিপি খুলে মুখটা তার ঠোঁটের কাছে ধরলো রানা। মাথা নেড়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সোহানা, ব্লাউজের হাতা দিয়ে চোখ মুছলো। বোতল থেকে দু'ঢোক হুইস্কি খেলো রানা। 'ম্যাশোনারা ছাড়বে না। ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে শোনা ট্রুপস লেলিয়ে দেয়া হবে। আগুন জ্বলে উঠবে গোটা দেশে।'

ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো সোহানা। 'বর্বরটাকে গুলি করে মারা উচিত!'

আট

অমল বসুর বয়স প্রায় চল্লিশ হলেও, তাঁর চেহারা এবং আচরণে এখনো কিশোরসুলভ ভাব পুরো মাত্রায় বজায় রয়েছে। প্রচুর কায়িক পরিশ্রম করেন তিনি, ফলে শরীরে মেদ জমেনি। কৌতুক-প্রিয় মানুষ, হাসিটি মুখে লেগেই আছে। চল্লিশ বছর আগে এই দেশেই জন্ম তাঁর, বৈধ নাগরিক হিসেবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন। তাঁর বাবা ব্যবসা উপলক্ষে কোলকাতা থেকে এ-দেশে এসেছিলেন, দেশটাকে ভালো লেগে যাওয়ায় আর ফিরে যাননি। বাবা-মা গত হবার পর অমল বসু ভারতীয় বংশোদ্ভুত একটা পরি-বারের একমাত্র মেয়ে মন্দাকিনীকে বিয়ে করেন। মন্দাকিনী লম্বা, কালো, একহারা। খুব কম কথা বলে সে, তার মনের ভাব বুঝতে হলে তাকাতে হবে চোখের দিকে। মায়াভরা চোখ, স্নেহ আর আদর-সোহাগের অফুরন্ত উৎস।

ছোটোখাটো একটা ফার্ম আছে ওদের। ফার্মে যারা কাজ করে তারা সবাই ম্যাটাবেল। কর্মচারী আর শ্রমিকদের সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন অমল বসু, বোস বাবু বলতে তারা অজ্ঞান। এই এলাকায় ওটা একটা জনপ্রিয় নাম।

এক ছেলে, এক মেয়ে, দুজনেই বুলাওয়ায়ো-র একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। মেয়েটি বড়, শোভা। গায়ের রঙ শ্যামলা, গাল দুটো ফোলা ফোলা। নয়নের বয়স পাঁচ, বোনের চেয়ে তিন বছরের ছোটো সে। নয়ন দেখতেও মায়ের মতো, স্বভাবটাও ধীরস্থির। একটু বরং গম্ভীরই বলা যায় তাকে। এতো কম বয়সের ছাত্রকে বোর্ডিং স্কুলে নেয়া হয় না, বড় বোন আছে বলে হেড মিসট্রেস ওর ব্যাপারটা বিবেচনা করেছেন।

প্রতি শুক্রবারে সস্ত্রীক শহরে আসেন বোস বাবু, আটাত্তর মাইল দুর থেকে এসে ছেলে-মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান, সাপ্তাহিক ছুটিটা এক সাথে হৈ-চৈ করে কাটান।

বেলা দুটোয় স্কুল থেকে ছেলেমেয়েকে টয়োটা ট্রাকে তুলে নিলেন বোস বাবু। মেলবোর্ণ হোটেলে লাঞ্চ খাওয়া হলো, বিকেলটা কাটলো শপিং সেণ্টারে কেনাকাটা করে। সামনের হপ্তার জন্যে দু বোতল হুইস্কি, পাইপ টোব্যাকো, আর এক জোড়া রুমাল কিনলেন বোস বাবু। মন্দাকিনী নিজের জন্যে কিছু কিনলো না, শুধু মেয়েটার জন্যে এক জোড়া ফ্রক আর স্বামীর জন্যে একটা হ্যাট কিনলো। জানে, হ্যাটের প্রতি দুর্বলতা আছে বোস বাবুর, কেউ উপহার দিলে ভারি খুশি হন।

চারটের দিকে সবাই আলাদা হয়ে গেল। বোস বাবু গেলেন ম্যাটাবেল ফার্মার'স ইউনিয়নে, ইউনিয়নের কমিটিতে আছেন তিনি। মন্দাকিনী টিকেট কেটে ছেলে আর মেয়েকে তাঁবুর ভেতর বসিয়ে দিলো, ঘণ্টাখানেক সার্কাস দেখবে ওরা। তারপর নিজে ঢুকলো একটা বিউটি পারলারে, চুল বাঁধবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ইউনিয়নের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন

বোস বাবু। মনটা খুশি, সেক্রেটারী আর সদস্যদের সাথে দরকারী কিছু আলাপ সেরে নিয়েছেন। টয়োটা ট্রাকের কাছে এসে দেখেন তাঁর ম্যাটাবেল কর্মচারী এবান একজন শ্রমিকের সাথে মালপত্তর তুলছে। স্পেয়ার পার্টস, ক্যাটল মেডিসিন, রঙের কৌটা ইত্যাদি রাজ্যের জিনিস। ওদের কাজ শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েকে নিয়ে হাজির হলো মন্দাকিনী।

হ্যাটটা ভালো করে মাথায় বসিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন বোস বাবু, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছেন ব্রায়ার পাইপটা। স্ত্রীকে কুর্ণিশ করলেন তিনি, বললেন, 'মাফ করবেন, মিস, মিসেস বোসকে আশপাশে কোথাও দেখেছেন নাকি?' এটা তাঁর একটা প্রিয় কৌতুক, মন্দাকিনীর চোখ দুটো হেসে উঠলো। মাথাটা একটু ঘোরালো সে, স্বামী যাতে তার নতুন বাঁধা চুলের বাহার দেখতে পায়।

বাবার হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে হাত বাড়ালো নয়ন, কিন্তু বড় বোন শোভাও হাত বাড়িয়েছে লক্ষ্য করে পিছিয়ে এলো সে, গম্ভীর সুরে বললো, 'লেডিজ ফার্স্ট।'

বাবার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো শোভা, তারপর ছোটো ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিলো। বাবার অনুকরণে শোভাকে কুর্ণিশ করলো নয়ন। 'ধন্যবাদ।'

নয়ন ছোটো বলে ট্রাকের ক্যাবে, মা-বাবার মাঝখানে বসলো। শোভা বসলো পিছনে, ম্যাটাবেল দু'জনের সাথে। সোয়েটারটা গা থেকে খুলে কোমরে বেঁধে রেখেছে শোভা, মা তাকে সতর্ক করে দিলো, 'এটা পরে নাও, মা, বাড়ি ফিরতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

প্রথম ষাট মাইল মেইন রোড ধরে ছুটলো গাড়ি, তারপর বাঁক

নিয়ে মেটো পথ। খানিক পর ট্রাক থামলো, লাফ দিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে গেট খুলে দিলো এবান। আবার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সকৌতুকে বোস বাবু বললেন, 'বুঝলে, মা-মণি, বাড়ি ফিরে আমরা দেখবো··· বলোতো, কি দেখবো?' প্রতি হপ্তায় ছেলে আর মেয়ের জন্যে কিছু প্রেজেন্টেশন কেনেন তিনি, কিন্তু বাড়িতে ফেরার আগে সেগুলো কাউকে দেখান না।

ট্রাকের পিছন থেকে শোভা বললো, 'বাঘ।'

'হোয়াট!' তাজ্জব বনে গেলেন বোস বাবু। পর মুহূর্তে হুংকার ছাড়লেন তিনি, 'এবান!'

'আমি কিছু বলিনি, বাবু,' হাসি চেপে জবাব দিলো এবান।

'এখানে বেশ বড় একটা খাঁচা দেখছি,' বললো শোভা, 'কাপড় দিয়ে ঢাকা। মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছি, ওতে বাঘের বাচ্চা···'

পাঁচ বছরের নয়ন কচি গলায় একটা আওয়াজ ছাড়লো, 'গুড়ুম!'

মন্দাকিনী ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেলো। 'তার-মানে?'

'বাঘকে আমি গুলি করে মেরে ফেলবো!'

আচমকা চারদিক অন্ধকার করে নেমে এলো আফ্রিকান রাত। বোস বাবু হেডলাইট জ্বেলে দিলেন। ফার্ম এলাকায় ঢুকে ট্রাকের গতি মন্থর করলেন তিনি। উজ্জ্বল আলোয় মোটাসোটা ষাঁড়গুলোর চকচকে চোখ দেখা গেল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে ওগুলোর গন্ধ ভাসছে। 'সব শুকিয়ে যাচ্ছে,' বললেন বোস বাবু। 'বৃষ্টি দরকার।'

ছেলেকে বুকের আরো কাছে টেনে নেয় মন্দাকিনী, নয়ন ঘুমিয়ে পড়েছে।

'পৌঁছে গেছি,' বললেন বোস বাবু। 'নকসি ল্যাম্প জ্বেলে অপেক্ষা

করছে।'

গত দশ বছর ধরে একটা ইলেকট্রিক জেনারেটর কেনার স্বপ্ন দেখছেন বোস বাবু, কিন্তু হাতে টাকা এলেই আরো জরুরী কোনো কাজে সেটা খরচ হয়ে যায়। কাজেই এখনো ওদেরকে গ্যাস আর প্যারাফিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে ল্যাম্পের আলো, বার বার হারিয়ে গিয়ে ওদের সাথে যেন লুকোচুরি খেলছে।

পিছনের বারান্দার পাশে ট্রাক থামালেন বোস বাবু, হেডলাইট আর ইঞ্জিন বন্ধ করলেন। ছেলেকে বুকে নিয়ে নামলো মন্দাকিনী। ঘুমের মধ্যে মুখের ভেতর বুড়ো আঙুল পুরে চুষছে নয়ন। তার জুতো জোড়া রয়ে গেছে ট্রাকে, খালি পা দুটো দুলছে।

ট্রাকের পিছন দিকে এসে শোভাকে কোলে করে নামালেন বোস বাবু। 'এবান, তোমরা এবার যেতে পারো। মালপত্তর সব কাল সকালে নামাবো আমরা। গুডনাইট।'

শোভার হাত ধরে স্ত্রীর পিছু পিছু বারান্দার দিকে এগোলেন বোস বাবু, কিন্তু বারান্দায় ওঠার আগেই চোখ ধাঁধানো টর্চের আলো এসে পড়লো ওদের ওপর, চারজনের দলটা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'কে ওখানে?' চোখের সামনে একটা হাত তুলে জানতে চাইলেন বোস বাবু, ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করছেন। শোভার কব্জিটা আরো জোরে চেপে ধরলেন তিনি।

চোখে আলো একটু সয়ে এলো, টর্চের পিছনটা দেখতে পেলেন তিনি। হঠাৎ করেই স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে তাঁর মনে ভয় ঢুকলো। অসুস্থ বোধ করলেন। বারান্দায় তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি, ব্লু ডেনিম জিনস আর জ্যাকেট

পরে আছে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ-কে ফরটিসেভেন রাইফেল। রাইফেলগুলো ছোট্ট দলটার দিকে তাক করা। চট করে পিছনটা একবার দেখে নিলেন বোস বাবু। পিছনে আরো লোক রয়েছে, ক'জন ঠিক বুঝতে পারলেন না। অন্ধকার থেকে পাঁচ-সাতজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, এবান আর তার সহকারীকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে নিয়ে আসছে।

'ওরা কারা, বাবা?' জিজ্ঞেস করলো শোভা, ভয়ে গলার আওয়াজ ভালো করে ফুটলো না। সন্দেহ নেই, জানে সে। টেলিভিশনে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি দেখেছে।

'কেউ ভয় পেয়ো না,' কথাটা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন বোস বাবু, মন্দাকিনী স্বামীর গায়ের সাথে আরো একটু সেঁটে এলো। মায়ের কোলে নয়ন এখনো ঘুমাচ্ছে, আঙুল মুখের ভেতর।

বোস বাবুর শিরদাঁড়ার ওপর একটা রাইফেলের মাজল ঠেকলো, শিউরে উঠলেন তিনি। তাঁর হাত দুটো ধরে পিছনে নিয়ে যাওয়া হলো, বেঁধে ফেলা হলো কব্জি দুটো এক করে। গ্যালভানাইজড তার ব্যবহার করলো ওরা। চামড়া কেটে মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে গেল তার। এরপর ওরা মায়ের কোল থেকে নয়নকে টেনে নিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিলো। চোখে এখনো ঘুম রয়েছে বাচ্চাটার, পা টলছে, টর্চের আলোর দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার বন্ধ করে ফেলছে চোখের পাতা, আঙুলটা এখনো মুখের ভেতর। পিছমোড়া করে মন্দাকিনীর হাত দুটোও বাঁধলো ওরা। তারটা মাংসের ভেতর ডেবে যেতে একবার শুধু ফুঁপিয়ে উঠলো সে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো। এরপর হাতে তার নিয়ে দু'জন

লোক বাচ্চাদের দিকে এগোলো।

'কচি বাচ্চা ওরা,' সিনডেবেল ভাষায় বললো বোস বাবু, 'প্লিজ, ওদেরকে বেঁধো না। আমার বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি করো না।'

'চোপ শালা, বানচোত!' একই ভাষায় গর্জে উঠলো ওদের এক-জন, নয়নের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসলো সে।

'বাবা, লাগছে!' কেঁদে উঠলো নয়ন। 'পাজি, বিল্লি, হুতোম প্যাঁচা। বাবা, ওকে বকে দাও!'

'সাহস ধরো, নয়ন,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বোস বাবু, বোকা লাগলো নিজেকে। অসহায়ত্বের জন্যে নিজেকেই তিনি ঘৃণা করছেন। 'এখন তুমি আর ছোটো নও।'

অপর লোকটা শোভার পিছনে দাঁড়ালো।

'আমি কাঁদবো না,' কথা দিলো শোভা, কান্না চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে: 'তুমি চেয়ে থাকো, বাবা, দেখো আমার কতো সাহস।'

'এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে,' বললেন বোস বাবু, লোকটা শোভাকে বেঁধে ফেললো।

'হাঁটো!' হাতের টর্চ নেড়ে বললো তৃতীয় লোকটা। বোঝা যায়, সে-ই লিডার। বাচ্চাদের পিঠে রাইফেলের ব্যারেল ঠেকিয়ে ধাক্কা দিলো সে।

হোঁচট খেয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল নয়ন। পিছনে হাত দুটো বাঁধা, চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারলো না। ধাপের ওপর অস-হায়ভাবে মোচড় খেতে লাগলো সে।

'ইউ বাস্টার্ড,' বিড়বিড় করে বললেন বোস বাবু। 'ইউ ফিলথি বাস্টার্ড!'

ওদের একজন নয়নের মাথার চুল খামচে ধরে তাকে দাঁড় করালো। টলতে টলতে বোন শোভার দিকে এগোলো সে, শোভা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

'ছেলেমানুষি করে না, নয়ন,' তাকে বললো শোভা। 'এতো এক ধরনের খেলা, তুমি জানো না?' যদিও আতংকে কেঁপে গেল তার গলা, চোখ দুটো বিশাল, কানায় কানায় পানি।

ছেলেমেয়েদের পাশে মা-বাবাকেও দাঁড় করালো ওরা। পালা করে চারজনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলা হলো। উঠনে কি ঘটছে ওদেরকে দেখতে দিতে চায় না'।

'কেন?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলেন বোস বাবু। 'কি করেছি আমরা? আমাদের যা আছে সব নিয়ে যাও…।'

ঠাস করে একটা চড় খেলেন বোস বাবু। কোনো উত্তর নেই। শুধু এক দুই সেকেণ্ড পর পর টর্চের উজ্জ্বল আলো পড়ছে মুখে। শব্দ বলতে নয়নের গলার ভেতর চাপা কান্না। অন্ধকার উঠনে নারী-পুরুষ-শিশু, অনেক মানুষের ফিসফিসানি।

'দেখার জন্যে আমাদের সব লোকদের নিয়ে এসেছে ওরা,' নরম গলায় এই প্রথম কথা বললো মন্দাকিনী। 'ওগো, ওদের বলো, সবার আগে আমাকে যেন গুলি করে।' ছেলেমেয়েরা কেউ তার কথা শুনতে পেলো না।

কি বলবেন ভেবে পেলেন না বোস বাবু। স্ত্রীর ভয়টা যে মিথ্যে নয়, এটুকু তিনিও বুঝতে পেরেছেন, ওদেরকে মারতেই এসেছে লোকগুলো। 'তোমাকে ভালোবাসি, কথাটা আরো অনেকবার বলিনি কেন?' বোকার মতো আক্ষেপ করলেন তিনি।

'সে তো আমি জানিই,' ফিসফিস করে বললো মন্দাকিনী। 'তুমি

ভালো না বাসলে আমি এতো সুখী হলাম কি করে।'

টর্চের আলো ঘুরে গেল উঠনের দিকে। উঠনে ষাট সত্তর জন ম্যাটাবেল ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এই ফার্মেরই কর্মচারী বা শ্রমিক, বোস বাবু বলতে অজ্ঞান।

ভিড়ের ওপর টর্চের আলো ফেলে লিডার সিনডেবেল ভাষায় শুরু করলো, 'এখানে যাদের বাঁধা হয়েছে, এরা ম্যাশোনা খুনীদের দালাল, এতোদিন গরীব ম্যাটাবেলদের রক্ত পান করেছে।'

উঠনে পিন-পতন স্তব্ধতা।

'আমাদের নেতা টস মাজুলেটকে এরাই ম্যাশোনা কুকুরদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

'মা, শোভা!' কাতর কণ্ঠে ডাকলেন বোস বাবু। 'বাবা, নয়ন!'

'তোমার পায়ে পড়ি!' চাপা গলায় ফুঁপিয়ে উঠলো মন্দাকিনী। কিন্তু সে কি বলতে চায় বোঝা গেল না।

'তোমরাই বলো, এদের নিয়ে কি করবো আমরা?' কর্কশ সুরে জানতে চাইলো লিডার।

'খুন করো!' লিডারের বাঁ পাশ থেকে তারই একজন লোক চিৎকার করে বললো, কিন্তু উঠনের লোকজন কেউ মুখ খুললো না। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে উঠনে নামলো লিডার। ম্যাটাবেলদের মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলো সে, 'বলো, এদের নিয়ে কি করবো? বলো? বলো!'

সবাই চুপ।

রাইফেলের বাঁট দিয়ে সামনে যাকে পেলো তাকেই গুঁতো মারলো লিডার। ব্যথায় ককিয়ে উঠলো আহত ম্যাটাবেলরা।

'বলো ! কি করবো ? এদের নিয়ে কি করবো ?' বার বার সেই একই প্রশ্ন।

'এবার উত্তর না পেলে গুলি।' দাঁতে দাঁত চাপলো লিডার। 'বলো, এই বেঈমানদের নিয়ে আমরা কি করবো ?'

'খুন করো।' অবশেষে জবাব মিললো। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রথমে একজন বললো কথাটা।

'আবার বলো, কি করবো ?'

'খুন করো।' এবার একাধিক ম্যাটাবেল চিৎকার করলো।

'কি করবো ?'

'খুন করো।' ভিড়ের মধ্যে থেকে বহু লোকের গলা পাওয়া গেল। 'খুন করো। খুন করো।'

'ও আমার নয়ন রে।' ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রৌঢ় এক মেয়েলোক বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলো। তাকে চিনতে পারলো মন্দাকিনী, নয়নের আয়া। কিন্তু তার কান্না ম্যাটাবেলদের উন্মত্ত চিৎকারে চাপা পড়ে গেল। 'খুন করো। খুন করো। খুন করো।'

দু'জন লোক টর্চের আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো, দু'জনেই ডেনিম পরে আছে। বোস বাবুকে ধরে ঘোরালো তারা, দেয়ালের দিকে মুখ করে, তারপর কাঁধে চাপ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করলো।

হাতের টর্চ নিজের একজন লোকের হাতে ধরিয়ে দিলো লিডার, জিনের বেল্ট থেকে বের করলো পিস্তলটা। স্লাইড টেনে ভেতরে এক রাউণ্ড গুলি ভরলো সে। বোস বাবুর ঘাড়ের পিছনে মাজল ঠেকিয়ে একটা মাত্র গুলি করলো, সামনের দিকে ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়লেন বোস বাবু। খুলির ভেতর থেকে হলুদ মগজ

ছুটে গিয়ে সাদা দেয়ালে মাথামাখি হয়ে গেল, তারপর তরল ঘির মতো গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

'ম্-মা!' সাহসিনীর ভূমিকায় শোভার করুণ অভিনয়ে ইতি ঘটলো, দ্বিতীয় বুলেটটা মায়ের কপাল ফুটো করে বেরিয়ে আসতে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, মুখ থুবড়ে পড়লো বারান্দার মেঝেতে। নরম ছল ছল শব্দে বমি শুরু করলো সে।

এক পা এগিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো লিডার। শোভার কপাল মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে, চুলের ছোট্ট দুটো বেণী দুই কানের পিছনে ঝুলে আছে, উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে ঘাড়ের পিছনটা। লিডার তার ডান হাত সবটা লম্বা করে দিলো, শোভার মাথা আর ঘাড়ের মাঝখানের নরম জায়গাটায় পিস্তলের মাজল ঠেকালো। ঝাঁকি খেলো হাতটা, টর্চের আলোয় নীলচে ধোঁয়া দেখা গেল।

নয়নই শুধু ধস্তাধস্তি করলো ওদের সাথে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তাকে একটা বাড়ি মারলো লিডার। তবু বোনের রক্তের ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো অবোধ শিশু। তার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একটা পা রাখলো লিডার। নয়নের কপাল ফুটো করে বেরিয়ে এলো বুলেট, ঠিক ডান কানের সামনে দিয়ে। মেঝেতে ছোট্ট একটা গর্ত করলো বুলেটটা, তাজা রক্তে দ্রুত ভরে উঠলো সেটা।

ঝুঁকে গর্তের ভেতর আঙুল ডোবালো লিডার। সাদা দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখলো সে—টস মাজুলেট দীর্ঘজীবী হোন।

বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে, চিতার মতো, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল লিডার। লাইন ধরে সঙ্গীরা অনুসরণ করলো তাকে।

বুধবারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মুগাবে। 'আমি

কথা দিচ্ছি, তথাকথিত বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হবে।'

টেলিভিশনের পর্দায় স্থির হয়ে আছে দু'জনের চোখ। রানার হাতে কফির কাপ, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কফি, চুমুক দিতে ভুলে গেছে। বিড়বিড় করে সোহানা বললো, 'প্রাইম মিনিস্টারকে কেমন বুড়ো দেখাচ্ছে।'

'এই ক'দিনে কয়েক হাজার লোক মারা গেছে, তাই না?'

'আর্মি আর পুলিশ ফোর্সকে আমি অর্ডার দিয়েছি, বিদ্রোহীদের প্রতিটি আস্তানা খুঁজে বের করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে ওরা। শুধু বিদ্রোহীদের নয়, তাদের যারা সাহায্য করছে তারও কেউ রেহাই পাবে না। দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, আর্মি এবং পুলিশের সাথে আপনারা সহযোগিতা করুন...।'

হপ্তা ঘুরে আবার শুক্রবার এসে পড়লো। কিং'স হেভেনের জন্যে শুক্রবার মানে বাজার করার দিন, সেই সাথে বুলাওয়ায়ো-তে বেড়ানোরও একটা সুযোগ। সেদিন বেশ সকাল সকাল সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রানা, ওদের পিছু পিছু চললো নতুন পাঁচটনী ট্রাকটা। ট্রাকের ওপর গিজ গিজ করছে ম্যাটাবেলদের মাথা, ওরা সবাই রানার গ্রাসল্যাণ্ডের লোক, র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করে। বিনা পয়সায় শহরে বেড়াবার সুযোগটা হাতছাড়া করে না কেউ। যে যার সেরা কাপড় পরে চলেছে, পিকনিক পার্টির মতো হাসি-আনন্দে মাতোয়ারা সবাই।

থাবাস ইনডুনাস ক্রস রোডের খানিক আগে রোডব্লকের সামনে পড়লো রানা। যানবাহনের লম্বা একটা লাইন দেখা গেল, বেশির ভাগ গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরছে।

'দেখে আসি কি ব্যাপার,' সোহানাকে বলে ল্যাণ্ড-রোভার থেকে

নামলো রানা। দ্রুত পা চালিয়ে লাইনের শেষ মাথায় চলে এলো ও।

এ রোডব্লক সাধারণ বা সাময়িক কোনো ব্যাপার নয়। হাইওয়ের দু'দিকে বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা শেলটারে পজিশন নিয়ে রয়েছে সৈনিকরা, ঘেরের ভেতর হেভী মেশিনগান, বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচি-লের মাথার কাছে উঁকি দিচ্ছে কালো রঙের ব্যারেল। পাঁচিলের মাঝামাঝি জায়গায় ফুটো দেখা গেল, লাইট মেশিনগানের ব্যারেল বেরিয়ে আছে। ব্যারেলের পিছনে লালচে বেরেট পরা সৈনিকদের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়।

রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে কংক্রিট ভরা ড্রাম ফেলে, তার সাথে রয়েছে কাঁটা বসানো লোহার পাত। ব্যারিকেডের দু'ধারে টহল দিচ্ছে রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ পরা থার্ড ব্রিগেডের সৈনিকরা। ডোরাকাটা ক্যামোফ্লেজ ব্যাটল-জ্যাকেটে বাঘের মতো লাগছে ওদেরকে।

'কি ব্যাপার, সার্জেন্ট?' ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রাস্তা বন্ধ,' বিনয়ের সাথে বললো সার্জেন্ট। 'শুধু মিলিটারী-পারমিট হোল্ডাররা আসা-যাওয়া করতে পারবে।'

'কিন্তু আমাদের যে শহরে যেতে হবে।'

'আজ নয়।' মাথা নাড়লো লোকটা। 'দেশী-বিদেশী কারো জন্যেই আজ নিরাপদ নয় বুলাওয়ায়ো।'

যেন সার্জেন্টের কথায় সায় দিয়েই শহরের দিক থেকে গুলি-বর্ষণের আওয়াজ ভেসে এলো। ঘাড়ের পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেল রানার। গুলির এই আওয়াজ চেনে ও। অটোমেটিক রাইফেল।

'বাড়ি ফিরে যান, সাহেব,' নরম সুরে বললো সার্জেন্ট। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও বিশেষ নিরাপদ বলে মনে করি না।'

হঠাৎ করেই ট্রাক ভরা লোকজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করলো রানা। ওদেরকে কিং'স হেভেনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ছুটে ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে চলে এলো ও। ক্যাবে উঠে গাড়ির মুখ ঘোরালো।

'কি হলো, রানা?'

'যা ভয় করেছিলাম,' গম্ভীর সুরে বললো রানা। 'ব্যাপারটা বোধহয় শুরু হয়েছে।' অ্যাকসিলারেটরের ওপর পা চেপে ধরলো ও।

খানিক দূর যেতেই ট্রাকটাকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ম্যাটাবেল মেয়েরা গান ধরেছে, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে পুরুষরা, বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে ওদের রঙচঙে কাপড়। হাত দেখিয়ে ট্রাকটাকে থামালো রানা, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রানিং বোর্ডে। বুড়ো কুয়াকোপা, রানার দেয়া কালো স্যুট পরে ড্রাইভারের পাশে সম্মানের আসনে বসে আছে। 'ট্রাক ঘোরাও,' নির্দেশ দিলো রানা। 'কিং'স হেভেনে ফিরে চলো সবাই। শহরে ভীষণ গণ্ডগোল। যতো দিন না সব ঠাণ্ডা হয় কিং'স হেভেন থেকে কেউ বেরুতে পারবে না।'

'গণ্ডগোল? কারা গণ্ডগোল করছে? নিশ্চই ম্যাশোনা সোলজাররা?'

'তা জানি না,' বললো রানা। 'তবে রোডব্লকে ওদেরকেই দেখলাম।'

'গু-খেকো বেজন্মার দল!' থো করে থুথু ফেললো কুয়াকোপা।

'আমার অনুরোধ, গুজবে কান দেবেন না,' টেলিভিশনে বক্তৃতা দিচ্ছেন আইনমন্ত্রী। 'সেনাবাহিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করছে, এটা দুষ্কৃতকারীদের জঘন্য মিথ্যে প্রচারণা মাত্র। এ-কথা সত্যি যে বিদ্রোহী ম্যাটাবেল আর সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় মাঝখানে পড়ে গিয়ে দু'একজন লোক হতাহত হয়েছে। তাই বলে হাজার হাজার! হাহ্‌ হা হাহ্‌ হা! হাজার হাজারই যদি মারা যায়, লাশগুলো কোথায় দেখতে পারি?...'

সেট অফ করে দিলো রানা। 'হারারে থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না,' সোহানাকে বললো ও। রিস্টওয়াচ দেখলো। 'প্রায় আটটা—বি. বি. সি. কি বলে শোনা যাক।'

বি. বি. সি. খবর দিলো, ম্যাটাবেলিল্যাণ্ড থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে বের করে দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে পিল পিল করে ম্যাটাবেল উপজাতির লোকরা ঢুকে পড়ছে। একজন রিফিউজির উদ্ধৃতি দেয়া হলো, 'ম্যাটাবেল পেলেই খুন করছে থার্ড ব্রিগেডের সৈন্যরা। যাকে পাচ্ছে তাকেই।'

ভয়েস অভ আমেরিকা ধরলো রানা। জাপু পার্টির নেতা নকোমো প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানায় পালিয়ে এসেছেন। 'ওরা আমার ড্রাইভারকে গুলি করে মেরেছে,' ভোয়া-র আঞ্চলিক রিপোর্টারকে জানিয়েছেন তিনি। 'মুগাবে আমাকে খুন করতে চায়।' সম্প্রতি জাপু পার্টির প্রভাবশালী অন্যান্য নেতাদের জেলে ভরার ফলে মিঃ নকোমোই ছিলেন ম্যাটাবেলদের একমাত্র নেতা এবং মুখপাত্র। ইতিমধ্যে মুগাবে সরকার পুরোদস্তুর নিউজ ব্ল্যাকআউট আরোপ করেছেন, দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তরফ থেকে পর্য

বেক্ষক পাঠাবার প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেছে হারারে।

'এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি কিছুই করার নেই, রানা?' জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'সময়ই তা বলে দেবে,' চিন্তিত দেখালো রানাকে। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, তার আর বেশি দেরিও নেই।'

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর গ্রাসল্যাণ্ডে যাবার জন্যে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো ওরা, নিলির কাছে যাবে। সোহানার জন্যে কেনা উপহারটা নিলির কাছে গচ্ছিত রেখেছে রানা, শেষ মুহূর্তে সোহানাকে চমকে দেবে বলে। সোহানার আজ জন্মদিন।

উপহার দেখে কচি খুকীর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সোহানা। 'ইস, কি সুন্দর! নরম তুলতুলে!' ছোট্ট ছানাটাকে তুলে নিয়ে তার ঠোঁটে চুমো খেলো সোহানা, প্রতিদান হিসেবে সে-ও সোহানার নাক চেটে দিলো।

'বয়স হলে ও একটা বাঘা কুকুর হবে।'

তার গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা আর কুচকুচে কালো, চামড়ার খোলসটা এতো বড় যে আরো একটা ছানা অনায়াসে ঢুকে যাবে ভেতরে। 'দেখো দেখো, কি রকম থাবা দেখো! ছ'মাসেই একটা দানব হয়ে উঠবে। কি নাম রাখা যায় বলো তো?' রানা কিছু বলার আগেই হেসে উঠলো সে। 'কি যেন বললে? বাঘা? ওয়াণ্ডারফুল!'

আজ সবার ছুটি, আগেই জানিয়ে দিয়েছে রানা। ল্যাণ্ড-রোভারে বাঘা আর পিকনিক বাস্কেট নিয়ে কুইন'স হেভেনে চলে এলো ওরা। বনের ভেতর, লেকের ধারে চাদর বিছানো হলো। মাথার

ওপর কাঠ-ঠোকরা পাখিদের চঞ্চল ছুটোছুটি, ঝোপের ভেতর পাখা ঝাপটাচ্ছে বনমোরগ, লেকের পানিতে বুনো হাঁস। বাস্কেটে সাদা ওয়াইনের একটা বোতল ভরে দিয়েছে টসনে। অনেকক্ষণ ধরে ফড়িংগুলোকে ব্যর্থ তাড়া করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো বাঘা, চাদরের ওপর সোহানার পাশে নেতিয়ে পড়লো। লাঞ্চ শেষ করলো ওরা, তারপর ছোট্ট একটা ঘুম দিলো। বিকেলের নিস্তেজ রোদে পাশা-পাশি শুয়ে গল্প করলো। এক সময় দু'জনেই আবিষ্কার করলো, সব কথা ফুরিয়ে গেছে। দুষ্ট বুদ্ধি ঢুকলো মাথায়। চোখ বুজে ছিলো রানা, তার নাকে ঘাসের একটা ডগা ঢুকিয়ে দিলো সোহানা। তার হাতটা খপ করে ধরে ফেললো রানা, তারপর বিকট শব্দে একটা হাঁচি দিলো। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল বনমোরগ আর কাঠ-ঠোকরার ঝাঁক।

শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। এবং যা হয়, পুরুষের বাহুবন্ধনে আটকা পড়লো নারী।

'এই আস্তে,' ফিসফিস করে বললো সোহানা, 'বাঘার ঘুম ভাঙিয়ো না!'

ঘুম ভাঙলো গুলির শব্দে।

পুরোপুরি সজাগ হবার আগেই, ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা রিফ্লেক্স বিছানা থেকে নামিয়ে দিলো রানাকে। আওয়াজ-গুলো অটোমেটিক রাইফেলের, সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ, খুব কাছ থেকে আসছে। সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ মানে দক্ষ, ট্রেনিং পাওয়া রাইফেলধারী ওরা। পাহাড় থেকে নেমে এসে ওরা সম্ভবত এরই মধ্যে ফার্মের গ্রামে, অর্থাৎ গ্রাসল্যাণ্ডে অথবা ওঅর্কশপে পৌঁছে গেছে। দূরত্বটা

আন্দাজ করে শিউরে উঠলো রানা। র‍্যাঞ্চের লোকজনদের কথা ভেবে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ওর।

তারপরই সোহানার কথা ভাবলো। জানালার কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলো বিছানায়। সোহানাকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু ঝাঁকি দিলো।

সোহানা নগ্ন, ঘুমের ভেতর তলিয়ে আছে। দ্বিতীয়বার ঝাঁকি খেয়ে একবার চোখ মেললো সে। বিড়বিড় করে বললো, 'ন্না।' তারপর পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করলো।

'বিপদ,' ফিসফিস করে বললো রানা।

মুহূর্তে সজাগ হলো সোহানা। ঝট্ করে উঠে বসার চেষ্টা করলো, হাতটা বালিশের তলায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু রানা তাকে বুকের সাথে ধরে রাখলো। 'বিছানায় বসো না,' সতর্ক করে দিলো ও। 'বাইরে থেকে দেখা যাবে।' বালিশের তলা থেকে খালি হাতটা ফিরিয়ে আনলো সোহানা, মনে পড়ে গেছে ওখানে কোনো অস্ত্র নেই। পায়ের কাছ থেকে তুলে গাউনটা সোহানার বুকে রাখলো রানা। 'তাড়াতাড়ি পরে নাও এটা।'

সোহানা কাপড় পরছে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কাঠ কাটার কুঠার আর কিচেন নাইফ ছাড়া বাড়িতে কোনো অস্ত্র নেই। নেই বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ফল-ব্যাক পজিশন।

রাইফেলের আরো একটা বিস্ফোরণ হলো। কেউ চিৎকার করলো —মেয়েলি কণ্ঠস্বর—কিন্তু অস্পষ্ট আওয়াজটা হঠাৎ করেই আবার থেমে গেল। গুলি করার পর বেয়নেট চার্জ করছে ওরা?

'কি ঘটছে? কারা ওরা?' তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে জানতে চাইলো

সোহানা। চেহারায় সতর্কতা, কিন্তু ভয়ের কোনো ভাব নেই। 'বিদ্রোহী ম্যাটাবেল নাকি?'

'জানি না,' গম্ভীর গলায় বললো রানা। জানার জন্যে অপেক্ষা করা নেহাতই বোকামি হবে, উপলব্ধি করলো ও। এই মুহূর্তে প্রাণ নিয়ে পালানো উচিত ওদের। কিন্তু কুয়াকোপা, টসনে, নিলি, আলায়তুনে, ওদের সবার প্রতি ওর একটা দায়িত্ব আছে। ওদেরকে বিপদের মুখে ফেলে লেজ তুলে পালানোর কথা ভাবতেও পারছে না।

তবে বাঁচতে হলে পালাতে হবে, আগে হোক বা পরে। সবচেয়ে ভালো বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়া। কিন্তু তা করতে হলে একটা ডাইভারশন দরকার।

'অপেক্ষা করো,' নির্দেশ দিলো ও। 'জুতো পরে তৈরি থাকবে, বললেই যেন ছুটতে পারো। আমি চলে গেলে কাউকে যদি আসতে দেখো, একাই পালাবে—জঙ্গলে।' জানে, বিপদসংকুল জঙ্গলেও, অস্ত্র ছাড়াই, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে সোহানা।

'গ্রাসল্যাণ্ডে যাচ্ছো,' রানার পথ আগলে ধরলো সোহানা। 'খালি হাতে তোমাকে আমি যেতে দেবো না।'

'কে বললো তোমাকে ওদের সামনে পড়বো আমি?' ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ল্যাণ্ড-রোভারের চাবিটা আছে কিনা দেখে নিলো ও। খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো প্যাসেজে। টেলিফোন নিয়ে দশ সেকেণ্ড অপব্যয় করলো—আগেই আন্দাজ করেছিল, তার কেটে দিয়েছে ওরা। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে কিচেনের দিকে ছুটলো।

প্রতিপক্ষের দৃষ্টি অন্য দিকে সরাবার একটাই উপায় দেখলো রানা

—আলো। রিমোট-কণ্ট্রোল সুইচ অন করে ডিজেল জেনারেটর চালু করলো, উঠনের ওদিকে ইঞ্জিনরুম থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এলো। বাড়ির সামনের সব ক'টা বালব্ জ্বেলে দিলো ও, এক এক করে নিভিয়ে দিলো পিছনের, আর দু'পাশের প্রতিটি বালব্। পালাবার সময় অন্ধকারে মিশে যেতে পারবে ওরা।

কিচেন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো রানা। লাউঞ্জের পিছনের দরজায় থেমে, লাউঞ্জের ভেতর দিয়ে বাগান আর বারান্দার দিকে দ্রুত চোখ বুলালো। প্রতিটি বালব্ জ্বলছে। আলোর বন্যায় লনের ঘাস আশ্চর্য সবুজ দেখালো, ঘাসের ওপর জাকারানডা গাছগুলো যেন ছাতার মতো ঝুঁকে আছে। গোলাগুলি থেমে গেছে, কিন্তু গ্রাসল্যাণ্ড থেকে ভেসে আসছে আহত নারী-পুরুষের অস্পষ্ট কাতরানি। করুণ বিলাপের সুরও কানে বাজলো। গা শির শির করে উঠলো ওর। না জানি কি সর্বনাশ হয়ে গেছে!

দরজার কাছ থেকে সরে আসবে রানা, এই সময় আলোর কিনারায় কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও। চোখ কুঁচকে জিনিসটা চিনতে চেষ্টা করলো ও। কারা শত্রু জানতে পারলে সামান্য একটু সুবিধে হবে, যদিও অমূল্য সময় অপচয় হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির দিকে ছুটে আসছে একজন লোক। উলঙ্গ—না, কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়ানো রয়েছে। ঠিক ছুটছে না, মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। বারান্দার আলোয় চকচকে দেখালো তাকে, যেন এই মাত্র প্রচুর তেল মেখেছে। হঠাৎ রানা বুঝতে পারলো, তেল নয়, ওটা রক্ত। নিজের রক্তে সারা শরীর রাঙা হয়ে আছে লোকটার। কুকুর ছানা নদী থেকে উঠে এলে তার গা থেকে যেমন পানি ঝরে, এই লোকের গা থেকে সে রকম রক্ত

ঝরছে।

তারপর আতংকের আরো একটা বিষম ধাক্কা খেলো রানা। হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারলো ও। কুয়াকোপা। কিছু না ভেবেই ছুটলো রানা। লাথি মেরে লাউঞ্জের ফ্রেঞ্চ ডোর খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, লাফ দিয়ে নিচু পাঁচিল টপকে নেমে পড়লো উঠনে। কুয়াকোপা পড়ে যাচ্ছে, এই সময় তাকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলো। তারপর বুকে তুলে নিয়ে উঠে এলো বারান্দায়। বুড়ো মানুষটা এতো হালকা, আশ্চর্য হয়ে গেল ও।

নিচু পাঁচিলের কাছে মেঝেতে নামালো তাকে। বাঁ কাঁধে গুলি খেয়েছে সে। অনেকটা জায়গা জুড়ে চুর চুর হয়ে গেছে হাড়, ডান হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে আছে বুড়ো বাঁ হাতের কনুই। 'ওরা আসছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কুয়াকোপা। 'মালিক, আপনারা পালিয়ে যান।'

'কি হয়েছে বলো আমাকে,' শার্ট ছিঁড়ে জখমটা বাঁধতে বাঁধতে দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা। মুখ তুলে আলোর কিনারার দিকে তাকালো। 'নিলি কোথায়?'

'প্রার্থনা করুন, আমার মেয়েটা যেন না বাঁচে।' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করলো কুয়াকোপা। 'ওরা লাইন দিয়ে রেপ··· পুরুষরা বোধ হয় একজনও বেঁচে নেই·· পালান···আলায়তুনের পেটে বেয়নেট·· পালান, মালিক, পালান··· !' রানা বাধা দেয়ার আগেই নিচু পাঁচিল টপকে উঠনে নামলো কুয়াকোপা, আলোর পিছনে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও আমাকে সাবধান করতে এসেছিল,' বিড়বিড় করে বললো রানা। চোখের কোণে লালচে আলো দেখে

ঝট্ করে ঘাড় ফেরালো ও। অন্ধকার আকাশে ধোঁয়ার গায়ে আগুনের আভা পড়েছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, গ্রাসল্যাণ্ডের বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা।

এখন আর ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই, উপলব্ধি করলো রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো ও। এরই মধ্যে বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে।

জানালার নিচে হাঁটু ভাঁজ করে বসে রয়েছে সোহানা, জানালা গলে হলদেটে চৌকো আলো পড়েছে বেডরুমের মেঝেতে। ইতি-মধ্যে রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে চুল বেঁধে নিয়েছে সোহানা, পরে নিয়েছে একটা টি-শার্ট আর শর্টস। নরম চামড়ার জুতো পরে ফিতে বাঁধ-ছিল, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' সোহানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলো রানা। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'বাঘা,' বললো সোহানা। 'আমার কুকুরছানা!'

'ফর গডস সেক!'

'ওকে ফেলে যাই কিভাবে!' জেদ ফুটে উঠলো সোহানার চেহা-রায়, এই জেদের সাথে রানার পরিচয় আজকের নয়।

'গোলমাল করলে তোমাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাবো,' রাগের সাথে হুমকি দিলো রানা, সিধে হয়ে দাঁড়ানোর সময় ঝুঁকি নিয়ে জানালার কার্ণিশের ওপর চোখ তুলে আরেকবার বাইরে তাকালো।

লন আর বাগানে আলোর বন্যা। গ্রাসল্যাণ্ডের দিক থেকে মানুষের কালো মূর্তি এগিয়ে আসছে। সশস্ত্র মানুষ, হাঁটার ধরন আর ভাব-ভঙ্গিতে কঠোর শৃংখলা। যা দেখছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাসই

করতে পারলো না রানা, তারপর স্বস্তি বোধ করলো ও, ঢিল পড়লো পেশীতে।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!' বিড়বিড় করে বললো ও। হঠাৎ উদ্বেগ আর উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেয়ে একটু দুর্বল লাগছে, শীত শীত একটা ভাব অনুভব করলো। সোহানাকে দু'হাতে ধরে নিজের কাছে টানলো ও। 'আর কোনো ভয় নেই,' বললো তাকে। 'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কেন···কি ঘটলো?'

'সরকারী বাহিনী পৌঁছে গেছে,' বললো রানা। লালচে বেরেট আর রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ চিনতে পেরেছে ও। আলোর কিনারা পেরিয়ে পিল পিল করে লনে ঢুকে পড়ছে ওরা। 'ওরা থার্ড ব্রিগেডের লোকজন, বিপদ কেটে গেছে।'

উদ্ধারকারীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা। কোথায় ছিলো কে জানে, বেরিয়ে এসে সোহানার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুদে বাঘা। ঝুঁকে সেটাকে বুকে তুলে নিলো সোহানা। একটা হাত রাখলো রানা সোহানার কাঁধে।

'ঠিক সময় এসে পড়েছেন আপনারা, সার্জেণ্ট,' বললো রানা। ট্রুপারদের পিছনে নিয়ে বারান্দার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে নন-কমিশনড অফিসার। 'ধন্যবাদ।'

'আপনারা ভেতরে যান, প্লিজ,' হাতের রাইফেলটা নাড়লো সার্জেণ্ট, ভঙ্গিটা সরাসরি হুমকি দেয়ার মতো যদি না-ও হয়, আদেশের ভাবটুকু গোপন থাকলো না। লোকটা দীর্ঘদেহী, হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, নির্লিপ্ত চেহারা। রানার দিকে মাত্র একবার ঠাণ্ডা চোখে তাকালো সে। ট্রুপারদের দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাত-ইশারায়

নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

স্বস্তিবোধটুকু কর্পূরের মতো উবে যেতে শুরু করলো। রানা উপলব্ধি করলো, কোথায় কি যেন একটা গোলমাল আছে। ট্রুপার-দের দলটা হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে গিয়ে গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলছে। প্রতি জোড়া সৈনিকের পিছনে আর পাশে আরো একজন করে সৈনিক, তার কাজ সামনের দু'জনকে কাভার দেয়া। রাস্তায় খণ্ড যুদ্ধের সময় এই কৌশল অবলম্বন করা হয়, আশপাশ থেকে চোরাগুপ্তা আক্রমণের আশংকা থাকলে। যে যেখান দিয়ে পারলো, বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা। দড়াম করে দরজা খোলা হলো। চার-দিকে শোনা গেল জানালার শার্সি ভাঙার আওয়াজ। বাড়ির ভেতর তল্লাশী শুরু হয়েছে। উল্টে পাল্টে ফেলে দিচ্ছে সব, ভেঙে চুরমার করছে।

'এসব কি, সার্জেন্ট?' লোকটার সামনে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ালো রানা। রাগে লালচে হয়ে উঠেছে চেহারা।

এবার সরাসরি হুমকি দিয়ে রাইফেল তুললো সার্জেন্ট। তাকে সামনে নিয়ে পিছিয়ে এলো রানা, সোহানাকে এক হাতে ধরে আছে। ডাইনিং রুমে ঢুকে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘরের মাঝ-খানে ওরাও দাঁড়ালো, ডাইনিং টেবিলের পাশে। কাঁধ আর বাহু দিয়ে সোহানাকে আড়াল করে রেখেছে রানা, ওদের দিকে তাক করা রাইফেলের দিকে চোখ।

সামনের দরজা দিয়ে দু'জন ট্রুপার ঢুকলো। শোনা ভাষায় সার্জেন্টকে রিপোর্ট দিলো তারা, একটা শব্দও বুঝলো না রানা। মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট, ওদেরকে একটা নির্দেশ দিলো। পিছিয়ে গিয়ে দরজার দু'পাশে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ট্রুপার দু'জন,

হাতের রাইফেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো জোড়া মূর্তির দিকে তাক করা।

'আলোর সুইচ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সার্জেন্ট। রানার কাছ থেকে জেনে নিয়ে সুইচ অন করলো সে। আলোকিত হয়ে উঠলো ঘর।

'আমি এসবের ব্যাখ্যা চাই,' গম্ভীর গলায় বললো রানা। 'কার হুকুমে আমার বাড়িতে ঢুকলেন আপনারা?'

জবাব না দিয়ে গট গট করে হেঁটে দরজার কাছে গেল সার্জেন্ট। লন থেকে একজন ট্রুপারকে ডেকে নিলো সে, পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে ছুটে এলো লোকটা। রেডিওর হ্যাণ্ড-সেটে নিচু গলায় কথা বললো সার্জেন্ট। তারপর আবার ফিরে এলো ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর ছুটো দল, কেউ নড়াচড়া করছে না। পরিষ্কার বোঝা গেল, কারো আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে সার্জেন্ট। রানার মনে হলো এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, আসলে পাঁচ মিনিট পর মাথাটা একটু কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করলো সার্জেন্ট। জেনা-রেটরের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠলো আওয়াজটা। একটা ইঞ্জিনের শব্দ। এক সেকেণ্ড শোনার পর রানা বুঝলো, একটা ল্যাণ্ড-রোভার।

গাড়ি-পথ ধরে ছুটে এলো সেটা, হেড লাইটের আলোয় মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হলো জানালা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো। বন্ধ হলো ইঞ্জিন। দরজা খোলার, তারপর বন্ধ হবার আওয়াজ শুনলো ওরা। বারান্দায় একাধিক লোকের বুটের শব্দ।

ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলো জেনারেল উমাঙ্গো।

বেরেটটা এমনভাবে পরেছে, প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে একটা চোখ। গলায় ম্যাচ করা একটা সিল্ক স্কার্ফ। কোমরে জড়ানো হোলস্টারে পিস্তল, হাতে চামড়া মোড়া স্টিক। তাকে দেখে রানাকে ছেড়ে দিলো সোহানা, একটু সরে দাঁড়ালো।

মিটি মিটি হাসছে জেনারেল উমাঙ্গো।

নয়

জেনারেল উমাঙ্গোর পিছু পিছু ঢুকলো ক্যাপটেন হোসে ভালডেজ। তার স্টীল-রিম চশমার পিছনে চোখ জোড়ায় রহস্যময় দৃষ্টি। হাতে লেদার ম্যাপ কেস, কাঁধ থেকে স্লিঙে ঝুলছে একটা মেশিন পিস্তল।

'রট!' রানা স্বস্তি পেতে চাইলেও সতর্ক একটা ভাব সেটাকে দমিয়ে রেখেছে। গোটা ব্যাপারটা বড় বেশি পরিকল্পিত, বড় বেশি নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে ভয়ংকর কিছু যেন না থেকেই পারে না। 'তোমার লোকেরা এসব কি শুরু করেছে? আমার লোকদের গুলি করা হয়েছে, আমার গ্রাসল্যাণ্ডে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি এ-সবের ব্যাখ্যা চাই।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালো জেনারেল উমাঙ্গো, মিটি মিটি হাসিটা এখনো লেগে আছে তার মুখে। 'কথাটা সত্যি, শত্রুপক্ষে প্রচুর

হতাহত হয়েছে।'

'শত্রু?' হতভম্ব হয়ে গেল রানা।

'বিদ্রোহী।' আবার মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। 'ম্যাটাবেল বিদ্রোহী।'

'বিদ্রোহী?' তার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'কুয়াকোপাকে তুমি বিদ্রোহী বলো? নিলি, আলায়তুনে, টসনে—এদের তুমি··· তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! লেখাপড়া জানে না, নিরীহ মানুষ ওরা, পলিটিক্সের প-ও বোঝে না···'

'বাইরে থেকে দেখে অনেক সময় অনেক কিছুই বোঝা যায় না।' লম্বা টেবিলের মাথায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে একটা পা তুলে দিলো জেনারেল উমাঙ্গো, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকলো। তার সামনে লেদার ম্যাপ কেসটা রেখে পিছিয়ে গেল ক্যাপটেন ভালডেজ, গার্ড দেয়ার ভঙ্গিতে জেনারেলের কাঁধের পিছনে পজিশন নিলো সে। মেশিন পিস্তলটা শক্ত মুঠোয় ধরা।

'রট!' থরথর করে কাঁপছে রানা। 'আমার দিকে তাকাও!'

কিন্তু জেনারেল উমাঙ্গো তাকালো না। মাথা নিচু করে ম্যাপ দেখছে সে। নরম সুরে বললো সে, 'বলো, শুনছি।'

'আমি জানতে চাই কারা আমার গ্রামে আগুন জ্বাললো! জানতে চাই আমার লোকদের খুন করা হলো কেন! এসবের জন্যে কারা দায়ী? তুমি তাদের ধাওয়া করছো না কেন?'

'গোলাগুলি থেমে গেছে,' বললো উমাঙ্গো। 'বেঈমানদের ঘাটি ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা।'

'বেঈমান?'

'হ্যাঁ, তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছিলে।' মুখ তুলে তাকালো জেনা-

রেল। 'অস্বীকার করতে পারো, ধ্বংসাত্মক কাজে বিদ্রোহীদের সাহায্য করোনি তুমি? বিদ্রোহীরা তোমার এই বাড়ি আর গ্রামটাকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করছিল। তুমিই ওদের অস্ত্র আর রসদ দিয়ে পালছিলে। আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'এসব কি বলছো তুমি!' রানা এবার সত্যি নার্ভাস বোধ করলো। 'রট, তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও?'

'সিরিয়াস?' রানার মুখের ওপর হাসলো উমাঙ্গো। সিধে হলো সে, মেঝেতে দু'পা রেখে দাঁড়ালো। এগিয়ে ওদের সামনে চলে এলো সে। 'আরে, আরে, এ যে দেখছি একটা কুকুরছানা!' এখনো হাসছে সে। 'ভারি সুন্দর তো!'

সোহানা বাধা দেবে কি দেবে না ঠিক করার আগেই তার হাত থেকে বাঘাকে নিয়ে নিলো উমাঙ্গো, ফিরে এলো টেবিলের কাছে। ছোট্ট কুকুরছানার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে সে। এখনো ওটা আধো-ঘুমের মধ্যে রয়েছে, মুখ ঘষছে উমাঙ্গোর গায়ে, সম্ভবত মায়ের দুধ পেতে চাইছে।

'সিরিয়াস?' শব্দটা আবার উচ্চারণ করলো জেনারেল। 'ঠিক কতোটা সিরিয়াস, সেটা আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।' বাঘাকে হাত থেকে ছেড়ে দিলো সে, ডিগবাজি খেতে শুরু করে পাকা মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়লো বাচ্চাটা, পড়েই কেঁউ করে উঠলো। কচি বুকের ওপর একটা পা তুলে দিলো উমাঙ্গো, 'লুক!' বলেই শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিলো পায়ের ওপর। ছোট্ট বুকটা চ্যাপ্টা হবার আগে একবার মাত্র চিৎকার করে উঠলো ক্ষুদে বাঘা। 'এই রকম সিরিয়াস আমি।' এখন আর হাসছে না উমাঙ্গো। 'তোমাদের জীবনের দাম এই কুত্তার বাচ্চার চেয়ে বেশি নয় আমার কাছে।'

মৃদু গোঙানির শব্দ করে চোখ ফিরিয়ে নিলো সোহানা, মুখ লুকালো রানার বুকে। লাথি দিয়ে সাদা-কালো লাশটাকে ফায়ার-প্লেসের দিকে ছুঁড়ে দিলো উমাঙ্গো, তারপর বসলো একটা চেয়ারে।

'নাটকের পিছনে যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি,' বললো সে, লেদার ম্যাপ কেস থেকে আরো কিছু কাগজ বের করে নিজের সামনে টেবিলে রাখলো। 'তুমি কুখ্যাত সি. আই. এ.-র একজন এজেন্ট হিসেবে জিম্বাবুইয়ে আসো···'

'হোয়াটস আ ব্লাডি লাই,' চিৎকার করে বললো রানা, কিন্তু বিস্ফোরণটা জেনারেলকে স্পর্শ করলো না।

'তোমার লোকাল কণ্ট্যাক্ট জঁা মন্টিপিলার, ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে, এবং তোমার সেন্ট্রাল কণ্ট্রোল জাসটিন চ্যাপেল নামে বিশ্ব ব্যাংকের জনৈক অফিসার, তিনিই তোমাকে আর মিস সোহানাকে রিক্রুট করেন···।'

'মিথ্যে কথা!'

'তোমার মাসিক বেতন চল্লিশ হাজার মার্কিন ডলার,' বলে চলেছে জেনারেল উমাঙ্গো। 'তোমার মিশন ছিলো ম্যাটাবেলি ল্যাণ্ডে বিদ্রোহীদের জড়ো করে তাদের ট্রেনিং দেয়া, এবং সবশেষে সরকারকে উৎখাত করা। ট্রেনিঙের সমস্ত খরচ যোগাচ্ছিল সি. আই. এ., ইতিমধ্যে তারা তোমার হাতে পঞ্চাশ লাখ ডলার পৌঁছেও দিয়েছে···।'

'রট।' প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো রানা, কিন্তু সোহানা বাধা দিলো। ফিসফিস করে বললো সে, 'লাভ কি! শুধু শুনে যাও।'

'ইন্টারোগেশনের বাকি সময় তুমি আমাকে স্যার, নয়তো জেনা-

রেল উমাঙ্গো বলে সম্বোধন করবে, বোঝা গেছে?' দরজার দিকে ফিরলো উমাঙ্গো, বাইরে হঠাৎ কি সব তৎপরতা শুরু হয়েছে। শব্দ শুনে মনে হলো, হালকা ট্রাকের একটা কনভয় এসে পৌছুলো, ট্রুপাররা ঝপাঝপ নামছে, শোনা ভাষায় হুকুমের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঁচের দরজা দিয়ে রানা দেখলো, দশ বারো জন ট্রুপার কাঠের বাক্স নিয়ে বারান্দায় উঠলো।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে ক্যাপ্টেন ভালডেজের দিকে তাকালো উমাঙ্গো, অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ক্যাপ্টেন।

'রাইট!' জেনারেল উমাঙ্গো রানার দিকে ফেরার জন্যে ঘুরলো। 'আবার আমরা শুরু করতে পারি। তুমি তোমার পরিচিত ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ শুরু করো—ওদের ভাষা আর চরিত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকায়...'

রাগ নয়, বিস্ময় নয়, স্রেফ শান্ত হয়ে গেছে রানা। ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে ও, কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে। বাধা দিয়ে বললো, 'পরিচিত ম্যাটাবেল বিদ্রোহী?'

'ইয়েস। অস্বীকার করতো পারো, ওদের সাথে তুমি যোগাযোগ করোনি?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'আমার তো মনে পড়ে না।'

ক্যাপ্টেনকে ইঙ্গিত দিলো উমাঙ্গো, ক্যাপ্টেন একটা হাঁক ছাড়লো।

মাঝখানে একজন লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলো দু'জন ট্রুপার। লোকটার খালি পা, পরনে শুধু খাকি শর্টস, নাকে-মুখে বেশ কয়েকটা জায়গা আলুর আকৃতি নিয়ে ফুলে রয়েছে। সারা শরীরে বেয়-

নেটের কমবেশি গভীর টানা আঁচড়।

'এই বিদেশী লোকটাকে চেনো তুমি?' ধমকের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো উমাঙ্গো। লোকটা ক্লান্ত, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো। চোখ দুটো ঝাপসা, যেন ধুলো ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে।

'ওকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি...,' শুরু করলো রানা, কিন্তু হঠাৎ চিনতে পেরে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললো। লোকটা ক্যাপ্টেন কিনকিনি, তিন গেরিলার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসী, আর বদরাগী।

'ইয়েস?' কথা বলার জন্যে আহ্বান জানালো উমাঙ্গো, আবার হাসছে সে। 'কি যেন বলতে যাচ্ছিলে তুমি?'

'বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বললো রানা।

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকালো উমাঙ্গো। 'সময় মতো সবই হবে, কিন্তু যেটা শুরু করেছি সেটা আগে শেষ করি এসো।' ঝট্ করে আবার ক্যাপ্টেন কিনকিনির দিকে ফিরলো সে। 'এই বিদেশী লোককে চেনো তুমি?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো কিনকিনি। 'উনি আমাদের টাকা দিয়েছেন।'

'ওকে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। 'যত্ন নিতে ভুলো না, আর কিছু খেতে দিয়ো। এবার, রানা, এখনো কি তুমি অস্বীকার করবে যে অন্তর্ঘাতকদের সাথে তোমার যোগাযোগ ছিলো না?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে অভিযোগের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলো সে, 'বিদ্রোহীদের জন্যে তোমার এই এস্টেটে তুমি একটা অস্ত্রের গুদাম তৈরি করো। তুমি চেয়েছিলে বিদ্রোহীদের সাহায্যে

একটা ক্যু ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করবে, তারপর প্রো-আমেরিকান একজন ডিকটেটরকে গদীতে বসাবে…'

'আমার এই এস্টেটে তাহলে অস্ত্রও পাওয়া গেছে ?'

রানার ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো, 'ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো উমাঙ্গো। পিছু পিছু রানা আর সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো সার্জেন্টও। কাঠের বাক্সগুলো বারান্দার ওপরই এক ধারে রাখা হয়েছে।

'খোলো,' নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো। ক্লিপ খুলে ডালা তুললো একজন ট্রুপার।

বাক্সের ভেতর প্যাক করা অস্ত্রগুলো দেখেই চিনতে পারলো রানা। এগুলো আমেরিকান আর্মালিট ফাইভ পয়েন্ট ফিফটি-সিক্স এম-এম এ-আর এইটিন অটোমেটিক রাইফেল। প্রতিটি বাক্সে ছয়টা করে, আনকোরা নতুন, গায়ে এখনো ফ্যাক্টরী গ্রিজ লেগে রয়েছে।

'এগুলোর সাথে আমার কি সম্পর্ক ?'

'তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছো,' কঠোর সুরে বললো উমাঙ্গো। ক্যাপ্টেন ভালডেজের দিকে ফিরলো সে। 'অপর লোকটাকে আনো।'

পার্ক করা একটা ট্রাকের ক্যাব থেকে নামিয়ে, ধাক্কা দিতে দিতে বারান্দায় নিয়ে আসা হলো এক লোককে। লোকটা রানার ওভারশিয়ার। তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, নাকে-মুখে রক্ত। নিরীহ গোবেচারা মানুষ, আতংকে থরথর করে কাঁপছে।

'এই র‍্যাঞ্চের ট্রাক্টর শেডে অস্ত্রগুলো রাখোনি তুমি ?' প্রশ্ন করলো উমাঙ্গো, কিন্তু ওভারশিয়ার বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা

গেল না।

'জোরে।'

'হ্যাঁ, ওগুলো আমি ওখানে রেখেছিলাম, স্যার।'

'কার হুকুমে?'

কাতর চোখে রানার দিকে তাকালো ওভারশিয়ার, সেই সাথে হৃৎপিণ্ডে একটা শীতল স্পর্শ পেলো রানা, ঠাণ্ডা ভাবটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। বেআইনী অস্ত্র রাখার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

'কার হুকুমে?' নরম সুরে আবার জিজ্ঞেস করলো উমাঙ্গো।

'মিঃ রানার হুকুমে, স্যার।'

'ওকে নিয়ে যাও।'

গার্ডরা তাকে ট্রাকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে এখনো রানার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে ওভারশিয়ার। হঠাৎ চিৎকার করে বললো সে, 'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা! আমার বালবাচ্চা আছে…'

গার্ডদের একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার পেটে গুঁতো মারলো, পেট ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো ওভারশিয়ার। পড়েই যেতো, কিন্তু তাকে ধরে ফেলে ক্যাবে তুলে দেয়া হলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। সগর্জনে পাহাড়ের দিকে চলে গেল সেটা।

সবাইকে সাথে নিয়ে ডাইনিং রুমে ফিরে এলো জেনারেল উমাঙ্গো, টেবিলের মাথায় নিজের চেয়ারে বসলো। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলো নাড়াচাড়া করার সময় রানা বা সোহানার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে থাকার ভান করলো সে। রাইফেল নেড়ে ওদের

দু'জনকে পিছু হটতে বাধ্য করলো সার্জেন্ট, দেয়ালে পিঠ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ালো ওরা, দু'পাশে একজন করে ট্রুপার।

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা।

রানার পাশে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। হাত কাঁপবে এই ভয়ে নাভির কাছে পেটের ওপর একটা দিয়ে অপরটাকে চেপে ধরে আছে। তার চোখে আগুন, ধিকি ধিকি জ্বলছে। ফায়ার-প্লেসের দিক থেকে জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে আছে সে, ওখানে পরিত্যক্ত খেলনার মতো পড়ে রয়েছে বাঘার চেপ্টে যাওয়া দেহটা।

অবশেষে কাগজগুলো ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো জেনারেল উমাঙ্গো, হাতের স্টিক দিয়ে ছোটো ছোটো টোকা মারলো টেবিলের কিনারায়। 'কেস খুব খারাপ,' গম্ভীর মুখে বললো সে। 'তোমার আর সোহানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ তোলা হয়েছে, বেশিরভাগই ক্যাপিটাল অফেন্স—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দু'জনের কপালেই ফায়ারিং স্কোয়াড ঝুলছে।'

'খবরদার, সোহানাকে জড়াবে না।' নিজের অজান্তেই সোহানার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা।

'এ-দেশে এখনো আমরা ফাঁসির ব্যবস্থা রেখেছি। নিজের চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি, গলায় রশি বেঁধে জল্লাদ যখন কোনো মেয়েকে ঝুলিয়ে দেয়, কাপড়চোপড় সব একেবারে ভিজিয়ে ফেলে সে। মেয়েদের নিচের অংশ তেমন টাইট না আর কি!'

প্রচণ্ড ঘৃণায় অসুস্থ বোধ করলো রানা, ইচ্ছে হলো শয়তানটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর মনের ভাব টের পেলো সোহানা, একটা হাত চেপে ধরলো খপ করে। 'না!'

'তোমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, ব্যাপারটা অতোদুর গড়াতে

না-ও দেয়া যায়। অবশ্য কোন্‌টা বেছে নেবে, সেটা সম্পূর্ণ তোমাদের ওপরই নির্ভর করছে।

থেমে থেমে একাই কথা বলছে উমাঙ্গো।

'অভিযোগ গুরুতর, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও সত্যি,' চেহারায় তাচ্ছিল্যের একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো সে, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগণ্য ঘুঁটি তোমরা। তোমাদের মেরে জেনারেল রট উমাঙ্গো তার হাত গন্ধ করতে পারে না। হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

ঝট্‌ করে মুখ তুললো সোহানা। কিন্তু রানা অটল।

'দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছো না। কিন্তু না, আমি ঠাট্টা করছি না। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আই লাভ বোথ অভ ইউ। শুধু ভালোবাসি না, রানার তো রীতিমতো ভক্ত আমি। ও একটা প্রতিভা। মাত্র অল্প ক'দিনেই কি রকম জাঁকিয়ে বসেছিল এখানে!' উমাঙ্গোর চেহারায় প্রশংসার ভাব। 'সুযোগ পেলে কিছু-দিনের মধ্যে ভেল্কি দেখিয়ে দিতো। এরকম একটা দুর্লভ প্রতিভার অকালমৃত্যু হোক তা আমি চাই না।'

জেনারেল উমাঙ্গো আশার আলো দেখাতে চাইলেও, তাকে বিশ্বাস করতে পারলো না রানা। ওর মনে হলো, বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, উমাঙ্গোও তেমনি খেলছে ওদের নিয়ে।

'আমার প্রস্তাবটা এই রকম। সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে কাগজে সই করবে তোমরা। বিনিময়ে তোমাদের আমি সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

টেবিলের ওপর ঠক-ঠক-ঠক একঘেয়ে আওয়াজটা রানার মাথায় যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। গুলির আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙার পর

থেকে একের পর এক ঘটনাগুলো এতো দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু চিন্তা করা অসম্ভব বলে মনে হলো। 'অভিযোগ? কিসের অভিযোগ? আমরা কোনো অপরাধ করিনি…'

'হয়তো করোনি, হয়তো করেছো,' হাসি মুখে বললো উমাঙ্গো, 'কিন্তু বহাল তবিয়তে জিম্বাবুই থেকে বেরুতে হলে স্বীকার করতে হবে সব সত্যি। সইটা নেবো শুধু একটা কারণে, তোমরা যাতে এ-দেশে আর ফিরে আসতে না পারো।'

'সই করলাম, তারপর তুমি আমাদের হাজতে পাঠিয়ে দিলে—কি মজা, তাই না?'

'আমার সম্পর্কে তোমার এরকম নীচ ধারণা হলো কি করে বুঝলাম না,' অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালো উমাঙ্গো।

এই বিপদের মধ্যেও না হেসে পারলো না রানা। চারদিকের মেঝেতে চোখ বুলালো ও, টেবিল-চেয়ারের নিচেও তাকালো, তারপর বললো, 'কই, এখানে আর তো কোনো কীট দেখছি না।'

অপমানে উমাঙ্গোর চেহারা লালচে হয়ে উঠলো। কঠিন সুরে জানতে চাইলো সে, 'ইয়েস অর নো?'

লোকটাকে খেপিয়ে দিতে পেরে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করলো রানা। 'কিন্তু তোমার এই উদারতার কারণটা কি? তুমি নিজেও কি নিজেকে এতোটা মহৎ হৃদয় ভাবতে পারো যে আমরা দুষ্কৃতকারী জানার পরও শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে?'

অপমানটা ভুলে গিয়ে নির্লজ্জের মতো হাসলো উমাঙ্গো। 'আগেই বলেছি, তুমি একটা প্রতিভা। ঠিক ধরতে পেরেছো, মুক্তির বিনিময়ে কিছু একটা নেবো তোমার কাছ থেকে।' অনেকগুলো কাগজ থেকে একটা বেছে নিলো সে। 'এই যে, এটা পড়, তাহলেই বুঝতে

পারবে।'

'কি ওটা?'

'তোমার স্বীকারোক্তি, অবশ্যই।'

'তারমানে আগেই তুমি টাইপ করিয়ে রেখেছো?' এতো কিছুর পরও অবাক না হয়ে পারলো না রানা।

কেউ জবাব দিলো না, ক্যাপ্টেন ভালডেজ ডকুমেন্ট-টা নিয়ে এলো ওর কাছে। 'প্লিজ, পড়ে দেখুন, মিঃ রানা।'

টাইপ করা ফুলসক্যাপের তিনটে শিট। সাম্রাজ্যবাদী প্রভু, অশুভ শক্তি, দালাল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নিন্দাসূচক শব্দই বেশি, প্রতিটি বাক্যে একটা করে অপরাধের স্বীকারোক্তি। পড়তে পড়তে গোটা ব্যাপার-টা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো রানার। তারপর হঠাৎ একটা পরি-চিত বাক্য দেখে এক নিমেষে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাক্যটা এই রকম, 'আই ফুললি অ্যাডমিট দ্যাট বাই মাই অ্যাকশন আই হ্যাভ প্রুফড মাইসেলফ টু বি অ্যান এনিমি অভ দা স্টেট অ্যাণ্ড দা পিপল অভ জিম্বাবুই।'

এর আগে আরো একটা ডকুমেন্টে সই করেছে রানা, তাতে এই বাক্যের শেষ অংশ প্রায় হুবহু এইভাবেই ছিলো। 'কিং'স হেভেন!' বিড়বিড় করে বললো ও, মুখ তুলে উমাঙ্গোর দিকে তাকালো। 'এর জন্যেই তাহলে এতো কিছু! কিং'স হেভেন চাইছো তুমি!'

ঘরের ভেতর কোনো শব্দ নেই, শুধু টেবিলের কিনারায় স্টিকের বাড়ি পড়ার একঘেয়ে ঠক-ঠক-ঠক আওয়াজ ছাড়া। উমাঙ্গোর ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি লেগে রয়েছে।

'তারমানে প্রথম থেকেই তোমার মনে এই ছিলো। আমার লোনের জন্যে ব্যাংক গ্যারান্টি—ক্লজ-টা তুমি ইচ্ছে করেই ঢুকিয়ে

দিয়েছিলে ডকুমেন্টে। কিং'স হেভেন যাতে কেড়ে নিতে কোনো অসুবিধে না হয়।' রাগে দিশেহারা বোধ করলো রানা; হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে সেটা তুলে নিলো ক্যাপ্টেন ভালডেজ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। রাগে কাঁপছে রানা, সামনে বসে থাকা কালো দানবটার দিকে এক পা এগোলো ও, হাত দুটো নিজের অজান্তেই সামনে বাড়লো, কিন্তু দীর্ঘদেহী শোনা সার্জেন্ট ওর বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে বাধা দিলো ওকে।

'ইউ ব্লাডি সোয়াইন,' হিস হিস করে বললো রানা। 'আমি একজন ব্যারিস্টারের সাথে কথা বলতে চাই। আই ওয়ান্ট দ্য প্রটেকশন অভ ল।'

'বন্ধুবর,' সহাস্যে জবাব দিলো জেনারেল, 'ম্যাটাবেলিল্যাণ্ডে আমিই আইন। নিরাপত্তার প্রস্তাব আমার তরফ থেকেই দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'আমি রাজি নই। ওতে আমি সই করবো না। তার আগে আমার লাশ দেখবে তুমি।'

'সে ব্যবস্থাও করা যায়,' নরম সুরে বললো উমাঙ্গো, তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকে বলছি, বাস্তবতার কাছে মাথা নত করো, রানা। কাগজটায় সই করো, তাহলেই কুৎসিত ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যেতে পারবো আমরা।'

অশ্রাব্য গালিগালাজগুলো জিভের ডগায় ভিড় করে এলো, অনেক কষ্টে সেগুলো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকলো রানা, ওদের সামনে নিজেকে ছোটো করার কোনো মানে হয় না। 'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ও। 'আমি সই করবো না।'

'এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, মেনে নাও।'

'অসম্ভব!'

ঝট্‌ করে লম্বা সার্জেন্টের দিকে ফিরলো উমাঙ্গো। 'মেয়েলোক-টাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম,' বললো সে। 'প্রথমে তুমি, তারপর তোমার লোকেরা। পালা করে ওর ওপর চড়াও হবে, প্রত্যেকে। এখানে, এই ঘরে, এই টেবিলের ওপর।'

'তুমি মানুষ নও!' সোহানাকে ধরার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু ট্রুপাররা ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, টেনে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরলো। তাদের একজন সামনে দাঁড়িয়ে ওর গলায় বেয়নেটের ডগা ছোঁয়ালো।

অপর একজন ট্রুপার সোহানার হাত মুচড়ে ধরলো, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তুলে ফেললো তার একটা কনুই। তাকে ঠেলে সার্জেন্টের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। হাত-পা ছুঁড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সোহানা, কিন্তু ট্রুপারটা তাকে শূন্যে তুলে ফেললো, শুধু জুতোর ডগা দুটো মেঝে ছুঁয়ে থাকলো। ব্যথায় নীল হয়ে উঠলো তার চেহারা।

সার্জেন্টের চেহারায় কোনো ভাব নেই। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালোও না, অশ্লীল কোনো ভঙ্গিও করলো না। সোহানার টি-শার্টের সামনেটা দু'হাতে ধরলো সে, এক টানে গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেললো। তার ফর্সা স্তন জোড়া লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'ইচ্ছে করলে মেঝের ওপর বসতে পারো, রানা,' সকৌতুকে বললো উমাঙ্গো। 'দেড়শো লোক রয়েছে আমার, একজন একজন করে কাজ সারতে প্রচুর সময় নেবে।'

সোহানার শর্টসের ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো সার্জেণ্ট, টান দিয়ে নামিয়ে দিলো। সোহানার হাঁটুর কাছে আটকে গেল শর্টস, ঝুঁকে সেটাকে পায়ের পাতা দিয়ে গলিয়ে বের করে আনলো সার্জেণ্ট। সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু বেয়নেটের চোখা ডগা গলার চামড়া ভেদ করলো। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়লো বুকের ওপর শার্টে। মুক্ত হাতটা দিয়ে নাভির নিচটা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সোহানা।

'প্রিয়তমাকে কেউ ধর্ষণ করছে, এই দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো উমাঙ্গো। পরমুহূর্তে সকৌতুকে কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'ঠিক আছে, তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, আমারও কোনো আপত্তি নেই। দেখি, কতোবার তুমি ব্যাপারটা ঘটতে দিতে পারো।'

সার্জেণ্ট আর ট্রুপার, দু'জন মিলে সোহানাকে দুদিক দিয়ে চেপে ধরলো। ডাইনিং টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। পকেট থেকে কর্ড বের করে সোহানার পায়ের গোড়ালি দুটো বাঁধলো সার্জেণ্ট, কিন্তু পায়ের জুতো জোড়া খুললো না। দক্ষ হাতে সোহানার হাঁটু দুটো তার বুকের ওপর তুললো ওরা, তারপর গায়ের জোরে চাপ দিয়ে নামিয়ে ঢুকিয়ে দিলো বগলের তলায়। এই জঘন্য কাজ আগেও নিশ্চই বহুবার করেছে ওরা।

সম্পূর্ণ অসহায় সোহানা, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়ে আছে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ঘরের প্রতিটি লোক তাকিয়ে আছে তার গোপন অঙ্গের দিকে। এর চেয়ে বড় অবমাননা আর কি হতে পারে নারীর। সার্জেণ্ট তার কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করলো।

'রানা!' চিৎকার করলো সোহানা। নিজের অজান্তে ঝাঁকি

খেলো রানা, কেউ যেন চাবুক মেরেছে পিঠে।

'করবো,' বিড়বিড় করে বললো রানা। থরথর করে কাঁপছে ও। 'সই করবো। ওকে ছেড়ে দাও।'

শোনা ভাষায় একটা নির্দেশ দিলো উমাঙ্গো, সাথে সাথে সোহানাকে ছেড়ে দিলো ওরা। পিছিয়ে এলো ট্রুপার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সোহানাকে সাহায্য করলো সার্জেন্ট। মাথা নিচু করে, বিনয়ের সাথে শর্টসটা তার হাতে ধরিয়ে দিলো সে। শর্টসের ফাঁকে একটা পা গলালো সোহানা, ফোঁপাচ্ছে আর কাঁপছে।

শর্টস পরে রানার দিকে ছুটলো সে, ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। কথা বলতে পারলো না, ঘন ঘন শিউরে উঠলো, হাঁ করা মুখে ঢুকে গেল চোখের পানি। তাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো রানা, ফিসফিস করে বললো, 'শান্ত হও, লক্ষ্মী, শান্ত হও।'

'তাড়াতাড়ি সই করলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে তোমরা।'

টেবিলের দিকে এগোলো রানা, বাঁ হাতের ভাঁজে এখনো আটকে রেখেছে সোহানাকে। ক্যাপ্টেন ভালডেজ রানার হাতে একটা কলম ধরিয়ে দিলো, স্বীকারোক্তির প্রথম দুটো পাতায় ইনিশিয়াল দিলো রানা, শেষটায় পুরো নাম সই করলো। ক্যাপ্টেন আর জেনারেল, ওরাও সাক্ষী হিসেবে সই করলো।

উমাঙ্গো বললো, 'শেষ একটা ফরমালিটি। আমি চাই তোমাদের দু'জনকে রেজিমেন্টাল ডাক্তার পরীক্ষা করুক, তোমাদের ওপর কোনো রকম টরচার চালানো হয়নি সেটা প্রমাণ হওয়া দরকার।'

'ড্যাম ইউ!'

'আরে ভাই, রাগ করো কেন—যেখানের যা নিয়ম।'

ডাক্তার নিশ্চয়ই বাইরের ট্রাকগুলোর একটায় অপেক্ষা করছিল। খর্বকায় একজন শোনা, ভারি চটপটে।

'মিস সোহানাকে আপনি ওর বেডরুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, ডক্টর। আপনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করবেন, ওকে জোর করে পেনিট্রেট করা হয়েছে কিনা।' সোহানাকে নিয়ে বেডরুমের দিকে চলে গেল ডাক্তার, রানার দিকে ফিরলো উমাঙ্গো। 'ইতিমধ্যে তোমার অফিসের সেফ খুলে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সব বের করে নাও, পথে দরকার লাগবে।'

বারান্দার শেষ মাথায় রানাকে এসকর্ট করে নিয়ে এলো ট্রুপাররা। অফিসে ঢুকে সেফের কমবিনেশন লক খুললো রানা। পাসপোর্ট, ওয়ালেটে ভরা ক্রেডিট কার্ড, আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ব্যাজ, আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্যাভেলার্স চেকের তিনটে ফোল্ডার, এবং পাণ্ডুলিপিটা নিলো ও। সব একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ব্যাগে ভরে নিয়ে ফিরে এলো ডাইনিং রুমে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো সোহানা আর ডাক্তার। কাপড় বদলে কাশ্মিরী জার্সি, শার্ট, আর জিনস পরেছে সোহানা। এখন আর কাঁপছে না, কিন্তু থেকে থেকে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠছে। তার এক হাতে ক্যামেরা ব্যাগ, অপর হাতে ফটোগ্রাফ ভরা আর্ট ফোল্ডার।

'এবার তোমার পালা,' রানাকে বললো উমাঙ্গো।

ডাক্তারের কাজ শেষ হতে বাইরে বেরিয়ে এলো রানা। একটা ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনের সিটে ইতিমধ্যে উঠে বসেছে সোহানা, পাশে ক্যাপ্টেন ভালডেজ। গাড়ির পিছনে আরো দু'জন ট্রুপার রয়েছে। ড্রাইভারের পাশের সিটটা খালি রাখা হয়েছে রানার জন্যে।

বারান্দায় অপেক্ষা করছে উমাঙ্গো। 'গুডবাই, রানা।' চোখে নগ্ন ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'জানি,' আবার বললো জেনারেল, 'আমার ওপর রেগে আছো তুমি। সেজন্যে তোমাকে আমি দোষও দিতে পারি না। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলে, মাটির পৃথিবীতে কি সুন্দর গড়ে তুলেছিলে একটা স্বর্গ—সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হলে রাগ তো হবেই। আমার ধারণা এই শোক খুব তাড়াতাড়ি তুমি কাটিয়ে উঠবে।'

'আবার দেখা হবে,' শান্ত গলায়, কিন্তু জোর দিয়ে বললো রানা। গাড়ি ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। পিছনে শোনা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর ভারি গলার অট্টহাসি। রানা যেন তার সাথে সাংঘাতিক একটা রসিকতা করেছে।

গ্রাসল্যাণ্ডে এখনো আগুন জ্বলছে দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো রানার। এক এক করে ওদের ক'জনের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠলো—কুয়াকোপা, টসনে, নিলি, আলায়তুনে। ক'জন মারা গেছে, ক'জন বেঁচে আছে কিছুই জানা হলো না। 'আবার আমি ফিরে আসবো,' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো ও।

পাহাড় চূড়ায় উঠলো, তারপর নামতে শুরু করলো গাড়ি। পিছনে রয়ে গেল র‍্যাঞ্চ। পশ্চিম দিকে বাঁক নিলো ড্রাইভার, উঠে এলো মেইন রোডে। এখনো কেউ একটা কথাও বলেনি।

হাঁটুর ওপর রাখা ম্যাপ কেস থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করলো ক্যাপ্টেন ভালডেজ। সিটের ওপর দিয়ে বোতলটা বাড়িয়ে ধরলো সে, কিন্তু হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা। ক্যাপ্টেন তবু বোতলটা ওর মুখের সামনে ধরে রাখলো। অগত্যা সেটা নিলো রানা, ছিপি খুলে দু'ঢোক নির্জলা হুইস্কি খেলো।

সাথে সাথে শরীর চাঙা হয়ে উঠলো রানার। আরো এক চুমুক খেলো ও। তারপর বোতলটা বাড়িয়ে ধরলো সোহানার দিকে। সোহানা মাথা নাড়লো।

'এক ঢোক খাও,' অনুরোধ করলো রানা। এখনো সোহানাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে, নড়াচড়ায় আড়ষ্ট ভাব। কাঁপুনিটা আগেই থেমেছে, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ শিউরে ওঠা বন্ধ হয়নি। আরো একবার অনুরোধ করায় বোতলটা নিয়ে এক ঢোক খেলো সে-ও।

বোতলটা ক্যাপ্টেন ভালডেজকে ফিরিয়ে দিলো সোহানা। 'ধন্যবাদ।' যে ভদ্রমহিলাকে এইমাত্র চরম অপমান এবং অপদস্থ করা হয়েছে তার কাছ থেকে এই সবিনয় ভদ্রতা প্রকাশ পাওয়ায় ওরা সবাই অপ্রতিভ বোধ করলো।

বুলাওয়ায়োর খানিক আগে প্রথম রোডব্লকের সামনে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভার। রিস্টওয়াচ দেখলো রানা, রাত তিনটে। ব্যারিয়ারের সামনে আর কোনো গাড়ি নেই, ব্যারিকেডের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাণ্ড-রোভারের দু'পাশে দাঁড়ালো দু'জন ট্রুপার। জানালার কাঁচ নামিয়ে তাদের একজনের সাথে কথা বললো ক্যাপ্টেন ভালডেজ, নিজের পাস-টা দেখালো তাকে। টর্চের আলোয় পাস-টা পরীক্ষা করলো ট্রুপার, তারপর ফিরিয়ে দিয়ে স্যালুট ঠুকলো। তার ইঙ্গিতে ব্যারিয়ার তোলা হলো, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রোডব্লক পেরিয়ে এলো ড্রাইভার।

বুলাওয়ায়ো যেন মৃত শহর, অল্প দু'একটা জানালায় আলো দেখা গেল। রাস্তার ওপর এখানে-সেখানে লাশ পড়ে আছে, আকাশের এদিক সেদিক কালো ধোঁয়া আর লালচে শিখা। একটা ট্রাফিক সিগন্যাল লাল সংকেত দিলো, রাস্তায় আর কোনো যানবাহন বা

পথিক না থাকলেও বাধ্য ড্রাইভার ল্যাণ্ড-রোভার থামালো। ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ, প্রথমটা কাছাকাছি কোথাও, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টা অনেকটা দূরে।

রিয়্যার ভিউ মিররে চোখ রেখে ক্যাপটেন ভালডেজকে লক্ষ্য করছিল রানা। গুলির শব্দে লোকটাকে শিউরে উঠতে দেখলো ও। ট্রাফিক সিগন্যাল বদলালো, ল্যাণ্ড রোভার ছেড়ে দিলো ড্রাইভার। দক্ষিণের রাস্তা ধরে শহরতলীর দিকে এগোলো ওরা। শহরের কিনারায় পৌঁছুবার আগে আরো দু'বার রোডব্লকে থামতে হলো ওদের। তারপর খোলা রাস্তা।

অন্ধকার চিরে ছুটে চললো গাড়ি। ড্যাশবোর্ডের আলোয় শুধু মুখগুলো আলোকিত হয়ে থাকায় ভূতের মতো দেখালো ওদের। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া মাঝে মধ্যে ঘড় ঘড় করে উঠলো রেডিও, বারকয়েক যান্ত্রিক শোনা কণ্ঠস্বর ঢুকলো কানে। জেনারেল উমাঙ্গোর গলা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার, সে সম্ভবত অন্য কোনো ইউনিটকে ডাকছে, অন্তত ক্যাপটেন ভালডেজ সাড়া দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না।

সোহানার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, মাঝে মধ্যে ঢুলছে সে। অপমানিত বোধ করলেও শক্তি ক্ষয় হয়, মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ডাইনিং রুমের টেবিলে সোহানা দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে, এই দৃশ্যটা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল রানা, এই সময় হঠাৎ ক্যাপটেন ভালডেজ কথা বলে ওঠায় বাস্তবে ফিরে এলো ও।

পুব আকাশে দিনের প্রথম আলো। ম্লান কমলা রঙের আকাশের গায়ে গাছের সবুজাভ মাথা দেখলো রানা। ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, মন্থর হলো গতি, হঠাৎ করে ঘুরে মেইন টারমাক রোড থেকে

একটা মেটো পথে নেমে পড়লো ল্যাণ্ড-রোভার। পরমুহূর্তে ধুলোর পাহাড় উঠলো পিছনে।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'কোথায় আমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ও। 'রাস্তা ছেড়ে এলাম কেন?'

ড্রাইভারের সাথে কথা বললো হোসে ভালডেজ, মেটো পথের কিনারায় ল্যাণ্ড-রোভার থামালো ড্রাইভার। 'আপনারা দয়া করে নামবেন কি?'

নামতে শুরু করলো রানা, ওকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়ালো ভালডেজ, কিন্তু রানা কিছু বুঝতে পারার আগেই ওর হাতে এক-জোড়া হাতকড়া পরিয়ে দিলো সে। গোটা ব্যাপারটা এতো দ্রুত, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল যে কয়েক সেকেণ্ড বিস্ময়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, হাতকড়া পরা হাত দুটো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে রেখে সেদিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো। চিৎকার করে উঠতে চাইলো, কিন্তু গলা দিয়ে তেমন আওয়াজ বেরুলো না, 'এর মানে কি?'

ইতিমধ্যে একই দক্ষতার সাথে সোহানার হাতেও হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে ভালডেজ। রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ড্রাইভার আর ট্রুপার দু'জনের সাথে কথা বলছে সে। শোনা ভাষায় দ্রুত কথা বলছে ওরা, কি বলছে বুঝতে পারলো না রানা। কিন্তু দুটো শব্দের অর্থ বুঝতে পেরে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। একটা 'খুন', অপরটা 'গায়েব'।

ক্যাপটেনের নির্দেশ শুনে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো একজন ট্রুপার, তর্ক জুড়ে দিলো। খোলা দরজা দিয়ে ল্যাণ্ড-রোভা-রের ভেতর হাত ঢোকালো ক্যাপটেন, মাইক্রোফোনের রিসিভার

তুলে মুখের সামনে ধরলো। কল সাইনটা তিনবার রিপিট করলো সে। অল্প কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর জেনারেল উমাঙ্গোর সাথে যোগাযোগ হলো। ভি. এইচ. এফ-এর কান ঝালাপালা করা যান্ত্রিক কোলাহল সত্ত্বেও উমাঙ্গোর গলা চিনতে পারলো রানা। মাত্র দু'একটা কথা হলো, মাইক্রোফোন রেখে দিলো ক্যাপটেন। ট্রুপারের চেহারায় আর কোনো সংশয় নেই। বোঝা গেল জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশই পালন করছে ভালডেজ।

মেটো পথ ধরে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। জঙ্গলের বাইরে দিনের আলো প্রতি মুহূর্তে প্রখর হচ্ছে, কিন্তু এখানে গভীর ছায়া আরো গভীর হতে থাকলো। পথের ওপর দু'একটা হরিণ দেখা গেল, হেডলাইটের আলো দেখে ত্রস্তে পালালো ঝোপের আড়ালে।

বাঁচার উপায় ভাবছে রানা।

'মিথ্যে আশ্বাস দিয়ো না,' ফিসফিস করে বললো সোহানা। 'ওরা আমাদের গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না?' সম্পূর্ণ শান্ত সে, নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সম্ভাব্য সব দিক ভেবে দেখেছে রানা, মুক্তির কোনো উপায় এখনো খুঁজে পায়নি। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়জোর ক্যাপটেন আর ড্রাইভারকে কাবু করতে পারবে ও, তারপরও ট্রুপার দু'জন থেকে যাবে। হিসেবে এক চুল ভুল হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে, শুধু একা নয়, সোহানাকে নিয়ে। হাতে হাতকড়া না থাকলে অবশ্য আলাদা কথা ছিলো, সোহানার সাহায্য ছাড়াই কিছু একটা চেষ্টা করতে পারতো ও।

মিথ্যে বলে লাভ নেই, বিপদের জন্যে সোহানারও তৈরি থাকা দরকার। 'হ্যাঁ। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিলো, উমাঙ্গো

আমাদের চলে যেতে দেবে না।'

'বুঝলেও তোমার কিছু করার ছিলো না।'

এবার বাংলায় নয়, ইংরেজীতে বললো রানা, 'দূরে কোথাও পুঁতে ফেলা হবে আমাদের লাশ, তারপর নিখোঁজ বলে ঘোষণা করা হবে, আর দায়ী করা হবে বিদ্রোহী ম্যাটাবেলদের।' ক্যাপটেন ভালডেজ শুনলো, বুঝলো, কিন্তু হাঁড়ি মুখ করে চুপচাপ বসে থাকলো সে, স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করলো না।

পথটা সামনে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের পথটা কোনো রকমে চেনা যায়, ইঙ্গিতে সেটাই ড্রাইভারকে দেখালো ভালডেজ। গতি আরো কমিয়ে আনলো ড্রাইভার, লো গিয়ার দিলো। উঁচু-নিচু পথ ধরে আরো বিশ মিনিট এগোলো ওরা। ইতি-মধ্যে দিনের আলো পুরোপুরি ফুটেছে, আকেইশা গাছের মগডাল ছুঁয়েছে কচি রোদ।

আরেকটা নির্দেশ দিলো ক্যাপটেন, পথ ছেড়ে মাঠে নেমে এলো ল্যাণ্ড রোভার, মাঠ থেকে ঢুকে পড়লো কোমর সমান উঁচু ঘাসের রাজ্যে। একটা পাথুরে ঢালকে ঘিরে এগোলো গাড়ি। বোঝা গেল, নগণ্য পথটা থেকেও যতোদূর সম্ভব সরে আসতে চাইছে ওরা জঙ্গলের আরো খানিক ভেতরে ঢুকে থামলো ড্রাইভার।

'কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না,' বিড়বিড় করে বললো সোহা-না। বাংলায় কথা বলছে সে। 'কিছু করার আগে আমাকে বলবে।'

রানার মুখে কথা যোগালো না।

'আপনারা কেউ নড়বেন না!' হুকুম করলো ভালডেজ।

'কাপুরুষ!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলো সোহানা। 'এই কাজ করতে তোমার লজ্জা করছে না?'

ধীরে ধীরে সোহানার দিকে ফিরলো ক্যাপটেন ভালডেজ। স্টীল রিম চশমার ভেতর তার চোখে হয়তো বিষাদ আর সহানুভূতি আছে, কিন্তু মুখের চেহারা নির্দয় খুনীর মতো কঠোর। প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে। ট্রুপারদের দিকে তাকিয়ে শোনা ভাষায় অর্ডার দিলো।

হাতের অস্ত্র ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে রাখলো ট্রুপাররা, রুফ-র‍্যাক থেকে তিনটে ভাঁজ করা ট্রেঞ্চিং-টুল নামালো ড্রাইভার।

জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের ইগনিশন থেকে চাবিটা বের করে নিলো ভালডেজ। নিজের লোকদের নিয়ে খানিক দূর হেঁটে গেল সে, বুটের ডগা দিয়ে মাটির ওপর লম্বা দাগ টানলো—প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, পাশাপাশি। গা থেকে ব্যাটল জ্যাকেট খুলে কবর খুঁড়তে লেগে গেল ওরা। একপাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছে ক্যাপটেন। একটা সিগারেট ধরালো সে, স্থির ঠাণ্ডা বাতাসে খাড়া উঠে গেল নীলচে ধোঁয়া।

দশ

'রাইফেল নিতে যাচ্ছি আমি,' ফিসফিস করে বললো রানা।

রাইফেলগুলো ল্যাণ্ড-রোভারের পিছনে। দুটো সিটের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে ওকে, তারপর র‍্যাকে খাড়া করে রাখা রাইফেলের নাগাল পেতে হবে। তারপরও পাঁচটা কাজ বাকি থাকবে—র‍্যাকের ক্লিপ খোলা, রাইফেল লোড করা, রেট-অভ-ফায়ার সিলেকটর বদলানো, এবং সবশেষে পিছনের জানালা দিয়ে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করা। এ সবই ওকে সারতে হবে হাতে হাত-কড়া পরা অবস্থায়।'

'পারবে না,' অস্ফুটে বললো সোহানা।

'হয়তো,' গম্ভীরমুখে একমত হলো রানা। 'কিন্তু আর কিছু ভাবতে পারো তুমি? শোনো, আমি রেডি বললেই ডাইভ দিয়ে গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়বে।'

ধীরে ধীরে সিটের ওপর ঘুরে বসলো রানা। পিছনের জানালা দিয়ে ছোট্ট দলটার দিকে তাকালো। শক্ত মাটি, পাথর মেশানো —কবর খুঁড়তে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা।

'শোনো,' হঠাৎ খুব জরুরী ভঙ্গিতে বললো রানা, 'তোমাকে

আমি ভালোবাসি। এতো ভালো জীবনে বোধহয় কাউকে বাসিনি।'

'এখন এসব কথা বলো না,' সোহানার গলা বন্ধ হয়ে এলো। 'আমি কেঁদে ফেলবো।'

'আমি চাই তুমি ভয় পাবে না।'

'গুড লাক!' সিটের ওপর মাথা নিচু করে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে সোহানা নিজের সিটের ওপর শরীরটা উঁচু করলো রানা, তার পিঠ জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো সোহানা। সামনের সিটের পিঠ টপকে পিছনের সিটে নেমে পড়লো রানা। মাথা তুলে পিছনের জানালা দিয়ে চট করে বাইরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সোহানা।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো সোহানা। 'ক্যাপটেন এদিকে আসছে ···না, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন বলছে ওদের।'

একটা গড়ান দিয়ে পিছনের সিট থেকে নেমে পড়লো রানা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করলো ও, নাগালের মধ্যে চলে এলো র‍্যাক। ইস্পাত দিয়ে দুটো হাত এক করে বাঁধা, রাইফেলটাকে কিছুর সাথে বাড়ি না খাইয়ে নামিয়ে আনতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল ও।

সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে কয়েক সেকেণ্ড আর কোনো দিকে খেয়াল থাকলো না ওদের।

'যেখান থেকে নিয়েছেন সেখানেই রেখে দিন,' নিচু একটা গলা শোনা গেল।

পাথর হয়ে গেল রানা। হাতে রাইফেল নিয়ে পিছনের সিটে বসে আছে ও, কক্ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। ধরা পড়ে গিয়েও জানালার দিকে মুখ তুললো না ও। শেষ সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে

গেল।

'যা বলছি শুনুন,' আবার নিচু গলায় ইংরেজীতে বললো ভালডেজ। 'রাইফেল রেখে নিজের সিটে ফিরে যান।'

আয় শালা, রাইফেল কেড়ে নিতে চেষ্টা কর।—মনে মনে বললো রানা। ক্যাপটেনকে নাগালের মধ্যে পেতে চাইছে ও। মরার আগে অন্তত একটাকে নিয়ে মরবে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মিঃ রানা। আপনাকে বুঝতে হবে, আমরা সবাই ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি। একটু আশা আছে আপনি শুধু যদি চুপচাপ থাকেন।' পকেট থেকে ইগনিশন কী বের করলো সে, পিস্তল হোলস্টারের ফ্ল্যাপ আলগা করলো। বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'ওদের আমি নিরস্ত্র করেছি, তিনজনই কাজে ব্যস্ত·· ল্যাণ্ড-রোভারে আমি যখন ঢুকবো, বাধা দেবেন না আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন—বুঝতে পারছেন?'

ভুরু কুঁচকে উঠলেও, মাথা ঝাঁকালো রানা।

রাইফেল রেখে রানাকে নিজের সিটে ফিরে আসার সময় দিলো ক্যাপটেন, তারপর ড্রাইভারের দরজা খুলে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়লো। একটা হাত হুইলে রেখে পিছন ফিরে জানালা দিয়ে লোক তিনজনের দিকে তাকালো একবার। ছুটো কবরে কোমর সমান নেমে আছে ওরা। ব্যস্ত, আরো গভীর করছে গর্ত।

ইগনিশনের চাবি ঢোকালো ভালডেজ। ঘোরালো।

গর্জে উঠলো স্টার্টার মটর, একসাথে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালো ট্রুপাররা। স্টার্টার মটর বার কয়েক ঘর ঘর আওয়াজ করে থেমে গেল, ইঞ্জিন চালু হলো না। ট্রুপারদের একজন হুংকার ছাড়লো, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো কবর থেকে। সারা শরীর ঘামে

ভিজে আছে, তার সাথে ধুলো-কাদা মিশে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে ছুটে আসছে সে।

ঘন ঘন অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো ভালডেজ, ইগনিশন-চাবি ঘুরিয়ে আবার ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেই একই অবস্থা—স্টার্টার গর্জে ওঠে, কিন্তু ইঞ্জিন চালু হয় না। স্টীল রিমের ভেতর ভালডেজের চোখ জোড়া আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

ছুটন্ত ট্রুপার প্রায় পৌঁছে গেছে। বাকি দু'জন, ততোটা সতর্ক নয়, তবে অনুসরণ করছে তাকে।

'দরজা বন্ধ করুন।' চিৎকার করলো রানা। এক টানে নিজের দিকের দরজা বন্ধ করলো ক্যাপটেন, ঝাপটা দিয়ে লক পজিশনে নামিয়ে আনলো হাতলটা। সেই সাথে দরজার ওপর কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো ট্রুপার। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাইরের হাতল ঘোরাতে চেষ্টা করলো সে, তারপর ছুটলো পিছনের দরজার দিকে। সোহানা সেটা লক করার আগেই ঝাঁকি দিয়ে টেনে খুলে ফেললো, ভেতরে মাথা আর কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়ে দু'হাতে ধরলো সোহানাকে। খোলা দরজা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সিটের ওপর ঘুরে বসলো রানা, হাতকড়া পরা হাত দুটো মাথার ওপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনলো ট্রুপারের কামানো চাঁদিতে। ইস্পাতের ধারালো কিনারা খুলির হাড় পর্যন্ত ঢুকে গেল, মুখ থুবড়ে খোলা দরজার ওপর পড়ে নিথর হয়ে গেল লোকটা, বাইরে অর্ধেক-টা ঝুলছে। তার মাথায় আবার মারলো রানা, ক্ষতের গভীরে সাদা হাড় দেখতে পেলো ও, উজ্জ্বল দ্রুতগতি রক্ত ঢেকে ফেললো হাড়-টাকে। বাকি দু'জন ট্রুপারও প্রায় পৌঁছে গেল, মাথার ওপর কোদাল তুলে তেড়ে আসছে। এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠলো ইঞ্জিন,

হাত ঝাপটা দিয়ে গিয়ার দিলো ভালডেজ।

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। সিট থেকে ছিটকে অর্ধেক শরীর দিয়ে সোহানার ওপর পড়লো রানা, আর রক্তাক্ত ট্রুপারকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কাঁটাঝোপ।

বার বার কাত হলো গাড়ি, মনে হলো উল্টে যাবে। মাটি এদিকে উঁচু-নিচু, ফুটবলের মতো ড্রপ খেতে খেতে এগুলো ল্যাণ্ড-রোভার। হুংকার ছাড়তে ছাড়তে এখনো পিছু ধাওয়া করছে দু'জন ট্রুপার। পিছনের খোলা দরজা প্রতি মুহূর্তে দড়াম দড়াম বাড়ি খেলো। হুইল সোজা করে নিয়ে গিয়ার বদল করলো ক্যাপটেন। গতি পেয়ে জোরে ছুটলো গাড়ি, পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো ট্রুপাররা। ওদের একজন মরিয়া হয়ে হাতের কোদালটা ছুঁড়ে দিলো ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে! পিছনের জানালা চুরমার হয়ে গেল, ক্যাবের পিছনে ছড়িয়ে পড়লো টুকরো কাঁচ।

উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথে ছুটছে গাড়ি। ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, এতোক্ষণে দ্রুত হলো গতি, এখন কেউ আর দৌড়ে এসে ধরতে পারবে না ওদের। হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রুপাররা। খানিক পর গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল তারা, আরো একটু পর তাদের অশ্রাব্য গালিগালাজও আর শোনা গেল না।

মেটো পথের ওপর ফিরে এলো ল্যাণ্ড-রোভার। স্পীড আরো একটু বাড়িয়ে দিলো ক্যাপটেন। 'আপনার হাত দুটো দিন, মিঃ রানা,' বললো সে। রানা হাত বাড়াতে হাতকড়ার তালা খুলে দিলো। 'নিন!' রানার মুঠোয় চাবি গুঁজে দিলো সে।

মুক্ত কব্জি দুটো পালা করে ডলতে শুরু করলো সোহানা।

'আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো···।'

পথের ওপর চোখ রেখে হেসে উঠলো ভালডেজ। 'ভেবে দেখুন, আপনার বন্ধু এই বান্দাকেই আরেকটু হলে গুলি করে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন।' রানার দিকে একবার তাকালো সে। 'মিঃ রানা, হাতে একটা রাইফেল রাখুন। আরেকটা আমাকে দিন।'

বেঁটে, কদাকার রাইফেল দুটো সিটের ওপর দিয়ে হস্তান্তর করলো সোহানা। রেগুলার আর্মির মধ্যে শুধু থার্ড ব্রিগেডই এ-কে ফরটিসেভেন ব্যবহার করে, ওরা উত্তর কোরিয়ান ইন্সট্রাক্টরদের কাছে ট্রেনিং পেয়েছে।

দ্রুত হাতে বাঁকা "ব্যানানা" ম্যাগাজিন চেক করলো রানা, তারপর রিলোড করলো চেম্বার। অস্ত্রটা প্রায় নতুন, নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়েছে। হাতে এটা থাকায় গোটা ব্যক্তিত্বই যেন বদলে গেল। কয়েক মুহূর্ত আগেও ঘটনাপ্রবাহের অসহায় শিকার ছিলো রানা, কিছুর ওপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। দ্বিধা আর অনিশ্চয়তায় ভুগছিল, ফুঁসছিল নিষ্ফল আক্রোশে। কিন্তু এখন সে সশস্ত্র। এখন সে পাল্টা আঘাত হানতে পারে। রক্ষা করতে পারে নিজেকে, রক্ষা করতে পারে আপনজনকে।

সিটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সোহানার কাঁধ ধরলো রানা। কাঁধ থেকে ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো সোহানা।

'এখন আমরা অন্তত লড়তে পারবো।' রানার এই নতুন সুরে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, সোহানাকেও তা স্পর্শ করলো। দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলো রানা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হুইস্কির বোতলটা বের করলো ও, সোহানার হাতে ধরিয়ে

দিলো। তারপর সোহানার কাছ থেকে নিয়ে ভালডেজকে দিলো।

'এবার শুরু করুন, ক্যাপটেন,' বললো ও 'আসলে কি ঘটছে বলুন তো?'

বোতল থেকে এক ঢোক হুইস্কি গিলে, বোতল কতোটা খালি হয়েছে দেখলো ভালডেজ। 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, মিঃ রানা। আমার ওপর জেনারেল উমাঙ্গোর নির্দেশ ছিলো, আপনাদের খুন করে লাশ গায়েব করে ফেলতে হবে। তারপর আপনাদের নিখোঁজ হওয়ার জন্যে দায়ী করা হবে ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের।'

'সেই নির্দেশ আপনি পালন করেননি। কেন?'

উত্তর দেয়ার আগে বোতলটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলো ভালডেজ, কাঁধের ওপর দিয়ে সোহানার দিকে একবার তাকিয়ে নিলো। 'আমার সাথে ওরা যারা ছিলো, সবাই ইংরেজী জানতো। আমি যে আপনাদের দলে, কথাটা বলতে পারিনি। আপনাদের খুন করার সমস্ত প্রস্তুতি বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছে আমাকে, আমি চাইনি ওরা কিছু সন্দেহ করুক।'

'ক্যাপটেন ভালডেজ, আই লাভ ইউ ফর হোয়াট ইউ আর ডুয়িং,' বললো সোহানা, 'কিন্তু বলবেন কি, এ কাজ আপনি কেন করছেন?'

'কেউ জানে না, শুধু আপনাদেরকেই প্রথম বলছি, আমার মা ছিলো একজন ম্যাটাবেল,' যেন কেউ শুনতে পাবে এই ভয়ে ফিস-ফিস করে কথা বলছে ক্যাপটেন। 'আমি খুব ছোটো থাকতে মা মারা যায়, কিন্তু তার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। বাবার কাছে একজন শোনা হিসেবে বড় হলাম বটে, কিন্তু আমি কখনো ভুলতে পারিনি আমার শরীরে ম্যাটাবেল রক্ত রয়েছে।' ওদের

দিকে তাকালো না। ভালডেজ, পথের ওপর চোখ রেখে কথা বলে গেল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হলো ম্যাটাবেল উপজাতির ওপর ম্যাশোনাদের নির্মম অত্যাচার। সেনাবাহিনীতে আছে বলে এই কোন্দল আর নোংরা রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়ায়নি ভালডেজ, ম্যাটাবেলদের জন্যে মনে মনে শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাশোনারা ম্যাটাবেল নেতাদের এক এক করে জেলে ভরতে শুরু করে, বিনা দোষে নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে ধরে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠায়, ম্যাটাবেলদের গ্রামগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ-সব দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি ভালডেজ, বোকার মতো নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ফেলেছে। জেনারেল উমাঙ্গো তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে বুঝতে পারে ভালডেজ আর তার কোনো কাজে আসবে না। উমাঙ্গো যে তাকেও বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবে না, ছোটোখাটো লক্ষণ দেখে সেটা টের পেয়ে যায় ভালডেজ। তার ধারণা, এটাই তাকে দেয়া শেষ কাজ। 'আপনাদের লাশ পুঁতে ফিরে গেলেই উমাঙ্গো আমার ব্যবস্থা করতো, অন্তত আমার তাই ধারণা। হয় আপনাদের মতো আমাকেও পুঁতে ফেলা হতো, না হয় উমাঙ্গো তার পোষা চিতা আর হায়েনাদের সামনে ফেলে দিতো আমাকে।'

'উমাঙ্গোর পোষা চিতা?' ভুরু কুঁচকে তাকালো রানা। এই কথাগুলো টুটি মিশন স্কুলের হেড মিসট্রেস মিরাণ্ডা নয়নিও ব্যবহার করেছিল। 'এর মানে কি?'

'চিতা মানে চিতা, হায়েনা মানে হায়েনা,' ব্যাখ্যা করলো ভাল-ডেজ। 'প্রতিটি পুনর্বাসন কেন্দ্রের আশপাশে চিতা আর হায়েনা পোষে জেনারেল উমাঙ্গো, কেউ অবাধ্য হলে বা অত্যাচারে মারা গেলে তাকে ওগুলোর খাদ্য হিসেবে জঙ্গলে ফেলে আসা হয়।

জানোয়ারগুলো হাড়ের একটা কণা বা ছালের একটা লোম পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখে না, সব খেয়ে ফেলে।'

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠলো সোহানা। 'টুটিতে আমরা চিতা আর হায়েনার ডাক শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। উমাঙ্গো আমা-দের সাবধান করে বলেওছিলো, ভুলেও যেন ক্যাম্পের বাইরে না যাই। এভাবে কতোজনকে মারা হয়েছে?'

'হিসেব নেই···হাজার হাজার।'

'কী ভয়ংকর!'

'ম্যাটাবেলদের ওপর জেনারেল উমাঙ্গোর ঘৃণা সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। তার বেলায় এটা একটা ম্যাডনেস। একটাই কথা তার, ওদেরকে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। গোটা ম্যাটাবেল উপজাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছে সে। প্রথমে নেতাদের খতম করছে, দেশদ্রোহের মিথ্যে অভিযোগ তুলে···জেনারেল টস মাজুলেটের কথাই ধরুন··· ।'

'সেকি—না!' সোহানা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো। 'এ আমি সইতে পারবো না—জেনারেল মাজুলেট নির্দোষ?'

রানা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল, শুধু চোয়াল দুটো একবার উঁচু হয়ে উঠলো ওর, কপালের পাশে তির তির করে কেঁপে উঠলো একটা শিরা।

'জেনারেল মাজুলেটকে ফাঁসাবার জন্যে চিন্তার অতীত সতর্ক ছিলো উমাঙ্গো। অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে একটু একটু করে এগিয়েছে। সে জানতো, রাজনৈতিক অভিযোগ তুলে জেনারেল মাজুলেটকে ফাঁসানো যাবে না, তাহলে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতি বিদ্রোহ করবে। আপনারা তাকে নিখুঁত একটা সুযোগ নিয়ে এসে

দেন—এ নন-পলিটিকাল ক্রাইম।'

'আজ বুঝলাম, কি বোকামি করেছি আমি,' বললো সোহানা। 'কিন্তু জেনারেল মাজুলেট যদি না হন, মাস্টার পোচার তাহলে কে?'

'জেনারেল উমাঙ্গো স্বয়ং।'

'আপনি ঠিক জানেন?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো রানা।

'বিমানে হাতির দাঁত তোলার কাজটা আমিই তো তদারক করতাম।'

'কিন্তু সে-রাতে কোরাই রোডে?'

'ওটার আয়োজন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। উমাঙ্গো জানতো, আগে বা পরে টুটি মিশনে জেনারেল মাজুলেট যাবেনই। জেনারেল মাজুলেটের সেক্রেটারীই আমাদেরকে তারিখ আর সময় জানিয়ে দেয়। তেরপল ঢাকা ট্রাকে আমরাই হাতির দাঁত আর চিতার ছাল ভরে দিই, ড্রাইভার ছিলো একজন ম্যাটাবেল। তাকে আমরা পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে মুক্তির লোভ দেখিয়ে এই কাজে রাজি করাই। তবে জেনারেল মাজুলেট যে ওরকম ভয়ংকর হয়ে উঠবেন সেটা আমরা কেউ আশা করিনি। ব্যাপারটা আমাদের জন্যে বোনাস হয়ে দেখা দেয়।'

এই পথে যতো জোরে সম্ভব ল্যাণ্ড-রোভার চালাচ্ছে ভালডেজ। নিজেদের সিটে কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা আর সোহানা, মৃত্যুর কিনারা থেকে ফিরে আসার আনন্দ দ্রুত চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড ক্লান্তি আর নির্মম দুঃখবোধে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'বতসোয়ানা সীমান্তে।'

দক্ষিণ আর পশ্চিমে বতসোয়ানা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, প্রতিবেশী

দেশগুলোর রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা ওখানে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ বোধ করে।

'ম্যাটাবেলদের ওপর কি ঘটছে, যাবার পথে দেখার সুযোগ পাবো আমরা। দক্ষিণ-পশ্চিম ম্যাটাবেলিল্যাণ্ড সম্পূর্ণ সীল করে দিয়েছে উমাঙ্গো—সাংবাদিক, যাজক, রেডক্রস কারো ঢোকার অনুমতি নেই।'

পথের ওপর উই-পোকা গর্ত করে রেখেছে, গাড়ির গতি কমাতে বাধ্য হলো ভালডেজ। গর্তের ভেতর চাকা ডেবে গেল দু'বার, দু'বারই গাড়ি ঠেলে গর্ত থেকে চাকা তুলতে হলো।

স্পীড আবার বাড়িয়ে দিয়ে ভালডেজ বললো, 'উমাঙ্গো যে পাস দিয়েছে, সেটা দেখিয়ে খানিক দূর যেতে পারবো আমরা, কিন্তু সীমান্ত পর্যন্ত যেতে পারবো না।'

'তাহলে?' জানতে চাইলো সোহানা।

সীমান্ত পেরোবার পয়েন্টে না পৌছুনো পর্যন্ত সাইড আর ব্যাক রোড ব্যবহার করতে হবে। আমার দলবদলের ব্যাপারটা একটু পরেই জেনে ফেলবে উমাঙ্গো। আমাদের পিছনে গোটা থার্ড ব্রিগেড লেলিয়ে দেবে সে। সেটা ঘটতে শুরু করার আগে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাই আমি।'

পথের মোড়ে এসে পৌছুলো ওরা, ল্যাণ্ড-রোভার থামালো ভালডেজ। কিন্তু ইঞ্জিন চালু থাকলো। লেদার ম্যাপ কেস থেকে একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ বের করলো সে। খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর বললো, 'রেললাইনের ঠিক দক্ষিণে রয়েছি আমরা। এই রাস্তাটা এম পাণ্ডেনি মিশন স্টেশনের দিকে চলে গেছে। আমাদের খোঁজ শুরু হবার আগে ওখানে যদি পৌছুতে পারি, তাহলে মাদাবা আর

মাতসুমির মাঝখান দিয়ে বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করা যাবে। বত-সোয়ানা পুলিশ বেড়া বরাবর সারাক্ষণ পেট্রল দেয়।

'ওদিকেই চলুন,' বললো রানা। প্রথমে নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার ওদের, আর সব কথা পরে ভাবা যাবে। ম্যাপ ভাঁজ করে রেখে দিলো ভালডেজ, আবার ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার।

কয়েক মিনিট পর সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'আরো কিছু প্রশ্ন আছে আমার।'

'বলুন।'

'বোস পরিবারকে খুন করা হলো কেন? শুধু বোস পরিবার নয়, শ্বেতাঙ্গ আর ভারত থেকে আসা বহু পরিবারকে মেরে ফেলা হয়েছে। এসবের জন্যে, আপনি বলতে চাইছেন, জেনারেল মাজুলেট দায়ী নয়?'

'মোটেও না। আগে কিছু খুন-খারাবি অবশ্য ম্যাটাবেলরাই করেছে, কিন্তু জেনারেল মাজুলেট মরিয়া হয়ে ওদের কন্ট্রোলে আনার চেষ্টা করছিলেন। আমার বিশ্বাস টুটি মিশনে সেজন্যেই সেদিন যাচ্ছিলেন তিনি, চরমপন্থী ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে।'

'কিন্তু রক্ত দিয়ে দেয়ালে ওই লেখাগুলো—জেনারেল মাজুলেট দীর্ঘজীবী হোন?'

এবার কথা বলতে পারলো না ভালডেজ, তার চেহারা বিকৃত হয়ে উঠলো, যেন ভয়ংকর একটা দ্বন্দ্বে ভেতরটা তার ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

সোহানা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকালো, কিন্তু ভালডে-জকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

খানিক পর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো ক্যাপটেন। 'আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, সত্যি কথাই বলবো আমি। শুধু অনুরোধ করবো, আমার পজিশনটা আপনাদের বুঝতে হবে।'

চুপ করে থাকলো ওরা।

'আমি...আমিই বোস পরিবারকে খুন করার সমস্ত আয়োজন করি। পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়ে ওদের খুন করার জন্যে লোক বাছাই করতে হয় আমাকে। মুক্তির লোভ দেখিয়ে ওদেরকে কাজগুলো করতে রাজি করাই। কোথায় যেতে হবে, কাকে মারতে হবে, দেয়ালে কি লিখতে হবে—সব আমিই তাদের বলে দিই। আমার কাছ থেকেই অস্ত্র আর থার্ড ব্রিগেডের গাড়ি পায় ওরা।' জঘন্য অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করছে ক্যাপটেন, গলা একটুও কাঁপছে না, শুধু চোখ থেকে নেমে আসছে পানির দুটো ধারা। 'উমাঙ্গোর নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমার ছিলো না। আমি একটা কাপুরুষ ছিলাম, জেনে শুনে...'

'ওদের তাহলে উমাঙ্গোর নির্দেশে খুন করা হয়?'

'হ্যাঁ। ম্যাটাবেল বিদ্রোহীদের দিয়ে খুন করিয়ে গোটা ম্যাটাবেল উপজাতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে সে—এটা তার সূক্ষ্ম একটা কৌশল ছিলো। ম্যাটাবেলরা নিরীহ মানুষকে পাইকারীভাবে মেরে ফেলছে এই অজুহাত দেখিয়ে থার্ড ব্রিগেডকে ওদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে সে। আগেই বলেছি, ম্যাটাবেলদের জাত শত্রু উমাঙ্গো, গোটা উপজাতিকে ধ্বংস না করে শান্ত হবে না সে। এবার নিশ্চই আপনারা বুঝতে পারছেন, কেন আমি পালাচ্ছি?'

'মাজুলেট এখন কোথায় জানেন?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'তাকেও কি উমাঙ্গো, মেরে ফেলতে চায়?'

'কোথায় জানি না। তবে জেনারেল মাজুলেটকে উমাঙ্গো মারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাকে জ্যান্ত দরকার ওর। তাকে নিয়ে ওর একটা প্ল্যান আছে...'

'কি প্ল্যান?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলো রানা।

'তা জানি না। তবে...একজন বিদেশী লোকের সাথে তাকে আমি আলোচনা করতে দেখেছি। কোনো কমিউনিস্ট দেশের প্রতি-নিধি হবে লোকটা।'

'রাশিয়ান?'

মাথা নাড়লো ভালডেজ। 'কি জানি। জার্মান হতে পারে, অনেক-গুলো ভাষায় কথা বলে—রুশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইংলিশ।'

'লোকটাকে আপনি নিজের চোখে দেখেছেন, ক্যাপটেন?'

'দেখেছি। বেশ কয়েকবারই দেখেছি।'

ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। উমাঙ্গোর যদি ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য থাকে, লোকটা যে-দেশেরই হোক, ইন্টেলিজেন্সের কোনো অফিসার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'বিদেশী লোকটার কথা আপাততঃ থাক। মাজুলেটকে কোথায় রাখা হয়েছে আপনি জানেন না। এবার, সাউল র‍্যাঙ্কিং কোম্পানী সম্পর্কে বলুন। উমাঙ্গো আমার সম্পত্তি কেড়ে নিলো—নিজের জন্যে, না সরকারের জন্যে?'

'অবশ্যই নিজের জন্যে, স্যার।'

'কিভাবে? মানে, সম্পত্তিটা নিজের নামে করতে গেলে আইন তাকে বাধা দেবে না?'

'সব দিক গুছিয়ে নিয়েই কাজে হাত দিয়েছে উমাঙ্গো। স্বীকা-রোক্তি দিয়ে আপনি এ-দেশের শত্রু হয়েছেন। আপনার সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ল্যাণ্ড-ব্যাংক আপনার লোনের জন্যে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়েছিল, কিন্তু এখন তারা বলবে সম্পত্তির মালিক দেশের শত্রু হওয়ায় তাদের আর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকলো না। অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক আপনাকে যে টাকা ধার দিয়েছিল সেটা তারা ফিরে পাচ্ছে না। সরকার বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিক্রি করার জন্যে টেণ্ডার ডাকবে, শুধু উমাঙ্গোর টেণ্ডারই গ্রহণ করা হবে। শত্রু-সম্পত্তি মন্ত্রণালয়ে উমাঙ্গোর ভগ্নীপতি সবচেয়ে বড় পদ দখল করে বসে আছে। অর্থাৎ নামমাত্র টাকায় ওটা কিনে নেবে উমাঙ্গো।'

সারাদিন চলার মধ্যে থাকতে হবে, কাজেই মুখে কিছু দেয়ার তাগাদা অনুভব করলো ওরা। পথ থেকে সরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকলো ল্যাণ্ড রোভার। ছুরি দিয়ে ঝোপ কেটে নিয়ে এলো সোহানা আর ভালডেজ, গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সেগুলো ঘন করে বিছিয়ে দিলো রানা, বিশেষ করে আকাশ থেকে যাতে ল্যাণ্ড রোভারকে দেখা না যায়। প্যাসেঞ্জার সিটের নিচের লকার থেকে ইমার্জেন্সী রেশন বের করলো ভালডেজ। ফ্লোরবোর্ডের নিচের ট্যাংক থেকে বেরুলো খাবার পানি।

একটা মেটাল ক্যানটিনে বালি ভরলো সোহানা, রিজার্ভ ট্যাংক থেকে গ্যাসোলিন নিয়ে সেই বালি ভিজিয়ে আগুন ধরালো। 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,' মন্তব্য করলো রানা। আগুনের শিখা লক লক করে উঠলো, কিন্তু কোনো ধোঁয়া থাকলো না। চায়ের জন্যে পানি গরম করতে দিলো সোহানা।

খেতে বসে বিশেষ কথা হলো না। একবার উঠে গিয়ে ভলিউম বাড়িয়ে রেডিওর কথাবার্তা শুনলো ভালডেজ, ফিরে এসে মাথা নাড়লো সে। 'আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সীমান্ত এখান থেকে কতোদুর ?' গরুর ঠাণ্ডা মাংস মুখে পুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'চল্লিশ মাইল—কিছু বেশিও হতে পারে।'

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠলো রেডিও। লাফ দিয়ে ছুটে গেল ভালড়েঞ্জ। এবার সাথে সাথে ফিরে না এসে মনোযোগ দিয়ে শুনলো—বেশ অনেকক্ষণ ধরে। যখন ফিরে এলো, গম্ভীর দেখালো তাকে।

'কি ব্যাপার ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমাদের অল্প ক'মাইল সামনে থার্ড ব্রিগেডের একটা ইউনিট রয়েছে,' বললো ক্যাপটেন। 'এমপাণ্ডেনি মিশন স্টেশনে ছিলো ওরা, এইমাত্র রওনা হয়েছে। বিদ্রোহীদের আস্তানা ধ্বংস করে ফিরে যাচ্ছে ঘাটিতে। সম্ভবত এই পথ দিয়েই যাবে ওরা।' এক সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বললো সে, 'আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।'

'রাস্তা থেকে আমাদের দেখা যায় কিনা চেক করছি আমি,' বলে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো রানা। 'সোহানা, আগুন নেভাও। ক্যাপটেন, কাভার দিন আমাকে।'

রাইফেল তুলে নিয়ে পথের দিকে ছুটলো ও। পথের ওপর দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো, ডালপালা দিয়ে ঢাকা ল্যাণ্ড-রোভারের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় কিনা। তারপর নিজের পায়ের, আর ল্যাণ্ড-রোভারের চাকার দাগ ঢাকার জন্যে পাতাবহুল ডাল ফেললো পথের ওপর। রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় ঘাসের ওপর দিয়ে এসেছে গাড়ি, উবু হয়ে বসে নুয়ে পড়া ঘাসগুলোকে যথাসম্ভব খাড়া করার চেষ্টা করলো। কাজটা নিখুঁত হলো না, তবে ছুটন্ত একটা গাড়ি থেকে এতো ছোটোখাটো ব্যাপার কারো

চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। সিধে হয়ে দাঁড়ালো রানা, সেই সাথে বাতাসের সাথে ভেসে এলো মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন। ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ, চিনতে পারলো ও।

ছুটে ল্যাণ্ড-রোভারে এসে উঠলো রানা, সামনের সিটে ভাল-ডেজের পাশে বসলো।

'আপনার রাইফেল র‍্যাকে রেখে দিন,' বললো ক্যাপটেন। রানা ইতস্তত করছে লক্ষ্য করে আবার মুখ খুললো সে, 'প্লিজ, যা বলছি শুনুন, মিঃ রানা। ওরা যদি আমাদের দেখতে পায়, ফাইট করার কোনো মানেই থাকবে না। আমি ওদের ভুল বুঝিয়ে বোকা বানা-বার চেষ্টা করবো। কিন্তু আপনার হাতে অস্ত্র থাকলে কিছুই আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোহানার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিলো রানা। নিজেকে ওর নগ্ন আর অসহায় লাগলো। কোলের ওপর হাত দুটো শক্ত মুঠো করে রাখলো ও। র‍্যাকে রাইফেল রেখে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলো সোহানা, মৃদু চাপ দিলো। ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। বোঝা গেল, একটা কনভয় আসছে। এরপর হঠাৎ করে অনেক মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়লো ওদের ওপর।

গানের আওয়াজ বাড়তে লাগলো। অদ্ভুত ছন্দময় আফ্রিকান ভাষার গান, সুরের প্রতিটি বিরতিতে একটা করে হুংকারের মতো দুর্বোধ্য আর্তনাদ আছে—ঘাড়ের পিছনে রানার চুল খাড়া হয়ে গেল।

'থার্ড ব্রিগেড,' নিচু গলায় বললো ভালডেজ। 'রেজিমেন্টের নিজস্ব সঙ্গীত।' তারপর সৈনিকদের সাথে গলা মিলিয়ে নিজেই গাইতে শুরু করে দিলো সে।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে ধুলোর পাহাড় দেখলো রানা। গানের আওয়াজ একেবারে কাছে চলে এলো। উইণ্ডশীল্ডে রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠলো। ডালপালার একটা ফাঁকে চোখ রেখে কনভয়-টাকে দেখতে পেলো ও। বাদামী রঙের তিনটে ট্রাক, প্রতিটি ট্রাকের পিছনে গিজ গিজ করছে সৈনিকদের বুশ হ্যাট পরা মাথা। প্রত্যেকে ব্যাটল-ক্যামোফ্লেজ পরে আছে, হাতে রাইফেল নিয়ে সদা-প্রস্তুত। শেষ ট্রাকের ক্যাবে একজন অফিসার রয়েছে, শুধু এই একজনের পরনেই লালচে বেরেট আর রূপালি ক্যাপ-ব্যাজ দেখা গেল। লোকটা সরাসরি রানার চোখে তাকালো, মনে হলো একদম কাছ থেকে, ডালপালার ফাঁকগুলো হঠাৎ যেন বড় বেশি ফাঁক ফাঁক ঠেকলো ছিটকে নিজের সিটে পিছিয়ে এলো রানা।

কোনো বিপদ ঘটলো না, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল আর্মি কনভয়। ইঞ্জিন আর গানের শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকটাকে হালকা করলো ভালডেজ। 'আরো দল আসবে,' সাবধান করে দিয়ে বললো সে। ইগনিশন কী-তে আঙুল রেখে অপেক্ষা করলো, ট্রাক ইঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে চালু করলো ল্যাণ্ড-রোভার।

পথের ওপর উঠে এসে কনভয়ের উল্টো দিকে ছুটলো ল্যাণ্ড-রোভার। বিশ মিনিট পর হঠাৎ মাথা নিচু করে উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো ক্যাপটেন। 'ধোঁয়া,' বললো সে। 'ঠিক সামনেই এমপাণ্ডেনি। ক্যামেরা রেডি রাখবেন, মিস সোহানা। আমার ধারণা, থার্ড ব্রিগেড আপনার ছবির জন্যে প্রচুর খোরাক রেখে গেছে।'

মিশন গ্রামটাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে ভুট্টাক্ষেত। পেকে

হলুদ হয়ে আছে ফসল, শুধু কাটার অপেক্ষা। মেয়েরা কাজ করছিল ক্ষেতে, তাদের একজন মেটো পথের ওপর পড়ে আছে। ছুটছিল, পিছন থেকে পিঠে গুলি করা হয়েছে, দুই স্তনের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পিঠে ঝোলার ভেতর ছিলো বাচ্চাটা, মা হয়তো ছুটছিল বলেই গুলির সময় ঝোলাটা একপাশে সরে যায়, তাই বাচ্চাটাকে গুলি লাগেনি—বেয়নেট চার্জ করে মারা হয়েছে তাকে। ওরা পাশ কাটাবার সময় নীল মাছির ঝাঁক ভন ভন করে লাশ ছেড়ে উঠে পড়লো, তারপর আবার ঝাঁক বেঁধে বসলো।

কারো মুখে কথা নেই। ক্যামেরা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে নিকন-টা বের করলো সোহানা, তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে।

দ্বিতীয় মেয়েটা রাস্তা থেকে খানিক দূরে পড়ে আছে—ঠিক লাশ বলা যাবে না, রক্তরাঙা কাপড়ের একটা পোঁটলা। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা কুড়েঘর। প্রতিটি জ্বলছে পরিষ্কার নীল আকাশের একটা অংশ ঢাকা পড়ে গেছে কালো ধোঁয়ায়। বেশির ভাগ লাশই জ্বলন্ত কুঁড়েঘরে ফেলে দিয়ে গেছে ওরা। রক্তের অনেকগুলো ক্ষুদে পুকুর দেখা গেল, প্রতিটি পুকুর থেকে ধুলোর ওপর দিয়ে মোটা একটা দাগ চলে গেছে কুড়েঘরগুলোর দিকে। গুলি খেয়ে গ্রামের লোকেরা যেখানে পড়েছে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের। বাতাসে মাংস পোড়ার তীব্র গন্ধ, মাথার মগজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায়। গন্ধটা ওদের টাকরায় জমে যাওয়া চর্বির মতো লেপ্টে থাকলো। রানার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো, নাকে আর মুখে হাতচাপা দিলো ও।

'এরা বিদ্রোহী?' অস্ফুটে বললো সোহানা। তার ঠোঁট বরফের মতো সাদা। কাঁপা হাতে ছবি তুলছে সে।

মুরগীগুলোও রেহাই পায়নি, মৃদু বাতাসে তাদের পালক উড়ছে।

'থামুন।'

মাথা নাড়লো ক্যাপটেন। 'থামলে বিপদ হতে পারে।'

'থামুন।' আবার চিৎকার করলো সোহানা।

দরজা খোলা রেখেই ছুটলো সোহানা, কুড়েঘরগুলোর মাঝখানে চলে এলো। দ্রুত নিজের কাজ সারলো সে, একের পর এক ফিল্মের রোল বদলালো। লেন্সের ভেতর চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত, সাদা ঠোঁট কাঁপছে।

'আমরা আর দেরি করতে পারি না,' অস্থির হয়ে উঠলো ভালডেজ।

'আরেকটু।' বলে সামনে এগোলো সোহানা—ঝুঁকে, হাঁটু গেড়ে বসে, কখনো পিছু হটে এসে বা সামনে ছুটে গিয়ে ক্যামেরার শাটার টিপছে ঘন ঘন। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো কয়েকটা ঘর দেখে সেদিকে এগোলো সে, আড়ালে হারিয়ে গেল। মাংস পোড়ার উৎকট দুর্গন্ধ আর আগুনের আঁচ অসহ্য মনে হলো রানার।

সোহানা চিৎকার করতেই ল্যাণ্ড-রোভার থেকে লাফ দিয়ে ছুটলো ওরা, ছোটার মধ্যেই দ্রুত হাতে রাইফেল কক করে নিলো। দু'জনের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে এগোলো ওরা, পরস্পরকে যাতে কাভার দিতে পারে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে পিছন দিকে বেরিয়ে এলো রানা।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, এখন আর ক্যামেরা ব্যবহার করার শক্তি নেই। কালো, নগ্ন একটা মেয়ে পড়ে আছে তার পায়ের সামনে। মেয়েটার ওপরের অংশ স্বাস্থ্যবতী যুবতীর বলে চেনা যায়, কিন্তু নাভির নিচে চামড়াহীন বীভৎস একটা দৃশ্য।

তাকে ওরা আগুনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জীবন বড় প্রিয়, আগুন থেকে নিজের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। শরীরের নিচের অংশে কোনো কোনো জায়গা গভীর-ভাবে পোড়েনি, সেখানে সাদা চর্বি আর লাল মাংস বেরিয়ে আছে। অন্যান্য জায়গায় সাদা হাড় দেখা গেল। তলপেটের নিচে চামড়া বলতে কিছু নেই, শুধুই দগদগে ঘা। ছ'পাশের হিপ-বোন পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। পুড়ে গিয়ে ফেটে গেছে পেট, বাধা না থাকায় ফুলে উঠেছে ভেতরের নাড়িভুড়ি, একটু নড়াচড়া করলেই যেন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। আশ্চর্য, এখনো বেঁচে আছে সে। আঙুলগুলো ধুলোর ওপর নড়াচড়া করছে। কোনো শব্দ নেই, কিন্তু ঘন ঘন খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে মুখ। চোখ জোড়া সবটুকু খোলা, সজাগ এবং কাতর।

সোহানার কাঁধ ধরে তাকে নিজের দিকে ফেরালো রানা। ডুকরে কেঁদে উঠে রানার বাহুতে মুখ ঘষলো সোহানা, তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠলো।

'আপনারা ল্যাণ্ড-রোভারে ফিরে যান,' ভালডেজ বললো। 'ওর জন্যে আমাদের কারো কিছু করার নেই।'

সোহানাকে জড়িয়ে নিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে গেল সোহানা, কিন্তু রানা বাধা দিলো।

জ্বলন্ত ঘরটার কোণে পৌঁছে পিছন দিকে তাকালো রানা। বোবা মেয়েটার আরো কাছে সরে গেছে ভালডেজ, কোমরে রাইফেল নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অভাগীর দিকে। তার চেহারায় মেয়ে-টার সমস্ত কষ্ট আর আবেদনের ছায়া পড়েছে।

ঘরটাকে ঘুরে ল্যাণ্ড-রোভারের দিকে এগোলো ওরা। ওদের পিছনে গুলির আওয়াজ হলো একটা, আগুনের শব্দে ভোঁতা শোনালো। হোঁচট খেলো সোহানা, তারপর তাল সামলে নিলো। ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে পৌঁছে ক্যাবের গায়ে হেলান দিলো সে, গলাটা লম্বা করে দিয়ে ধুলোর ওপর হড়হড় করে বমি করলো। সোজা হয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছলো, লক্ষ্যই করেনি রানা একটা রুমাল বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে।

ক্যাব থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করলো রানা। আর এক ইঞ্চির মতো অবশিষ্ট আছে। বোতলটা রানার হাত থেকে নিয়ে পানির মতো ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললো সোহানা। খালি বোতলটা ফিরিয়ে নিলো রানা, তারপর হঠাৎ করে নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলন্ত ঘরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলো সেটা।

ঘরের কোণে দেখা গেল ভালডেজকে, মাথা নিচু করে এগিয়ে আসছে। নিঃশব্দে ক্যাবে উঠলো সে, স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসলো। সোহানাকে নিয়ে পিছনের সিটে উঠলো রানা। গ্রামের বাকি অংশের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালালো ভালডেজ। ঘন ঘন ডান বাঁয়ে তাকাচ্ছে সবাই। একটু পরপরই নতুন নতুন বীভৎস দৃশ্য।

লাল ইট দিয়ে তৈরি মসজিদটা পেরিয়ে এলো ওরা। পিছনে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখলো, এক মুহূর্ত আগে দেখা গম্বুজটা নেই, সেখানে লালচে আগুনের শিখা নাচছে।

ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করলো রেডিওটা।

থার্ড ব্রিগেডের রোডব্লক আর অ্যামবুশগুলো থেকে ভি. এইচ. এফ.-এর মাধ্যমে রিপোর্ট যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে—নিজেদের পজিশন জানাচ্ছে ওরা, রুটিন রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, নতুন কোনো নির্দেশ থাকলে জানতে চাইছে। মেসেজগুলো গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে ভালডেজ, সামনে খুলে রাখা ম্যাপে আঙুল রেখে চিহ্নিত করছে ওদের পজিশন।

রোডব্লক এড়াবার জন্যে পথ থেকে দু'বার সরে এলো ওরা। গভীর আকেইশা (ACACIA) জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মন্থরবেগে এগোলো গাড়ি। ছোটো ছোটো আরো দুটো গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে হলো ওদেরকে। একেবারে ক্ষুদে বসতি, দু'তিন ঘর ম্যাটাবেল পরিবারের বসবাস। যা করার করে চলে গেছে থার্ড ব্রিগেড, বাকি কাজ সারছে কাক আর শকুনরা—আগুনে পোড়া, ভাজা দেহ থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে কালো মাংস।

পথ ধরে এগোবার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকলো ল্যাণ্ডরোভার। প্রতিটি বাঁকের মুখে গাড়ি থামালো ভালডেজ, গাড়ির মাথায় উঠে সামনে যতোদুর দেখা যায় চোখ বুলালো রানা, তারপর চারদিকে তাকালো। যেদিকেই তাকালো, নীল আকাশের গায়ে শুধু কালচে ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

পশ্চিম দিকে যতোই এগোলো ওরা, দ্রুত বদলে যেতে লাগলো এলাকার চেহারা—কালাহারি মরুভূমির কিনারা কাছে চলে আসছে। গাছপালা কমে যেতে যেতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত একঘেয়ে প্রান্তর আত্মপ্রকাশ করছে, মাথার ওপর নির্দয় সূর্য। তবু ওরা দিক বদল না করে পশ্চিমেই এগোলো।

দুপুরের পর ঢলে পড়তে শুরু করলো সূর্য, এরমধ্যে ত্রিশ মাইল

এগিয়েছে ওরা। সীমান্ত এখনো অন্তত বিশ মাইল দূরে, ম্যাপ দেখে বুঝলো রানা। তিনজনই ওরা প্রচণ্ড গরমে কাহিল হয়ে পড়েছে। ইস্পাতের গাড়ির ভেতরটা গনগনে তন্দুরকেও যেন হার মানায়।

মাঝ বিকেলের দিকে আবার কয়েক মিনিটের জন্যে থামলো ওরা। সবার জন্যে চা বানালো রানা। ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে বোল্ডার আর ক্ষুদে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা। এদিকে রেডিওর ওপর ঝুঁকে পড়লো ভালডেজ।

রেডিও রিটিউন্ করে রানাকে বললো সে, 'সামনে আর কোনো গ্রাম নেই। কিন্তু এরচেয়ে সামনে আমি কখনো যাইনি। কিসের মুখে পড়বো জানি না।'

'যুদ্ধের সময় মাজুলেটের সাথে এদিকে এসেছি আমি,' বললো রানা। 'সে অনেক দিন আগের কথা। তাছাড়া, একবার একটা মানুষ খেকো সিংহের পিছু নিয়ে সীমান্ত বরাবর প্রায় এক শো মাইল যেতে হয়েছিল।'

'দুর্গম?' রেডিওর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো ভালডেজ।

'সারফেস ওয়াটার নেই,' বললো রানা। 'কোথাও শুধু বালি, কোথাও শুধু পাথর। ছোটো বড় অসংখ্য গর্ত আছে, লবণ তৈরির জন্যে খোঁড়া...' হঠাৎ জরুরী ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওকে চুপ করতে বললো ভালডেজ।

রেডিওতে আরেকটা কণ্ঠস্বর ধরতে পেরেছে সে। এর আগের কণ্ঠস্বরগুলোর সাথে এটার কোনো মিল নেই। এটা গম্ভীর, প্রায়োরিটি দাবি করছে, জরুরী একটা নির্দেশ দেবে বলে সব কটা ইউনিটকে একদম চুপচাপ থাকতে বলছে। তার গলায় কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট।

ভালডেজের পেশীতে টান পড়লো।

'কি ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা। কিন্তু আবার হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে বললো ভালডেজ। মেসেজটা শোনা ভাষায় প্রচার হচ্ছে, কিছুই বুঝছে না রানা।

দু'মিনিট পর মুখ তুললো ভালডেজ, মুখের চেহারা সাদা হয়ে গেছে।

'বলুন!' তাগাদা দিলো রানা।

কেশে গলা পরিষ্কার করলো ক্যাপটেন। 'আপনাদের জন্যে যারা কবর খুঁড়ছিল,' থেমে থেমে বললো সে, 'একটা পেট্রল তাদের উদ্ধার করেছে।'

'বেশ। তারপর?'

'ওই মেসেজে সমস্ত ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়া হলো। জেনারেল উমাঙ্গোর হুকুম, সব ইউনিটের প্রথম কাজ হবে আমাদের খুঁজে বের করা। এরই মধ্যে দুটো স্পটার প্লেন রওনা হয়ে গেছে।'

'আমরা এদিকে এসেছি ওরা জানলো কিভাবে?'

'যে-কোনো মুহূর্তে প্লেন দুটো আমাদের মাথার ওপর চলে আসতে পারে,' বললো ভালডেজ। 'কিভাবে জানলো জানি না, তবে তার জানার মধ্যে কোনো খুঁত নেই। আমাদের পুব দিকে কয়েকটা পিউনিটিভ ইউনিট রয়েছে, হাতের কাজ ফেলে এদিকে আসতে বলা হয়েছে ওদের।'

'তারমানে আমরা বর্ডার পেরোবার চেষ্টা করবো এটা সে আন্দাজ করে নিয়েছে।'

'শুধু তাই নয়, ঠিক কোন জায়গা দিয়ে পেরোবো, তাও বুঝতে পেরেছে সে,' বললো ভালডেজ। 'পামট্রি-র দক্ষিণ আর রেললাইনের

দিকে যাবো আমরা, সে-ও পামট্রি বর্ডার-পোস্টের দুটো ইউনিটকে আমাদের বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে আসার নির্দেশ দিয়েছে।'

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে লেন্স পরিষ্কার করলো ভালডেজ।

'আরকি?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

'জেনারেল উমাঙ্গো তার সমস্ত ইউনিটকে লেপার্ড কোড দিয়েছে,' বলে আবার থামলো ক্যাপটেন, তারপর প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো, 'লেপার্ড কোড হলো 'কিল অন সাইট' অর্ডার। দেখামাত্র গুলি করার হুকুম। আমাদের জন্যে দুঃসংবাদই বলতে হবে।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

আলোচনা

ক্যাডেট অফিসার আজম

বাংলার আলো, পোঃ বক্স নং ৬৪১, চট্টগ্রাম।

অগ্নিপুরুষ পড়ে আরও একবার অমৃতের সাধ লভেছি। খারাপ লেগেছে লুবনার মৃত্যু। আর এই খারাপ লাগাটাই বোধহয় রানার হাজারো কৃতিত্বে আমাদের ভাল লাগার মাঝে আনন্দাশ্রু। আসলে যে যাই বলুক—এ ধরনের প্যাথেটিক পাঠ্যদৃশ্যের অবতারণা রানা সিরিজের প্রতি আমাকে আরো আগ্রহী করে তোলে—তা না হলে অন্ততঃ আমার কাছে রানা সত্যি সত্যিই অতিমানব হয়ে যেতো।

সবশেষে রানা ভক্তদের প্রতি বন্ধুত্বের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

এম. আসাদুজ্জামান

গ্রাম ও পোঃ হঠাৎগঞ্জ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আব্বা গত ১৫ই মে সেবা প্রকাশনীর কয়েকটা বই সাতক্ষীরা থেকে ক্রয় করে এনেছিলেন। তার সাথে মাসুদ রানা সিরিজের বের হওয়া নতুন বই 'অগ্নিপুরুষ'-ও এনেছিলেন। আজ পর্যন্ত মাসুদ রানা সিরিজের যে বইটি আমার জীবনে প্রথম রেকর্ড ভেঙেছে সে রুদ্ধ বইটি হল অগ্নিপুরুষ। এই বইখানা পড়ে আমি ভাবাবেগে এমনই হয়েছিলাম যে কখন চোখের জলে বালিশ ভিজে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। মাসুদ রানাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমার নেই।

আনোয়ার-উস-সালেহ খোকন

ফুলতলা বন সম্প্রসারণ কেন্দ্র, জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা।

আলোচনা বিভাগের চিঠি পড়ে ভয় হয়, আপনাকে কেউ আবার আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় না করায়। পাঠকদেরকে যেমন নেশাগ্রস্ত করে তুলছে সেবার বই। অনেকেই, বিশেষ করে তরুণরা তো মনে হচ্ছে মুখস্থ করে ফেলছে সব। তবে আদালতে যদি লড়তেই হয় ভয় নেই ; আমরা আছি আপনার সাথে। চাই কি মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট, সবকিছুই পাবেন।

সুলতানুল আরেফিন শিপু (রানা)

ডাকবাংলা, স্টেশন বাজার, নাটোর।

আমিই রানা, দুঃসাহসিক সেই অগ্নিপুরুষটি, যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরে, বিপদজনক অদৃশ্য শত্রু পাগল বৈজ্ঞানিক ও সতর্ক শয়তানদের সাথে যে হামলার মোকাবিলা করে। বন্ধু বন্দী গগলকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম রত্নদ্বীপে, ওকে লাল পাহাড়ের এক দুর্গম দুর্গে আটকে রেখেছিল শয়তানের দুত, ক্ষ্যাপা নর্তক আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই-উ-সেন। স্পর্ধা কত ! অকস্মাৎ সীমান্তে ওরা হাইজ্যাক করে গগলকে, তারপর জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে ঘোষণা করে ওর মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র। উ-সেনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা নয়, প্রতিশোধ নেওয়া।

যাইহোক, পিশাচ দ্বীপে গিয়ে ধরা পড়লাম শত্রু পক্ষের জালে, দেখলাম চারিদিকে শত্রু। আমাকে নিয়ে গেল দুর্গম দুর্গে, আমার পাশের কামরায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা ছিল প্রবেশ নিষেধ, নীল আতংক।

পরদিন, তিন শত্রু এলো আমাকে মৃত্যুর ঠিকানায় পৌছে দিতে। পালাবার চেষ্টা করতেই একজন গর্ব ভরে বললো, আমি ব্লাক স্পাই-ডার, পালাবে কোথায় ? অপরজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুংকার ছাড়ল রানা।

সাবধান, আরেকজন তো পিস্তল হাতে নিয়ে একটা অট্টহাসি উপহার দিয়ে বলেই বসলো, বিদায় রানা।

কাজী দা, আমার এতো তাড়াতাড়ি মরবার সাধ নেই। এই চ্যালেঞ্জের মুখ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি খুব শীঘ্রই জানান। আমাকে বাঁ-চা-ন।

* 'মরণ কামড়' দিয়ে পড়ে থাকুন, আমি আসছি যত শীঘ্রি সম্ভব।

মোঃ আবুল কাশেম (লিপু)

গ্রাম : চুটলিয়া, পোঃ ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ।

কাজীদা, যে দিন থেকে মাসুদ রানা পড়ছি, সেই দিন থেকে ভাবছি, আমরা আপনাকে হারাতে চাই না। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কাঠ মিস্ত্রী দিয়ে একটা কাঠের আলমারী তৈরি করে নিয়েছি। না… না কাজীদা, চিন্তা করবেন না। এই আলমারীতে আপনাকে রাখবো না। রাখবো আপনার দেওয়া সুন্দর সুন্দর বইগুলি। যাতে আপনি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে না যান।

* ধন্যবাদ।

মঈন উদ্দিন আহমেদ মুকুল

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, উপজেলা কৃষি অফিস, নেত্রকোনা সদর।

বহুদিন পর আপনাদের 'আলোচনা বিভাগ'-এ লিখছি। তাই বলে ভাববেন না আপনাদের প্রকাশিত কোনো বইয়ের এবং কোনো লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার জন্যে এ চিঠি। ওসব আমি মোটেই পারি না এবং আমার ধাতেও সয় না। আমি যা লিখবো, খোলাখুলি এবং স্পষ্টাস্পষ্টিই লিখবো। পারলে ছাপাবেন। তা না হলে তো ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আছেই।

আপনাদের বইকে অনেক বিদগ্ধ সমালোচক হালকা বলে মনে করেন। কিন্তু আমি কিছু কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে এ মন্তব্য মানতে রাজি নই। যেমন, আত্মোন্নয়ন সিরিজের বইগুলো এবং কিছু অনুবাদ। উদাহরণ স্বরূপ, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'হারানো পৃথিবী', 'বিষ বলয়', 'বাস্কারভিলের হাউণ্ড', এইচ. জি· ওয়েলস-এর 'অদৃশ্য মানব,' স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড-এর 'শী' ও 'রিটার্ন অভ শী', 'সলোমনের গুপ্তধন' এবং এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর 'অল কোয়া-য়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। বিশ্ব সাহিত্যের সেরা সম্পদ এই বইগুলো বাঙালী পাঠক সমাজ পড়তে পেরে আপনাদের চির শুভা-কাঙ্ক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য আজব সিরিজ, অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ এবং সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা বইগুলোও চমৎকার উপহার।

তবু যদি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতেন, মনে হয় সেবা প্রকাশনীর বিচিত্র বিষয়ক প্রজাপতির মনো-গ্রাম সার্থক এবং যথার্থ হতো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর মেজর রফিক-উল-ইসলামের সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'এ টেল অব মিলিয়নস' অনুবাদ করে ছাড়লে আমা-দের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি একটা মহৎ কর্তব্য পালন করা হতো। এছাড়া এন্থনী মাসকারেনহাসের বিতর্কিত 'বাংলাদেশ : এ লীগেসী অব ব্লাড. বাংলা রূপান্তর করলে অনেক অজানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম। এ ছাড়াও 'জীবনী' সিরিজ করে চার্লি চ্যাপলিনের 'মাই অটোবায়োগ্রাফী' জোয়ান কলিন্স-এর 'পাস্ট ইম্পারফেক্ট' লিভ উলম্যানের 'চেঞ্জিং' এবং প্রিসিলা প্রেসলির 'এলভিস এণ্ড মি' বাংলা বই হিশেবে বাজারে ছাড়লে হলিউডের ঝলমলে চিত্রজগত সম্পর্কে, সর্বোপরি চিত্রতারকাদের সম্পর্কে বিশদ অবগত হতে পারতাম।

আশা করি প্রস্তাবগুলি নিয়ে কিছুটা হলেও নাড়াচাড়া করবেন। 'রহস্য পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যায় একজন করে রোমাঞ্চ রহস্য ঔপন্যাসিকের জীবনী প্রকাশ করে দিলে ক্ষতিটা কি? শুরুতে তো ছিল হঠাৎ উঠে গেল কেন?

* আপনি যে-সব সংযোজনের কথা বলেছেন এগুলো নিয়ে আমরাও বেশ কিছুদিন যাবত ভাবছি। ভাল কিছু আমরা তো ছাপাতে চাই-ই, আসল অসুবিধে পাওয়া দুষ্কর।

ডাঃ খলিলুর রহমান

শংকরপুর ফেরিঘাট বাজার, পোঃ বাগআঁচড়া, যশোহর।

সুদীর্ঘ পাকিস্তান আমল থেকেই আমি রানার ভক্ত। ও আমার কল্পনার হিরো। ওর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের প্রচেষ্টা আমার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ভয় হয় যেদিন আপনি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবেন সেদিন আর কেউ রানাকে আমাদের সাথে পরিচয় করাতে পারবে কিনা। এইমাত্র অগ্নিপুরুষ-১ শেষ করে, রানার অন্তরের হাহাকার ও লুবনার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা পড়তে গিয়ে কখন যে দু'চোখের পাতা ভিজে গেছে বলতে পারবো না। কেন জানি প্রায় ১৫/২০ মিনিট যাবত চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। প্রাণোচ্ছল, সদা চঞ্চল কিশোরী মেয়েটাকে না মারলে কি হতো না? অগ্নিপুরুষ-১ ব্যতিক্রমধর্মী মনে হচ্ছে। যাই হোক, কাজীদা, অনুরোধ রইলো, সব রকম ধানাই-পানাই ও ভণিতা বাদ দিয়ে মাঝখানে অন্য কোনো বই প্রকাশের দুরাশা ও দুঃসাহস ত্যাগ করে শীঘ্র আমাদের হাতে অগ্নিপুরুষ-২ তুলে দিন।

* কেমন লাগলো?

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার সিরিজের ষষ্ঠ রহস্যোপন্যাস

রত্নদানো

রচনা : রকিব হাসান

মূল্য : চোদ্দ টাকা

প্রকাশের তারিখ : ৭ আগস্ট, ১৯৮৬

বিষয় : তিন গোয়েন্দা—কিশোর, রবিন ও মুসার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। ওদের চোখের সামনে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে চুরি হয়ে গেল সম্রাটের সোনার বেল্ট। তারপর…

রানা-১৩৭

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

অন্ধকারে চিতা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের একটা কাজ নিয়ে আফ্রিকার
জিম্বাবুইয়ে পৌঁছলো রানা। ইচ্ছে,
রেবেকার র‍্যাঞ্চে কদিন বিশ্রাম নেবে।
কিন্তু ম্যাশোনা ও ম্যাটাবেল—চিরশত্রু দুই উপজাতির
সশস্ত্র কোন্দলে জড়িয়ে পড়লো সে।
বন্ধু পরিণত হলো শত্রুতে—
অচেনা একজন বাড়িয়ে দিল বন্ধুত্বের হাত।
সব ধোঁয়াটে।
কেন কি ঘটছে কিছুই বোঝা যায় না।
যখন স্পষ্ট জানা গেল, তখন আর সময় নেই—
মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়।

বিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net